জন্ম—৪ঠা ফাল্গুন ১২৬৯ সাল, রবিবার শিবত্রয়োদশী ( শিবরাত্রের পূর্বদিন )

ইংরাজি 15th February 1863, Sunday.

মৃত্যু—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৫৬, ২৯ নভেম্বর ১৯৪৯' সোমবার রাত্রি ৩-৫০ মিনিট।

# আনন্দময়ী-দর্শন

## ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদেব চিবাবাধ্য দাদামশাই কেদাবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেব ছেড়ে যাওযাব কিছুদিন আগে তাঁব সাক্ষাৎ নাতি শ্রীমান ক্ষিতীশ ও নাতিব অধিক শ্রীমান শক্তিকুমাব আমাব কাছে এসেছিলেন দাদামশায়েব গল্পগুলি বাছাই ক'বে দেওয়াব জন্যে—আব পাচজন 'পাবলিসাবে'র দেখাদেখি তাঁবাও দাদামশাযেব শ্রেষ্ঠগল্প বেব কববেন ব'লে। ভাব নিলাম। কিন্তু গল্পগুলি আবাব একটানা পড়তে গিযে দেখলাম, শ্রেণী বিভাগ ক'বে গল্প নির্বাচন প্রায অসম্ভব। কাবণ দাদামশায়েব সাবা জীবনের তিন বিভিন্ন পর্যায়েব সাহিত্যসাধনাব গদ্য পদ্য, যাবতীয় বচনাই এক সুরে বাধা—তা হচ্ছে হাসি এবং কান্নাব টানা পোড়েনে বোনা সাধাবণ মানুষেব বৈচিত্র্যহীন সুখদুঃখেব জীবন। কোনটাতে কান্নাব ভাগ বেশি, কোনটাতে হাসিব, পেণ্ডুলামেব এ-প্রান্তে ও প্রান্তে একটু যা তফাত। সুতবাং সাহিত্য-সমালোচনা বীতি সঙ্গত বাছাই সম্ভব হ'ল না। শ্রেষ্ঠ গল্পে'ব আযতনেব দিকে নজব বেখে যে কটা গল্প প্রথম দফায় ভাল লাগল, সেগুলিই নির্বাচন ক'বে দিলাম। গল্পগুলি যদি শ্রেষ্ঠ না হয়ে থাকে, সে অপবাধ সম্পূর্ণ আমাব।

যে গল্পগুলি বইযেব আকাবে বেব হযেছে সেইগুলি থেকেই বাছাই কবেছি, সেগুলিব কোনটি "গল্পসমষ্টি", কোনটি 'লিপি-চিত্র' এবং কোনটি ব "স্মৃতি কথা" নাম নিযে বেবিয়েছিল। আসলে দাদামশাযেব সব গল্পই অল্প-বিস্তব স্মৃতি কথা: তিনি নিজে সবাসবি জড়িত না হ'লেও যা তিনি দেখেছেন বা শুনেছেন তাবই প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ অভিজ্ঞতা গল্পগুলিব ভিত্তি। ববীন্দ্রনাথেব কল্পনাবিলাস এব মধ্যে নেই অথবা শবৎচন্দ্রেব মত একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েও তিনি ঘটনাগুলিকে সাজান নি। দাদামশাই বা দিদিমাবা নাতি-নাতনীদেব কাছে যে ধবনেব গল্প ব'লে থাকেন গল্পগুলি সেই জাতীয, তাই এর ভাষা স্বতন্ত্র, ভঙ্গী স্বতন্ত্র, ইংবেজি বুকনিব এত প্রাধান্য, প্রাদেশিকতাব টান এত বেশি। 'দাদামশায়েব শ্রেষ্ঠ গল্প' এই নামটি

সত্যিই সার্থক হয়েছে। বাছাই করা জিনিস চাখতে যাঁদের রুচি নেই অথবা পররুচি খানা খেতে যাঁরা অভ্যস্ত নন, তাঁদের এই বইগুলি যোগাড় ক'রে পড়তে হবে, ছোট-গাল্পিক দাদামশায়ের সম্পূর্ণ পরিচয় তা হ'লে তাঁরা পাবেনঃ—
১। আমরা কি ও কে, ১৩৩৭, ২। কবলুতি, ১৩৩৫, ৩। পাথেয়, ১৩৩৭, ৪। দুঃখের দেওয়ালী, ১৩৩৯, ৫। মা ফলেষু, ১৩৪৩, ৬। সন্ধ্যাশঙ্খ ১৩৪৭, ও ৭। নমস্কারী, ১৩৫১। এ ছাড়া অনেক গল্প এখনও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় পাণ্ডুলিপি অথবা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে। সেগুলিও পড়া দরকার। তবে 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র পাঠকদের এটুকু আশ্বাস আমি দিতে পারি যে, নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে তাঁরা মোটামুটি পুরো দাদামশায়কেই পাবেন। আমাদের দুঃখ র'য়ে গেল, শ্রেষ্ঠ গল্প হাতে নিয়ে আমরা দাদামশায়কে ঘটা ক'রে সংবর্ধনা জানাতে পারলাম না। বিয়োগ ব্যথাহত চিত্তে গল্পগুলির শেষ বাছাই করেছি ব'লে হাসির চাইতে করুণ রসের আধিক্য হয়তো একটু ঘ'টে গেছে।

সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সমালোচনা ভবিষ্যৎ বাঙালীরা করবেন, তাঁর বিস্তৃত জীবনীও এখনও লেখা হওয়ার অপেক্ষায় আছে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষৎ-প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় গ্রন্থ-পঞ্জী প্রকাশ করেছেন। নিজের জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী দাদামশাই নিজেই লিখে গেছেন, ১৩৫৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তা ছাপা হয়েছে। তা থেকে একটা চুম্বক 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র পাঠকদের জন্যে ক'রে দিলাম।—

"নিবাস ও বাড়ি—দক্ষিণেশ্বর ২৪ পরগণা।

জন্ম—৪ঠা ফাল্গুন ১২৬৯ সাল, রবিবার শিবত্রয়োদশী (শিবরাত্রের পূর্বদিন) ইংরাজি **15th February 1863, Sunday.**

পিতা—৺গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেকার ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ সন্ধ্যাহিক নিয়ে থাকতন। অবশিষ্ট সময় কাটত রামায়ণ মহাভারত দাশুরায় আর সংবাদ প্রভাকর নিয়ে।...

ভ্রাতা—আমরা ছিলাম তিন ভাই⋯ ⋯

শিক্ষা—দক্ষিণেশ্বর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার পূর্বেই দাদার আদেশমত উত্তরপাড়া H. E. School-এ ভর্তি হই।

নিত্য পারাপার থাকায় মা এ ব্যবস্থা কোন দিনই সমর্থন করেননি। তাই দু বৎসর পরে কুটিঘাটা স্কুলে চ'লে আসি। সেখানে বছর আড়াই কাটে। এই সময় দাদা মিরাটে বদলি হওয়ায় সাংসারিক কারণে বাড়ির সকলকেই মিরাটে চলে যেতে হয়।⋯

কোন্নগর-নিবাসী কেদারনাথ দত্ত বাঙালির ছেলেদের জন্যে একটি স্কুল খোলেন। ইংরেজ Hd. master, একটি বাঙালী শিক্ষক ও নিজে পড়াতেন। সেই স্কুলেই ঢুকে পড়ি।

বৎসর দুই পরে দাদা আম্বালা বদলি হওয়ায় সেখানে যেতে হয়। সেখানে গোরার ছেলেদের জন্যে একটি কোচিং ইনস্টিটিউট ছিল। অনেক চেষ্টা ও সুপারিশে তাতে ঢুকতে পাই। সেখানে পড়াবার ধারা রীতি যত্ন যে কতটা আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, আজও ত' মনে হ'লে শিক্ষক দুটির উদ্দেশে মস্তক নত করতে হয়।

পথে পথে বিদ্যার্জন চলছিল। তার পূর্বেই তখনকার এনট্রেন্স দেওয়া দরকার ছিল, নচেৎ পড়া বেকার হয়ে যায়। পরীক্ষায় যোগ দেবার আশায় তাই লক্ষ্ণৌ Canning Collegiate School-এ গিয়ে ভর্তি হই। সংস্কৃত ছাড়া কিছুই বড় দেখতে হ'ত না। আর কয়েক মাস থাকলেই উদ্দেশ্য এগোয়। কিন্তু লেখা-পড়ায় আরম্ভ থেকেই ব্যাঘাত সঙ্গ নিয়েছিলেন। বাড়িতে আকস্মিক এক অভাবনীয় বিপদের টেলিগ্রাফ পেয়ে দক্ষিণেশ্বর রওনা হতে হয়।⋯ স্কুলে পড়ার এইখানেই শেষ।

দাদা তখন ২৫০৲ টাকা বেতন পান। তাঁর নামে একটা charge দিয়ে তাঁকে suspend ক'রে রাখা হয়েছিল। ছয় মাস পরে অফিসারের ভুল ধরা পড়ায় দাদা আবার সেই কাজেই প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তিনি আমাকে চাকরি ছেড়ে

পড়তে বলেন। কেঁচে সে কাজ আর করা হয় নি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি লিখে প'ড়ে স্বেচ্ছায় বদলি ধরণ ক'রে জব্বলপুর চ'লে যাই।...

জব্বলপুরে সাত বৎসর কাটে।...

চীনে 'বকসার' হাঙ্গামা সম্পর্কে আদেশমত ১৯০২ খৃঃ জুলাই মাসে চীন যাত্রা করি। ইতিপূর্বে যুদ্ধ-সংস্রবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যাবার আদেশ চারবার পাই। নানা ছলে সে সব এড়িয়েছিলুম, কারণ মা তখন বেঁচে ছিলেন। বার বার যুদ্ধে যাবার আদেশ অমান্য করায় তার কঠিন সাজাও স্বীকার করতে হয়েছিল, চাকরিতে আমার উন্নতির সকল পথই বন্ধ করা হয়। তা আমার গায়ে লাগে নি, মায়ের শান্তিবিধানের জন্য চাকরির মায়া ত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত ছিলুম। এখন মা ও দাদা উভয়েই পরলোকে, তাই চীন যাত্রাটা স্বেচ্ছায় করি।..

১৯০৫ আগস্ট অর্থাৎ তিন বৎসর পর ভারতে ফিরে কানপুর Store Office-এর ভার গ্রহণ করতে হয়।...

চাকরি কোনদিনই আমার ভাল লাগে নি। অথচ অফিসারেরা সকলেই চাইতেন ও ভালবাসতেন। পুত্র হয় নি। কন্যা একটি মাত্র, সে সুপাত্রেই পড়েছিল। জামাই ছিলেন L. M. S ডাক্তার। ভাবলুম কেন আর ভূতের বেগার খাটা! এ ইচ্ছা ক্যানপুর থেকেই প্রবল হয়। কিন্তু চীনের ও পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য তখন নিখুঁত। নির্দিষ্ট কার্যকাল পূর্ণ হতে বছর সাতেক বাকি। আমাকে চাকরি হ'তে অবসর দেবে কে। মন কিন্তু চাকরিবিমুখ। আমার অফিসার Major Smith, D. S. O বন্ধুর মত ভালবাসতেন। তাঁকে সব কথা খুলে বলি,—ছেলে নেই, কন্যাদায় মুক্ত হয়েছি, জীবন কিন্তু নিষ্ফল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই করা হয় নি। আমি ব্রাহ্মণসন্তান, পরমার্থচিন্তা আমার অবশ্যকরণীয় কাজ। সেটা র'য়ে গিয়েছে। সব সত্য কথা বললুম ও আমাকে কর্ম হ'তে অবসর নিতে সাহায্য করতে অনুরোধ করলুম। তিনি শুনে অবাক! পরে আমার প্রস্তাবের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বুঝতে পেরে বললেন—'পাঁচটা বছর থাকলে, এখন যা পাবে তার তিন গুণ পাবে, নির্বোধের

মত এরূপ ত্যাগস্বীকার কেন?' বললুম—সারাজীবন comfort-seeking-এ (আরাম খুঁজে) কেটেছে, এ কাজে ত্যাগই প্রথম সোপান—আমি যদি অল্পে চালাতে না পারি, ত্যাগের আনন্দ আমাকে সাহায্য না করে, তবে বুঝব—আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে সত্য নাই। বললেন -'আমার বদলি আসন্ন, সেই সময় মনে ক'রে দিও।' তাঁর সাহায্য ছাড়া কর্ম হতে অবসর লওয়া আমার সম্ভব ছিল না।

১৯০৯-এর নভেম্বরে ছুটি নিয়ে কাশী যাই, পরে ১৯১০-এর মে মাসে Medical Certificate-এর সাহায্যে retire করি। ..

পত্নীবিয়োগ—2nd July 1939."

১২ অগ্রহায়ণ ১৩৫৬, ২৯ নভেম্বর ১৯৪৯ সোমবার রাত্রি ৩-৫০ মিনিটের সময় দাদামশায়ের দেহান্তর ঘটে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস.

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পে'র প্রথম সংস্করণ আজ তিন বছর হ'ল নিঃশেষিত হয়েছে। নানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ যথা সময়ে ছাপা হয়ে ওঠেনি। পাঠক সম্প্রদায়ের তাগিদেই শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করতে হ'ল। এতে কিঞ্চিত অদল-বদল করা হয়েছে। 'অপরূপ কথা' গল্পটি এক সময়ে সুধীসমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ায় ওটি বাদ পড়ে যায়। এই সংস্করণে দেওয়া হল।

প্রকাশক

এই লেখকের অন্যান্য বই :—

কোষ্ঠীব ফলাফল ৬৲, হিসেব-নিকেশ ৩।০, পাওনা ৩৲

দাদামশায়েব হাসির গল্পেব একটি সংকলন
পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে।

# আনন্দময়ী-দর্শন

"মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা—
তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

১

হাট যেন ভীষণ কোলাহলের পর এইমাত্র ভাঙিয়াছে,—হাওড়া স্টেশনের এইরূপ অবস্থা। কিন্তু লোহার ছাত ভেদ করিয়া, সেই হট্টগোলের প্রতিধ্বনিটা—তখনও নিঃশেষে মুক্তি পায় নাই, একটা গভীর প্রতিশব্দ গমগম করিতেছে। প্ল্যাট্‌ফর্মে কেবল গুটিকয়েক রেলের কর্মচারী কমশেষে লক্ষ্যহীন পদচারণা করিতেছেন, বা পরস্পরে কথা কহিতেছেন, কেহ সিগারেট ধরাইতেছেন। কুলিরা এক প্রান্তে গিয়া, কেহ পয়সা গুনিতে বসিয়াছে, কেহ খইনি-প্রস্তুতে মন দিয়াছে। চারটা পঁচিশ মিনিটের বর্ধমান-লোক্যালখানি কিন্তু আরোহী লইয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে,—দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। এঞ্জিন অতিষ্ঠ হইয়া চাপা গলায় নানারূপ বিকৃত স্বরে গজগজ করিতেছে।

একখানা মোটর দূর হইতে বিকট শব্দ করিতে করিতে প্রচণ্ড বেগে আসিতেছে দেখিয়া, সহৃদয় স্টেশন-মাস্টার প্রলম্বগ্রীব হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

কেবল একটি তরুণ ছোকরা, প্রত্যেক গাড়ির দরজার নিকট হইয়া দ্রুত চলিয়াছে। আরোহীরা অযাচিতভাবেই বলিতেছেন, "দোরে চাবি দেওয়া—এগিয়ে ভাখো।"

ইতিমধ্যে মোটরের হাট পরা জেণ্টেল্‌ম্যানটি,—আধ-ইঞ্চি মাথা-নাড়া ও এক-পয়েণ্ট-ডেসিমেল হাসিতে স্টেশন মাস্টারকে আপ্যায়িত করিয়া, লম্বা পায়ে ফার্স্ট ক্লাসের দিকে অগ্রসর হইলেন;—একজন কর্মচারী ছুটিয়া গিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। স্টেশন-মাস্টারের ইঙ্গিতে গার্ড-সাহেবের হস্তস্থিত ফ্ল্যাগ সদর্পে সাড়ে দশ ফুট ঊর্ধ্বে আস্ফালন করিয়া উঠিল।

যুবকটি তখনও ইণ্টার ক্লাসের সমুখ দিয়া একভাবেই চলিয়াছে।

ইণ্টার ক্লাস হইতে সতীশ তাহাকে বহুক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল, সন্নিকট হইতেই বলিল, "এই দরাজাটা খোলা আছে ;—গাড়ি যে ছাড়ল, শীগগির উঠে পড় ". এই বলিয়াই স্বয়ং দরাজাটা খুলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইল। গাড়ি তখন সত্যই ছাড়িয়াছে

যেরূপ অবস্থায় ছেলেটি গাড়ি পাইল ও গাড়িতে উঠিতে পারিল, তাহাতে তাহার মুখে একটু নিশ্চিন্ত ভাব, অন্তত একটা আরামের নিশ্বাস, সতীশ আশা করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্তে সে লক্ষ্য করিল, ছেলেটি বিমূঢ়বৎ মিনিট-খানেক দাঁড়াইবার পর, দরজার কাছেই বেঞ্চের উপর সসঙ্কোচে আধ-বসা হিসাবে ধীরে ধীরে বসিল এবং সতীশের দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, 'আপনি সাহায্য না করলে উঠতে পারতাম না, কিন্তু—"

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, "তাতে আর হয়েছে কি, তোমার থার্ড ক্লাসের টিকিট বুঝি! আগের স্টেশনে থার্ড ক্লাসে গিয়ে উঠলেই হবে—এ গাড়িতে আদৌ ভিড় নেই।"

যুবক একটু ম্লান হাসির বিফল চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমার কোনও ক্লাসেরই টিকিট নেই।"

সতীশ বলিল, "কিনতে সময় পাও নি বুঝি? তা, পরের স্টেশনে গার্ডকে ব'লে দিলেই হবে,—যে স্টেশনে নাববে সেইখানে টাকা জমা ক'রে দেবে।'

যুবক চক্ষুর্দ্বয় নত করিয়া সলজ্জ কাতরকণ্ঠে বলিল "আমার কাছে পয়সা ছিল না বলেই—"

সতীশ, "ওঃ,—তবে? আমার কাছেও তো কিছু নেই,' বলিয়া একটু চুপ করিল। সন্দেহের একটা কুজ্ঝটিকা তাহার মস্তিষ্কটা দখল করিয়া চোখে মুখে নামিবার পূর্বেই সে যুবকটির প্রতি ভাল করিয়া একবার চাহিল। দেখিল, সেইভাবেই আনত দৃষ্টিতে যুবকটি স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার কান দুইটি লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। যুবকটির বর্ণ গৌর, পরিধানে অর্ধমলিন ধুতি ও একটি টুইল-শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুত, হস্তে রঙিন রুমালে বাঁধা একটি ছোট পুঁটলি।

সতীশ একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "তাই তো, এখন কি করবে?"

যুবক নয়নপল্লব ঈষৎ তুলিয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বলিল, "আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা ঠিক করতে পারি নি, কেবল গাড়ি দেখে বেড়াচ্ছিলুম—যদি

কোন পরিচিত লোককে দেখতে পাই। গাড়িতে ঢুকতে আমার পা উঠছিল না। আপনি না সাহায্য করলে —"

কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়া, বিচলিত কণ্ঠে সতীশ বলিল, "তবে তো আমিই তোমাকে বিপদে ফেলেছি!"

যুবক সহসা একটু সোজা হইয়া ও একটু হাসির রেখা মুখে টানিয়া স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "না, মোটেই তা নয়, আপনি তা ভাববেন না। যেমন ক'রে হোক, আমাকে উঠতেই হ'ত, আমার এ গাড়িতে যে না গেলেই নয়।"

সতীশ বলিল, "তবে বুঝি তুমি কিছু খরিদ করতে কলকেতায় এসেছিলে, সব পয়সা খরচ হয়ে গেছে, অথচ বাড়ি না ফিরলেও নয়?"

যুবক বলিল, "কতকটা তাই বটে, তবে ঠিক তা নয়। আমি কলকেতায় থেকেই পড়ি, ছুটি-ছাটায় বাড়ি যাই।"

শুনিয়া সতীশ বলিল, "বটে! তবে ভাই তোমার আজ থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল,—বড় ভুল করেছ।"

যুবকটি সতীশের কথা শুনিয়া আত্মগ্লানিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল কেন,—সেইটাই তো আমার উচিত ছিল, আর ভুল তো নয়ই, এর চেয়ে জ্ঞানকৃত কাজ আর কি হতে পাবে! কিন্তু আমার আজ যে কি হয়েছে,—সকাল থেকে যা যা করছি, কিছুতেই নিজের বুদ্ধি কাজ করছে না। এই মুহূর্তে যদি হাওড়া স্টেশনে নেবে যাবার উপায় পাই, তাও যে স্ব-ইচ্ছায় পারি এমনও তো বোধ হয় না।"

সতীশ শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, আমি কি একটি পাগলকে গাড়িতে তুললাম!

সতীশকে নীরব ও সতীশের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, যুবক ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার সম্বন্ধে আপনি যা ভাবছেন, আজ তা সবই সত্য। আপনার সবটা শোনা দরকার।" এই বলিয়া যুবক দৃঢ় হইয়া বসিল ও সতীশের মুখের উপর সরল দৃষ্টিতে চাহিয়া বালকের মত বলিতে লাগিল

"আমরা জাতিতে মুসলমান। আমাদের বাস নান্দিন গ্রামে,—বৈচি স্টেশনে নেবে প্রায় কোশ তিনেক যেতে হয়। বাবা বছর চার হ'ল মারা গেছেন; মাও শোকে কষ্টে বছর দেড় হ'ল গত হয়েছেন। সংসারে কেবল এক বিধবা পিসী, আমার ছোট ভগ্নী সেলিনা আর আমি। কয়েক বিঘে ধান-জমি আছে, তার উপরই নির্ভর ক'রে কষ্টে গুজরান হয়। বৈচির স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস

ক'রে কিছু বৃত্তি পাই, সেই উপলক্ষ্য ক'রে কলকেতা মাদ্রাসায় আই. এ. পড়ি। এই বছর আই. এ. পাশ করে কিছু বৃত্তি পেয়েছি,—বি. এ. পড়ছি। মাদ্রাসা বোর্ডিংয়েই থাকি। সংসারে মাসিক অন্তত পাঁচ টাকা দরকার, তাই একটি টিউশনিও করতে হয়, কিন্তু এক্‌জামিনের তিন মাস আগে সেটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

"এত কষ্টে পড়াশুনা সম্ভব হ'ত না, যদি আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামটির লোকেরা সহৃদয় না হতেন;—হিন্দু-মুসলমানের এমন আত্মীয় ভাব কোথাও দেখি নি। সকলেই পরস্পর প্রতিবেশীদের সংবাদ নিয়ে থাকেন, আর ছোট-বড় অভাব যথাসাধ্য পূরণ করেন। তা না তো বাড়ি ছেড়ে, কলকেতায় থেকে পড়া আমার সম্ভবই ছিল না,—চাষ বাস নিয়েই থাকতে হ'ত।

"গ্রামে বাবুদের বাড়ি দুর্গোৎসব হয়। তাতে কেবল পূজার দালানটি ছাড়া সর্বত্রই আমাদের অধিকার থাকে,—সে যেন আমাদেরই পূজা। তার আনন্দের অংশ থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না, সকলেই সমান উপভোগ করে। সপ্তমীর দিন প্রত্যূষে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে,—তেমনটি অন্যত্র কোথাও দেখি নি।

"বাবুদের বাড়ির পূর্বদিকে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, তাতে সহস্র শতদল আর শতাধিক রাজহংস দেখতে পাবেন। তারই ঈশান কোণে বেলগাছ আর বোধন-মন্দির। সপ্তমীর ঊষায় বাবুদের বাড়ির মহিলারা গ্রামের অপর সব পুরমহিলাদের সঙ্গে মূল্যবান বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে, আর পুরোহিত পট্টবস্ত্র প'রে, মায়ের আবাহন-ঘট বোধন-মন্দির হতে আনতে যান।

"জাতিবর্ণনির্বিশেষে গ্রামের কুমারী মেয়েরা সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সেজে সেখানে উপস্থিত হয়। তারা নৃত্য করতে করতে সুললিত স্বরে মায়ের আবাহন-সঙ্গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হতে থাকে,—সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যাদির মধ্যে ধীরে ধীরে সেই ঘট পূজার দালানে আনা হয়। সে কি স্বর্গীয় দৃশ্য! যেন দেবাঙ্গনার উৎসব! আজ ষষ্ঠী,—এই রাতটি শেষ হ'লেই, মেয়েদের সেই আনন্দোৎসবের প্রভাত।"

শেষ কথা কয়টি যুবক যেন উদাসভাবে আপন মনেই বলিল, সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, সে ঝুঁকিয়া মাথা হেঁট করিল।

সতীশ ভাবিল, তাহার আজ বিশেষ করিয়া মাকে মনে পড়িয়াছে, তাই সে নিজেও কষ্ট অনুভব করিল ও বলিল, "থাক্‌, যাতে মনে কষ্ট হয় এমন আলোচনায়

কাজ কি ?

যুবক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফে'লতে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "সবটা না বললে আপনার কাছে যে আমাকে চোর বা ঠক হয়েই থাকতে হবে, তা ছাড়া আর আপনি আমাকে কি ঠাওরাবেন ? আপনাকে বিরক্ত করা হচ্ছে কি ?"

সতীশ বলিল, "না না, কিছুমাত্র নয়। আর তুমি ও-কথাটা ভাবছ কেন ? মানুষের কত রকমে অমন অবস্থা ঘটতে পারে।"

যুবক এবার আর সতীশের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিল না, আনত নেত্রেই বলিতে লাগিল, "আজ প্রভাতেই সেই আনন্দোৎসবের দিন। এই বিশেষ দিনটির জল্পনা-কল্পনা পরামর্শ-আয়োজন নিয়ে ভাবী আনন্দের আশায়, গ্রামের কুমারীদের কত না উৎসাহ, কত না অধীর প্রতীক্ষায় বৎসর কেটেছে ! আজ সেই বহুপ্রত্যাশিত প্রভাত আসন্ন। আজ কত মেয়ে তারই আনন্দ, তারই আশা, তারই উৎসাহ বুকে নিয়ে শুতে যাবে। সেলিনাও এখনও অম্লান ফুলের মত হাসছে।"

এই পর্যন্ত বলিয়াই তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে চাপা ভিজা গলায়—"সে কিছুই জানে না ; আমি কি করব !" বলিতেই তাহার সরল চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

সতীশ শুনিতেছিল, সে যে বিশেষ কিছু বুঝিতেছিল তাহা নয় ; কিন্তু তার সহৃদয় প্রাণটা—কারণের অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া গিয়া যুবকের পার্শ্বে বসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিল, "ও কি, পুরুষমানুষের কি এত বিহ্বল হতে আছে ? কি এমন হয়েছে—"

"মাপ করবেন, আপনি বুঝবেন না,—এত বড় বিশ্বের কেউই বুঝবে না, মা থাকলে বুঝতেন। আর এই মন্দভাগ্যের উপর বৃথাই সেই ভার পড়েছে ! আজ সেলিনার সেই ফুলের মতো কচি বুকটার ভেতর কি যে কঠিন আঘাতের আয়োজন আমি ক'রে বসেছি, তা কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না, কেবল অসহায় সেলিনাই রুদ্ধ বেদনায় আর নিষ্ফল অভিমানে মলিন হয়ে যাবে। কাল আমি তার মুখের দিকে কোন্ মুখে চাইব, কি ক'রে চাইব !" যুবক দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিল।

মিনিট দুই এই ভাবে গেল, পরে সে একটু সামলাইয়া বলিতে লাগিল—

"মা যখন মারা যান, সেলিনার বয়স তখন ন বছর। অতটুকু মেয়েকে আর কে বোঝাবে—খোদাই বুঝিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে আমরা পরস্পরের মায়ের স্থান নিলুম। সে-ই আমাকে জেদ করে কলেজে পাঠিয়ে দিলে ; বললে—'কাঁদলে তো কেউ ফিরে আসে না ; আমি কাঁদব না, কাজকর্ম নিয়ে থাকব।'

'আমি ছুটি-ছাটায় বাড়ি আসবার সময় তার তরে বই, চুড়ি, ইয়ারিং, আতর ফিতে, রঙ, কিছু না কিছু একটা নিয়ে আসতাম।

'মাস খানেক আগে পিসীমা একদিন আমাকে গোপনে বললেন, 'ও-সব কিনতে পয়সা খরচ না ক'রে, সেলিনাকে যাতে একখানা ওড়না এনে দিতে পার, তার চেষ্টা পাও। শরৎ-উৎসব এল; গেল বছর সে একখানি ওড়নার অভাবে কোথাও বেরোয় নি, উৎসবে যোগ দিতে পারে নি। সে কষ্ট যে অতটুকু মেয়ে কি ক'রে নীরবে হজম করেছিল, তোমাকে তার আভাস পর্যন্ত জানতে দেয় নি— পাছে তুমি কষ্ট পাও, সে আমিই জানি। আবার সেই উৎসব আসছে, এই তার সাধ আহ্লাদের বয়েস, একটু দেখতে ভাল হলেই হবে।'

পিসীমার কথা শুনে আমার মনে পড়ল, পাঁচ ছ মাস আগে সেলিনা আমাকে ঠিক ঐ কথাটাই জানিয়েছিল, তবে অত স্পষ্টভাবে নয়। সে বলেছিল—'যখন সুবিধে হবে, একখানা ওড়না আমাকে এনে দিও দাদা।'

'পিসীমার ইঙ্গিতে আমার চৈতন্য হ'ল—এর মধ্যে যে সেলিনার কতটা আন্তরিক আবেদন, কি গভীর প্রত্যাশা অপেক্ষা ক'রে রয়েছে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। সুদৃশ্য বস্ত্র আর অলঙ্কারের সাধ মেয়েদের প্রাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকেই, সেটা স্বাভাবিক। তাতে আবার সেলিনার তরুণ বয়স এবং কিছু একটা অবলম্বন ক'রে থাকবারও নেই, মা-বাপের আদর থেকেও বঞ্চিত।

"কিন্তু আমারও দু-তিন টাকার বেশি একসঙ্গে যোগাড় বা সঞ্চয় করবার উপায়ও নেই,—তাতে আজকাল একখানা সাদা উড়নিও হয় না। দিন যত নিকট হতে লাগল, আমি ততই চঞ্চল, ততই উদ্বিগ্ন হতে লাগলুম। যেন ছুটির টানে ধরল, থাকতে পারলুম না,- গত শনিবার হঠাৎ বাড়ি চলে গেলুম।

"আমাকে দেখেই সেলিনার মুখ শুকিয়ে গেল। সে ছুটে এসে আমার কপালে পাঁজরায় হাত দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলে—আমার অসুখ হয়েছে কি না। হেসে বললাম—আমি ভাল আছি সেলিনা। কেবল জানতে এলাম, তোমাদের শরৎ উৎসব কবে!'

"সেলিনা নিশ্বাস ফেলে বললে—'আমার বড় ভয় হয়েছিল দাদা, এখনও বুক ধড়ধড় করছে। তা তোমার ও-কথা জানবার জন্যে এত কষ্ট ক'রে আসা কেন?'

"আমি বললাম—'সে কি ভাই সেলিনা, তোমার জন্যে যে ওড়না আনতে হবে, এখনও কেনা হয় নি;- আমি সে কথা ভুলি নি।'

"সেলিনা আমাকে বাতাস করছিল, তার মুখের উপর একটা গোলাপী আলো

পড়তে না পড়তে সে বললে—'এ বছরটাও না হয় থাক দাদা, আমাদের সময় তেমন নয়।'

"বললুম - 'তা কি হয় বোন, গত বছর তুমি উৎসবে যেতে পার নি,—সে কথা আমার বড় লেগেছে ভাই। এ বছর আমি তোমাকে সে কষ্ট আর দিতে পারব না, নিজেও সে বেদনা সইতে পারব না।'

"সেলিনার চোখে জল এসেছিল, সে বললে 'তোমাকে কে বললে? মিছে কথা। পিসীমা কিছু বোঝেন না; বড় অন্যায় করেন।'

আমি তার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললুম—'আমি ভাল ওড়না পছন্দ ক'রে এনো, যে দিন রাত্রে তুমি পাবে, তোমাকে উৎসবে যোগ দিতেই হবে, তা না হ'লে আমার বড় লাগবে।'

"সেলিনা তখন উত্তেজনার সঙ্গে বললে—'না, বুঝেছি, এসব গিন্নীমার ফন্দি। উনি সকালে এসেছিলেন, গেল বছরের কথা তুলে,—কত কি ব'লে চোখের জল ফেলে গেলেন। খাবার এনেছিলেন, নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে তবে গেলেন। শেষে কত স্নেহে উৎসবে উপস্থিত হবার জন্যে ব'লে ক'য়ে গেলেন।

ইত্যাদি কথার পর সে আমাকে গিন্নীমা প্রদত্ত খাবার খাওয়ালে। আমি তা আর পারলেম না—তাকে কিছু না ব'লে আমার মেডেল দুটি বার ক'রে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে কলকেতায় ফিরে আসি।

সতীশ একমনে শুনিতেছিল, সে হঠাৎ বলিল, 'কিসের মেডেল?" এ প্রশ্নের সার্থকতা যে কি ছিল তাহা জানি না। বোধ করি, কলেজের ছেলেদের এ আগ্রহটা স্বাভাবিক।

যুবক একটু বিষণ্ণ হাসির সংমিশ্রণে বলিল, "সেগুলি আমার আজকের চাকরের বিদ্রূপের মতো এতদিন আমারই সিন্দুকের মধ্যে থেকে সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করছিল। রবিবাবু লিখেছেন জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে আর সুযোগের অপেক্ষা ক'রে থাকে। আমারও এ দুটি তাই। রূপারটি বৈঁচি ইস্কুল থেকে পাই, সোনারটি মাদ্রাসায় প্রাপ্ত; দুটিই আমার Good Conduct Medal (সুচরিত্রের পুরস্কার)।—সেই চরিত্রবান আমি, আজ কিনা বিনা টিকিটে রেল-কোম্পানিকে ফাঁকি দিতে বসেছি।

"থাক্, কথাটা শেষ করি। আপনাকে বড় বিরক্ত করা হচ্ছে। ভাবলুম, ফিরোজী রঙের জমির উপর সূক্ষ্ম বেগুনীর বেল, তার গায়ে এক-একটি জরির জুঁই, আর জরির সরু পাড় দেওয়া একখানি ওড়না—সেলিনাকে খুব মানাবে। একজন

বললে—পনের-ষোল টাকায় হতে পারে।

"ছেলে পড়িয়ে পাঁচ টাকা পেয়েছিলুম, দু টাকা বায়না দিয়ে এলুম। সঙ্গে তিন টাকা মাত্র রইল। দেড় টাকা দিয়ে একখানি ঝকঝকে গল্পের বই আর আট আনার কস্তুরির আতর সেলিনার জন্য নিলুম। আমার ধারণা ছিল, মেডেল দুটি কোথাও রেখে ষোল-সতের টাকা পাবই। একটি বন্ধু আশ্বাস দিলেন, তাঁর পরিচিত একজন আছেন তিনি বন্ধকী কাজ করেন, গেলেই টাকা পাওয়া যাবে। কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধু আমাকে সেই লোকটির কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন, কারণ তিনি পূর্ববঙ্গে যাবেন, গাড়ির সময় অল্পই ছিল।

"লোকটি পুরো দোকানদার, অনেক ক'ষে-মেজে দশ টাকা দিতে রাজি হ'ল। অনেক অনুনয়-বিনয় করে বেশি সুদ কবুল করায়—বারো টাকা মাত্র পেলুম। আমার সময়ও ছিল না, উপায়ও ছিল না, তা-ই হাতে ক'রেই ওড়নার দোকানে ছুটলাম। ওড়না দেখে খুবই পছন্দ হ'ল, কিন্তু ষোল টাকার কমে দেবে না। আগাম দু টাকা দেওয়া ছিল, সঙ্গে মাস্টারির এক টাকা ছিল, আর ওই বারো টাকা, মোট পনের টাকা। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। আমার কাতর অবস্থা দেখে লোকটির দয়া হ'ল। সে ওড়নাখানি কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—'তুমি নিয়ে যাও, ইচ্ছা হয় এর পর টাকাটা দিয়ে যেও।'

"আমার চোখে জল এল, তাঁকে সেলাম ক'রে খোদাকে স্মরণ করতে করতে বোর্ডিংয়ের দিকে ছুটলাম, যদি কোন বন্ধুর দেখা পাই তো গাড়ি-ভাড়ার উপায় করবার আশায়। কিন্তু তখন সেথায় কেউই ছিল না, কলেজ বন্ধ হওয়ায় সব বেরিয়ে গেছে। অপেক্ষারও সময় ছিল না, তা হ'লে ট্রেন পাই না। আবার, এই ট্রেনখানি ভিন্ন বাড়ি যাবার উপায়ও নেই, অন্য গাড়ি বৈঁচি স্টেশনে দাঁড়ায় না। তখন রাস্তার দুই দিকে চাইতে চাইতে হাওড়ার দিকে দ্রুত আসতে লাগলাম, যদি কোন পরিচিতের দেখা পাই। একজনকেও পেলাম না।

"স্টেশনে পৌঁছে প্রত্যেক গাড়ি খুঁজতে লাগলাম, যদি কোন চেনা লোক দেখতে পাই। আপনি যখন ডাকলেন, তখন যে আমি কোথায়, সে চেতনা আমার ছিল না। আমি ঠিক উন্মাদের কি যন্ত্রের মতো ঘুরছিলাম, চোখের সামনে কুয়াশা ক'রে আসছিল। তারপর সবই আপনি জানেন। অপরাধের সাজা নিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু সেলিনাকে নৈরাশ্যের কঠিন ব্যথা কি ক'রে দেব! আজ যে ষষ্ঠী!"—বলিতে বলিতে যুবকের স্বর বন্ধ হইয়া গেল,

চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সতীশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমিও তোমারই মত একজন কলেজের ছাত্র, মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। দাদা আমার বর্ধমানে ওকালতি করেন। হঠাৎ তাঁর টেলিগ্রাফ পেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তাঁর ইচ্ছা, পূজার বন্ধে একত্রে বোম্বে বেড়াতে যাওয়া। অদৃষ্টের পরিহাস দেখ, আমার কাছেও আজ একটি পয়সা নেই, ঘড়িটা পর্যন্ত না। যাক ওড়নাটা আজ কিন্তু পৌছানো চাই-ই। এ গাড়িতে তোমার যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। আমার দু দিন বিলম্ব হ'লেও ক্ষতি হবে না, কারণ বিজয়ার দিন আমাদের বেরুবার কথা। তা ছাড়া এদিকের প্রায় সব স্টেশনেই আমার চেনা লোক কেহ না কেহ আছেনই। আমি আগের একটা স্টেশনে নেবে যাব, যদি কেউ ধরে তো আমি তার উপায় অনায়াসে করতে পারব, চিন্তার কোন কারণই নেই। চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়, দুটো টাকার মামলা। হ্যাঁ, তোমার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয় নি।"

সতীশের কথার সহানুভূতিপূর্ণ সুর, যুবকের হতাশ অবসন্ন হৃদয়ে যেন একটু শক্তির সাড়া আনিয়া দিয়াছিল, সে ম্লান হাসির আভাস দিয়া বলিল, "আজ আমার নামটিও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। 'সুলতান আলি' না হয়ে আমার নামটি যদি 'ফকির আলি' হ'ত তা হ'লে আমি আজ একটু সত্যের শান্তি পেতাম। নামটাও লজ্জার বোঝার মত মাথাটাকে নত ক'রে দিচ্ছে, মুখে আনতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে। নামটা যে এত বড মিথ্যা জিনিস, সে যে আপন হয়েও এতটা নির্মমের মতো বিদ্রুপবিদ্ধ করতে পারে, তা কখনও ভাবি নি।"

সতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "সুলতান, তুমি ভাই বড় sentimental, (ভাবুক) দেখছি, আমাদের তো এসব চিন্তা উদয়ই হয় না। ওসব কি অত বড় ক'রে ভাবতে আছে? তোমার কবিতা-লেখা বাই আছে বুঝি?"

এইরূপ দু-চার কথায় সতীশ তাহার মনটাকে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া, অনেক বোঝাপড়া ও সাধ্যসাধনার পর নিজের টিকিটখানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল, "আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নেই, তোমার কিন্তু আজ পৌছানো চাই-ই। আর তুমি যদি ভ.` এখনও ইতস্তত কর তো আমি বলতে বাধ্য হব, টিকিটখানি আমি তোমাকে বিক্রি করছি, কলেজ খুললে তুমি আমাকে এর মূল্য দিও।"

সুলতান আর আপত্তির কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, বিমূঢ়বৎ অর্থশূন্য মৃদু হাস্যের সহিত টিকিটখানি বুক পকেটে রাখিল। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কাজটার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে তখনও সে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারে নাই।

ঠিক সেই মুহূর্তে, চলন্ত গাড়ির ট্রাভলিং-ইনস্পেক্টার মিস্টার হার্ডী, গাড়ির পা-দানে ভুঁইফোঁড়ভাবে সহসা উদয় হইয়া, হস্তস্থিত Punch টা (টিকিট-কাটা যন্ত্রটা) দ্বারে দ্রুতভাবে ঠক্ ঠক্ খট্ খট্ আঘাত করিতে করিতে বলিল, "টিকেট টিকেট, look sharp (শিগ্গির টিকিট দেখাও)"

সম্মুখে সহসা সর্প দেখিলে স্বাভাবতই মানুষ যেমন চমকিত ও ভীত হয়, এ সময় সুলতানের সেইরূপ ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা বুঝিয়া, সতীশ তাহার হাতে সজোরে একটা চাপ দিয়া দৃঢ় অথচ চাপা গলায় বলিল, "খবরদার যেন ছেলেমানুষি ক'রো না; আমি নেবে যাচ্ছি, তুমি সোজা বাড়ি যাবে; টিকিট দেখাও।"

সতীশ এমন দৃঢ়ভাবে আদেশের মতো কথাগুলি বলিয়াছিল যে সুলতান কম্পিত হস্তে টিকিটখানি বাহির করিল, কিন্তু ইনস্পেক্টারের হস্তে দিতে গিয়া তাহা পড়িয়া গেল।

মিস্টার হার্ডী অতিষ্ঠ হইয়া দ্বারে পাঞ্চটা সজোরে আঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দেখাও, জলদি দেখাও।" পরে সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার?"

সতীশ অবিচলিতভাবে বলিল, "আমি এইখানেই নাবব, আমার টিকিট নেই।"

পর-মুহূর্তেই গাড়ি ব্যাণ্ডেলে আসিয়া থামিল।

২

মিস্টার হার্ডী একজন নামজাদা Travelling Checker (চলন্ত গাড়ির টিকিট-পরীক্ষক)। দয়া-দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহার মধ্যে কেহ কখনও পায় নাই। এক কথায় গ্রাম্য ভাষায় যাকে "বাপের কুপুত্তুর" বলে—ও-লাইনের যাত্রী মাত্রেরই তাঁহার উপর এই ধারণা। আরোহীদের উপর নির্মম ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য দু-তিন বার 'ধনঞ্জয়' লাভও নাকি তাঁহার

ঐ কথা ব'লে সাধু হতে চায়।"

সতীশ তীব্র স্বরে উত্তর করিল, "কোন একদিনের accident-এর (আকস্মিক ঘটনার) জন্য কাহাকেও ওরূপ বলবার বা সন্দেহ করবার অধিকার কারও নেই ;— সাজা নিতে তো আমি অ-প্রস্তুত নই।"

মিস্টার হার্ডী আবার মুখে একটু হাসির ভাব আনিয়া, ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, "সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স! বোধ করি নিজেকে defend-ও (আত্মপক্ষ সমর্থনও) করবে না ?"

সতীশ বলিল, "আইন জানার চেয়ে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে জানা—অনেক কঠিন। আইন তো রেলের কুলিটাও জানতে পারে। যিনি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করতে শিখেছেন, তাঁর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে—"

কথা শেষ না হইতেই—"এই নিন আপনার টিকিট" বলিয়া, একখানি হস্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেখা দিল। সতীশ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, সুলতান।

রাগে তাহার সর্বশরীর যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে চিৎকার করিয়া বলিল, "You fool (নির্বোধ), তুমি যাও নি ? এটা কি তোমার সৌজন্য দেখানো হ'ল ? এতে কার কোন্ উপকারটা করা হ'ল, শুনি ? তোমার মত imbecile-দের জন্ম কেবল কাঁদতে আর কাজে বাধা দিতে। এই ড্যাম senti-mentality-র খাতিরে, এক ঘণ্টার পরিচয় নিয়ে, এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে কত বড় অনিষ্ট করলে তা জান ? তোমার সম্পর্কে আজ বাইশ বছর যে লোক ছিল না, চাই কি বাকি জীবনেও যে থাকবে না, তার জন্যে এত মাথা-ব্যথার দরকারটা কি-ই বা ছিল ? ওটা তোমাদের মুসলমানী আপ্ চলিয়ের আদব-কায়দা ভিন্ন আর কিছুই নয়।—এখন উপায় ?"

সুলতানের তুর্কী রক্ত তাহার চক্ষু পর্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সতীশের ভিন্ন সুরে উচ্চারিত "এখন উপায় ?" এই শব্দ দুইটি তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার নির্দিষ্ট স্থানের নিম্নে নামাইয়া দিল।

সে বলিল, "যখন দেখলুম পুলিসের ডাক পড়ল, তখন আপনাকে পুলিসের হাতে সঁপে দিয়ে—আপনার টিকিটের advantage নিয়ে, আমি সাধু ব'নে নিজের কার্যোদ্ধার করব ? গরিব হ'লেই কি তাকে পশু হতে হবে ? আপনার সঙ্গে আর কখনও আমার শারীরিক সাক্ষাৎ না ঘটতে পারে, কিন্তু আমার মন তো সে অভাব একদিনও বোধ করবে না। আপনার টিকিট আপনি নিন।" এই বলিয়া সুলতান টিকিটখানি সতীশের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।

সতীশ তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল ও বলিল, "অকালবিজ্ঞ, ফিলজফি কোর্স লওয়া হয়েছে বুঝি! কার টিকিট আমি নোব?"

সুলতান।—আপনার টিকিট।

সতীশ।—কে বললে, আমার?

সুলতান।—এই দেখুন—বর্ধমান লেখা রয়েছে, আমি তো বৈঁচি যাব।

সতীশ।—খুব প্রমাণ তো! (মিস্টার হার্ডীর প্রতি) দেখুন, এঁর মাথাটা ঠিক অবস্থায় নেই। আপনারা একটু কষ্ট ক'রে গাড়িতে তুলে দেবেন।

সুলতান বিরক্তির সহিত টিকিটখানি স্টেশন-মাস্টারের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তবে এই রইল।"

মিস্টার শেফার্ড খ্যাক্-খ্যাক্ ঘ্যঃ-ঘ্যঃ প্রভৃতি অদ্ভুত সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দে কক্ষ কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসি থামিতে মিনিট দুই লাগিল, টেবিল-ল্যাম্পটি নিবিতে নিবিতে রক্ষা পাইল। পরে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু ও নাসিকা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন, "মিস্টার হার্ডী, তুমি কি ঠিক করলে?"

মিস্টার হার্ডী এতক্ষণ ধীর সন্দেহ-দৃষ্টিতে, তাঁর নীল চক্ষুর ঝক্‌ঝকে তারা দুটি—আঁধারের আলোর মত একবার এ-কোণে টানিয়া সতীশের উপর, একবার ও-কোণে টানিয়া সুলতানের উপর পর্যায়ক্রমে ফেলিতেছিলেন। তিনি স্কন্ধ দুইটি একটু ঝাঁকাইয়া বলিলেন, "ও-সব pre-arranged (পূর্বাহ্ণে স্থির-করা) অভিনয় আমার ঢের দেখা আছে, ওতে মিস্টার হার্ডী ভোলেন না। যদি ওদের মধ্যে ও-টিকিটের মালিক কেউ না হতে চায়, বেশ কথা; দুজনের কাছ থেকেই রেল-কোম্পানির প্রাপ্য আদায় করব। এখানে কোন ফন্দিই খাটবে না।

সতীশ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, "Pity (দুঃখ হয়), এই বুদ্ধির দর্পই লজ্জার রূপ ধ'রে ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে উপায় থাকতে তোমার এই অভদ্র কথা শোনবার শখ কারও থাকতে পারে না। তাই পূর্বেই বলা হয়েছে, সাজা নিতে আমি অ-প্রস্তুত নই।"

মিস্টার হার্ডী সতীশের কথার উত্তর না দিয়া স্টেশন-মাস্টারকে বলিলেন, "আমি এদের হাওড়ায় নিয়ে যেতে চাই।"

মিস্টার শেফার্ড বলিলেন, "বেশ, এখনও তো সে গাড়ি আসতে দেরি আছে। ইতিমধ্যে এরা যদি বলে তো আমি একবার এঁর কাছে সত্য ঘটনাটা শোনবার ইচ্ছা করি।"

মিস্টার হার্ডী, "I don't care তুমি শুনতে পার", এই বলিয়া তিনি একটা

চুরুট ধরাইয়া টাইম-টেব্‌লখানা টানিয়া লইয়া পাতা উলটাইতে লাগিলেন।

স্থলতানের চক্ষে বা কর্ণে এসব কিছুই বোধ হয় স্থান পায় নাই; সে এক ধারে দাঁড়া-টেবিলটির গায়ে ভর দিয়া ও তাহার উপর কাত হইয়া অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে মিস্টার শেফার্ড যখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন, "You my friend No. 2 (আমার দু নম্বরের বন্ধু)!" হঠাৎ তাহার কানে যেন চটের কলের (Jute Mill-এর) ভোঁ বাজিয়া উঠিল। সে চমকিয়া দেখিল, স্টেশন-মাস্টার তাহাকে নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। স্থলতান যন্ত্রচালিতের মত টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মিস্টার শেফার্ড তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! তোমার চোখে জল কেন? এমন কি হয়েছে? তুমি স্ত্রীলোক নও, তোমার বন্ধুকে দেখ, কেমন firm and resolute (অবিচলিত ও দৃঢ়)।"

মিস্টার হার্ডী মুখ না তুলিয়া কেবল চক্ষুপল্লবমাত্র অল্প তুলিয়া স্থলতানকে দেখিতেছিলেন। তিনি মৃদুকণ্ঠে "an expert actor (দক্ষ অভিনেতা)' বলিয়া আবার টাইম-টেব্‌লে দৃষ্টি সংলগ্ন করিলেন।

মিস্টার শেফার্ড স্থলতানকে বলিলেন, "এখন বল দেখি ছোকরা, সত্য ব্যাপারটা কি? তোমাদের দেখে তো বিশ্বাস হয় না যে, তোমরা বিনা টিকিটে travel করবার (চলবার) লোক।"

মিস্টার হার্ডী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি এবার মাথা তুলিয়া বলিলেন, "মিস্টার শেফার্ড, এ সমন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার আমি প্রশংসা করতে পারি না; কি ক'রে তুমি এরূপ একটা opinion pass করছ (অভিমত প্রকাশ করছ)? মানুষের ওপরটা দেখে তার ভেতরটা যদি বোঝা যেত, তা হলে জগতের বারো আনা ঝঞ্ঝাট ঘুচে যেত। খুনীদের মধ্যেও এমন লোক আছে, সে এমন সব ধর্ম ও নীতিকথা এমন feelling-এর সঙ্গে (ভাবের সঙ্গে) বলতে পারে যে, তা শুনে সাধুরাও থ হয়ে যাবেন, হাজার হাজার শ্রোতার চক্ষে জল বইবে, অথচ মানুষ মেরে সে জীবিকার্জন করে।"

মিস্টার শেফার্ড হাসিয়া বলিলেন, "মিস্টার হার্ডী, তিলকে তাল ক'রে দেখতে তোমার ভাল লাগে দেখছি! এ অপরাধটার সঙ্গে ও কথাটার উল্লেখ সঙ্গত শোনায় না।"

মিস্টার হার্ডী।—সে কি কথা, তাই বুঝি তুমি ভাব? অপরাধ মাত্রেই

অপরাধ ; সাজায় ছোট-বড় আছে বটে। পূর্বে চুরি অপরাধে কি সাজা ছিল জান তো ? ফাঁসি।

মিস্টার শেফার্ড, "সেটা যে-সময়ে ছিল আর যে দেশে ছিল, তাও আমার জানা আছে", এই বলিয়া তিনি একটা হাসির আবরণ দিয়া প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "ওসব আমাদের আপোসের কথা আপোসের মধ্যে হওয়াই ভাল। এখন এরা কি বলে শোনাই যাক না, তোমার ট্রেনের তো এখনও ঢের দেরি।" পরে সুলতানের দিকে চাহিয়া, "বল তো ছোকরা।"

মিস্টার শেফার্ডের কথাটা যে হার্ডা সাহেবের ভাল লাগে নাই, তাহার মুখ-চোখ সে প্রমাণ দিতে ছাড়িল না।

সুলতান বিষাদ মিশ্রিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, আমাকে মাপ করবেন। যে কথা বলায় বা শোনায় এখন আর কোন সার্থকতাই নেই, কেবল একটা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেটা শোনবার ইচ্ছা করবেন না।"

মিস্টার শেফার্ড বলিলেন, "My young man, তুমি কি জান না, সত্য কোন অবস্থাতেই নিরর্থক নয় ? শুনতে আমার যে কৌতূহল নেই তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা মজা পাবার জন্যে আগ্রহ আমার আদৌ নেই।"

সুলতান বলিল, "দেখুন, যে কারণে বা যে কাজের জন্যে একপক্ষ কাল অনবরত চিন্তা, চেষ্টা, এমন কি আজ চোর-জুয়াচোর হওয়া, আর এই লাঞ্ছনা স্বীকার,— তার আশা যখন নির্মূল হয়ে গেছে, তখন সে সত্যেরও এখন আর কোন সার্থকতা নেই। সেটা এখন কেবল একটা 'কথার কথা' রয়ে গেছে, তার আর কোন মূল্য নেই। আমার যদি কেবল বাড়ি যাওয়ার তরে বাড়ি যাওয়া হ'ত, তা হ'লে এমনটা কখনও ঘটতে পেত না। সেরূপ আগ্রহ আমার ছিলও না, এখন তো নাই-ই। বরং এখন বাড়ি না যাওয়াই আমার ভাল।" এই বলিতে বলিতে সুলতানের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, তাহার বাম হস্ত টেবিলটাকে অবলম্বন পাইয়া চাপিয়া ধরিল, ও তাহার একটি সুগভীর নিশ্বাস পড়িল। একটু নীরব থাকিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "উনি সত্যই বলেছেন—আমার মাথার ঠিক নেই, আমি একটু বসি।" বলিয়াই সে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

মিস্টার শেফার্ড ব্যস্ত হইয়া "ব্যাপার কি" জিজ্ঞাসা করিলেন ও চেয়ারে বসিতে বলিলেন। সতীশ সুলতানকে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল ও শেফার্ড সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "এমন কিছু না—weakness ( শারীরিক দৌর্বল্য )

মাত্র।" পরে বলিল, "আপনার মত ভদ্রলোককে বলতে আমার আপত্তি নেই ; বিশ্বাস করুন না করুন, I don't mind ( আমার তাতে আসে যায় না )। আর আপনার কাছে কিছু প্রত্যাশা ক'রেও বলছি না—সেটা স্মরণ রাখবেন।"

সুলতান বাম হস্তে নিজের কপালটা চাপিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, সে হাত ছাড়িয়া ব্যস্ত ও কাতরভাবে সতীশকে বলিল, "Spare me ( আমাকে লজ্জা দেবেন না )।" তাহার চক্ষুই তাহার কাতর আবেদন পরিস্ফুট করিয়া দিল, এবং তাহা মিস্টার হার্ডীর তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি নিজে নিজেই অনুচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন, "সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।" এই বলিয়া দন্তের উপর দন্ত চাপায়, তাঁহার সেই নীল চক্ষু দুটিতে যেন একটা বিজয়ানন্দ ফুটিয়া উঠিল এবং তাঁহার ডান পা-টি নৃত্য করিতে লাগিল।

সতীশ থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল' "You ought to have adorned Scotland Yard Mr. Hardy ?" বিদ্রূপটা হার্ডী সাহেবকে খুবই বিঁধিল।

মিস্টার শেফার্ড অবস্থাটা বুঝিয়া চট করিয়া বলিলেন, "Yes, he is duty personified ( হাঁ, উনি কর্তব্যের প্রতিমূর্তি—কর্মবীর )।" পরে সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমিই এখন ঘটনাটা শোনাও, আমি তোমার সব শর্তেই রাজি আছি।"

সতীশ।—কিন্তু যাদের বাড়িতে ছেলে-মেয়ে নেই, যারা জগতের ঐ সুকোমল সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত, তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রায় ভোঁতা, তারা তো আমার কথাটা বুঝতে পারবে না।

মিস্টার শেফার্ড হাসিয়া বলিলেন, "সে সম্বন্ধে তুমি দুর্ভাবনা রেখো না, আমার নিজেরই পাঁচটি, and I am tired of them ( আমি জ্বালাতন হয়েছি )।"

সতীশ।—মুখে ওটা সকলেই ব'লে থাকেন, কিন্তু একটি যদি খসে বা একটির স্নেহ-কাতর আবেদন যদি রক্ষা করতে না পারা যায়, তখন প্রাণের মধ্যে তার পরিচয় আপনিই ফুটে ওঠে—বাইরে প্রমাণ খুঁজতে হয় না।

মিস্টার শেফার্ড "Oh, don't remind ( ও-কথা আর মনে ক'রে দিও না )" এই বলিয়া এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন যে টেবিলের কাগজপত্র যেন সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

আমাদের সতীশের বক্তৃতা-শক্তিটা বরাবরই ছিল ; সে কখনও কখনও গোলদীঘির 'গ্যারিবল্‌ডি' হইয়াও দাঁড়াইয়াছে। আজিকার ঘটনাটি সে সংক্ষেপে

অথচ আন্তরিকতার সহিত ভাবপূর্ণ ভাষায় বলিয়া গেল, এবং কি ভাবে ও কতটা ভাবনা, চিন্তা ও উদ্যমের মধ্যে—কোন পরিচিতের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া, পরে কোন ট্রেন না থাকায় শেষ মুহূর্তে হতাশ বিমূঢ় ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত অবস্থায় গাড়ির মধ্যে সে অসম্বিতে নীত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিল।

সতীশ সবই নিজের উপর আরোপ করিয়া বলিয়া গেল। পরিশেষে বলিল, "ঐ একমাত্র ট্রেন, যা সময়ে আমাকে আমার প্রতীক্ষাপরায়ণা ভগ্নীর বহুদিন-সঞ্চিত সাধটি পূরণ ক'রে তাকে আনন্দোৎফুল্ল করতে পারত ও উৎসবানন্দে যোগ দিবার সুযোগ দিত, তা তখন চ'লে গেল, তখন চোর ব'লেই নির্যাতিত হই আর শাস্তিই পাই, সেটা সেই আশাহতা বালিকার মর্মপীড়ার তুলনায় অতি তুচ্ছ। এখনও সে আশার আনন্দে কত না কল্পনার ছবি আঁকছে, কত না পথ চেয়ে আছে!" এই শেষ কথা কয়টি বলিতে সতীশের গলাও ভার হইয়া আসিল, তাই সে কেবল এইমাত্র বলিয়া শেষ করিল, "বাড়ি যাবার সে ক্ষিপ্ত-উৎসাহ কোথায় চ'লে গেছে, এখন প্রা . .ক . .. না-যাওয়াটা'ই চাচ্ছে।"

সতীশ বলা আরম্ভ করিবার পরই মিস্টার হার্ডী টাইম-টেব্‌ল রাখিয়া খুব অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে, মুখে চোখে অবিশ্বাসের ভাব লইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া শুনিতে আরম্ভ করেন। খানিকটা শুনিবার পর, তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে। ক্রমে কপালটা কুঞ্চিত হইতে হইতে সহসা মুখ-চোখ চিন্তাপীড়িত হইয়া পড়ে।

মিস্টার শেফার্ড তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "I fully understand the situation (আমি অবস্থাটা খুবই বুঝছি),' এবং দ্রুত পদচারণা করিতে, রুমালে নাক ঝাড়িতে ও নাক-চোখ মুছিতে আরম্ভ করিলেন। পরে মিস্টার হার্ডীর পিঠে হাত দিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ডোরা আমার বুকে এই কষ্টই রেখে গেছে, একটা—blue skirt (নীল রঙের জামা) মাত্র চেয়েছিল, আমি অত গা করি নি,—ফিরে গিয়ে আর,—Oh my—" বলিয়াই একটি চাপা গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিলেন। বোধ হইল যেন একটা কঠিন ধাক্কা তাঁহার লৌহ-কপাট-সদৃশ বক্ষে সজোরে আঘাত করিল।

মিস্টার হার্ডী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "Don't be a child—old boy (এ বয়সে ছেলেমানুষি ক'রো না)।"

মিস্টার শেফার্ড পশ্চাতের কামরায় চলিয়া গেলেন ও বেয়ারাকে দু গেলাস সোডা দিতে বলিলেন। মিস্টার হার্ডীও সেই কামরায় ঢুকিলেন এবং বেহারা-প্রদত্ত সোডা-মিশ্রিত হুইস্কি উভয়েই ধীরে ধীরে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

যে বৃদ্ধ লোকটি স্টেশন-মাস্টারের কামরায় পাখা টানিতেছিল, তাহার নাম ছেদি, জাতিতে কুর্মী; সে সব কথাই শুনিয়াছিল এবং ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। সে সেই অবকাশে সুলতানের সন্নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু, আমি গরিব, আমার কাছে এগারো আনা পয়সা আছে,—যখন ফিরবেন দিয়ে যাবেন, এদের এখন ফেলে দিন। আর কিছু দরকার হয় তো ছুটি পেলেই আমি সাথীদের কাছ থেকে এনে দি।" এই বলিয়া সে কোমর হইতে পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

সুলতান উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, খোদা তোমাকে এর বদলা দেবেন, এ তোমার দেওয়াই হয়েছে; কিন্তু আজ আর আমাদের যাবার গাড়ি নেই; দরকার বুঝি তো তোমার কাছেই চাইব।"

সাহেবদ্বয় যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন।

মিস্টার শেফার্ড একটি চুরুট মিস্টার হার্ডীকে দিলেন ও একটি নিজে ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, "সব শুনলে তো,—এখন কি করবে?"

মিস্টার হার্ডী একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "Why, it does not prove settlement of Company's dues, does it (ওতে কোম্পানির পাওনা মেটবার মত কি আছে।)?"

মিস্টার শেফার্ড মিনিটখানেক অবাক থাকিয়া বলিলেন, "If it does not, I believe this piece of paper does (ওতে যদি না মেটে, আমার বোধ হয় এই কাগজের টুকরোটায় মিটতে পারে)!" এই বলার সঙ্গে সঙ্গে বুক-পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মিস্টার হার্ডীর মুখের কাছে ধরিলেন।

সে সময় মিস্টার শেফার্ডের মুখের ভাব মিস্টার হার্ডীর ব্যবহারের বিপক্ষে সুতীব্র বিদ্রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আর সেটা যেন তাঁহার হাতে রূপ ধরিয়া মিস্টার হার্ডীর চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিস্টার হার্ডীর রক্ত চোখের পাশ দিয়া দু-দুবার কর্ণ পর্যন্ত ছুটিয়া কপালের দুই ধারে উঠিয়া সহসা মিলাইয়া গেল। তিনি একটু ফাঁকা হাসি হাসিয়াই—"Thank you my noble Sir (ধন্য মহোদয়)" বলিয়াই নোটখানি ছোঁ মারিয়া লইলেন ও পাল্টা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এত দিনে, বিনা টিকিটের আরোহীদের একটা হিল্লে হ'ল, আমিও অনেক botheration (ঝঞ্ঝাট) থেকে বাঁচবার একটা উপায় পেলুম।" এই বলিয়াই তিনি পকেট

হইতে Receipt Book ( রসিদ বই ) ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া এবং টেবিলের উপর হইতে বর্ধমানের টিকিটখানা নিজেই তুলিয়া লইয়া, একমনে হিসাবে বসিয়া গেলেন।

সতীশ ব্যস্ত হইয়া মিস্টার শেফার্ডকে "মহাশয়" বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "এটা দান ব'লে মনে করো না, যখন ফিরবে আমাকে দিয়ে গেলেই হবে।"

সতীশ পুনরায় বলিল, "কিন্তু আজ আর যখন ট্রেন নেই, আর অন্য দিনে যাওয়াও যখন বৃথা—"

মিস্টার শেফার্ড আবার বাধা দিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন,—আমি বিশ মিনিটের মধ্যেই ৭টা ৩৫ মিনিটের Goods-এ ( মালগাড়িতে ) তোমাদের book ক'রে দেব ( পাঠিয়ে দেব )।"

এই কথার শেষেই ছেদিব স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস—"রামজী মালিক" শুনা গেল।

Goods-train-এর ( মালগাড়ির ) নাম শুনিয়াই মিস্টার হার্ডীর পেন্‌সিল থামিয়া গিয়াছিল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে, গলাটা রাজহংসের মত সামনে বাড়াইয়া দিয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসার ফাঁক খুঁজিতেছিলেন। এইবার বলিলেন, "গুড্‌স ট্রেনে পাঠানোই তা হ'লে ঠিক? তাতে কিন্তু 2nd class এর fare ( দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ) লাগবে।"

মিস্টার শেফার্ড বলিলেন, "সেটা বোধ হয় আমি জানি।"

মিস্টার হার্ডী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অঙ্কশাস্ত্রে মন দিলেন ও দশ মিনিটের মধ্যে—ভাড়া জরিমানা প্রভৃতি পাই-পয়সা হিসাব করিয়া রসিদ ও বাকি টাকা আনা মিস্টার শেফার্ডের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন।

মিস্টার শেফার্ড রসিদখানি সতীশের হাতে দিয়া বলিলেন, "আশা করি এখন তোমরা—বালিকাটির কোমল হৃদয়ে কোনরূপ আঘাত পৌঁছবার পূর্বেই পৌঁছতে পারবে।"

সতীশ বিনীতভাবে বলিল, "আপনার সহৃদয়তা ও উদারতাই এ সাহায্যের মূল। আপনি আমাদের যে উপকার করলেন, তার পরিবর্তে—ধন্যবাদ দেওয়া বা কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা পাওয়াই মূঢ়তা। আপনার সৌজন্য ভুলতে পারব না। আমাদের সৌভাগ্য যে, বিপাকে পড়েছিলাম, তাই এই আদর্শ লাভ হ'ল।"

মিস্টার শেফার্ড সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "এস এস, ওসব থাক,

গাড়ি এল ব'লে।" এই বলিয়াই তিনি প্ল্যাট্‌ফরমের দিকে চলিলেন। সতীশ সুলতানকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিস্টার হার্ডী ইতিপূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিলেন।

সুলতান ছেদির সহিত দুই-চারিটা কথা না কহিয়া আসিতে পারিল না। প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়াই সে মিস্টার শেফার্ডের নিকট গিয়া বিনয়-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আপনি আজ আমাকে এমন একটা বেদনা থেকে বাঁচালেন, যা আমার জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকত।"

এই সময় মালগাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। মিস্টার শেফার্ড গার্ডকে বলিয়া দিলেন, "এই দুইটি ভদ্রলোক তোমার গাড়িতে যাবেন,—এঁরা 2nd class passenger (দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী)।"

মিস্টার হার্ডীকে দেখা গেল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এমন সময় টেলিগ্রাফ-আপিস হইতে বাহির হইয়া মিস্টার হার্ডী ছুটিয়া গার্ডের কামরায় উঠিলেন। সতীশ সহজ হাসির ভাবে বলিল, "Wel-come (আসুন) মিস্টার হার্ডী, আবার টিকিট দেখতে চাইবেন না তো?"

মিস্টার হার্ডীও হাসিয়া বলিলেন, "আমার duty-ই (কর্তব্য কর্মই) তো তাই,—তবে নিজের হাতে লিখে দিয়েছি, নিজেকে আর অবিশ্বাস করি কি ক'রে?"

সতীশ বলিল, "তা হ'লে দেখছি, আপনার নিজের ওপর বিশ্বাসটা এখনও হারান নি!"

কথাটা শুনিয়া মিস্টার হার্ডী অবাক হইয়া সতীশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

৩

তখনও ষষ্ঠীর চন্দ্র হাসিতেছিল। ট্রেন ত্রিশবিঘা স্টেশনের সন্নিকট হইতেই দূর হইতেই বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত একটি করুণ-সুর ভাসিয়া আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল—

পথ পানে চেয়ে চেয়ে অন্ধ হ'ল দু'নয়ান,
বিলম্বে—কি দিয়ে আমি হেরিব মা সে বয়ান!
দিন, মাস, দণ্ড গনি—বৎসর কবেছি শেষ,
কি ক'রে কঠিন হ'লে—বুঝিলে না মোর ক্লেশ,
আর না বাঁচিব আমি—নিশি হ'লে অবসান।
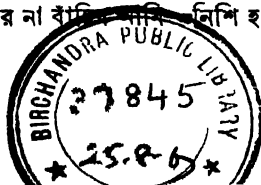
সতীশের প্রাণে ইহা এমন এক চিত্র আঁকিয়া যাইতেছিল, যাহা তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিতেছিল,—তাহার প্রাণ-মন সিক্ত করিয়া দিতেছিল। গায়কের প্রাণের সত্য ছায়াটি তাহার প্রাণে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার তাহা সুলতানের প্রাণে আর এক চিত্র প্রতিফলিত করিতেছিল। সে সুকোমল তুলিকার সূক্ষ্ম রেখাগুলি, তাহার প্রত্যেক শিরাকে বিচলিত করিয়া দিতেছিল, তাহার মনের সম্মুখে আর একটি ব্যথা-বিধুর মর্ম—স্তরে স্তরে খুলিয়া খুলিয়া দেখাইতেছিল, ও তাহার নীরব মর্মন্তুদ কাতর নিবেদন নিদারুণ সুরে তাহার হৃদয়ে বাজিয়া উঠিতেছিল,—তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না, হঠাৎ সতীশের হাত ধরিয়া বলিল, "দাদা, আপনি যাবেন তো? আমি একলা—"

সতীশ সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "যাব বইকি ভাই,—একা কেন? আমি তো রয়েছি—"

মিস্টার হার্ডী বলিয়া উঠিলেন, "সতীশ বাবু, I both admire and respect you, any one ought to be proud of your friendship (আমি তোমায় কেবল প্রশংসাই করি না, তোমাকে সম্মান করি,—যে-কেউ তোমার বন্ধুত্বের গর্ব করতে পারে): কিন্তু আমি তোমাকে সব মহত্বটা নিতে দিচ্ছি না, আমারও তার একটু অংশ পাবার লোভ আছে। তোমাকে আর যেতে হবে না: আমি ব্যাণ্ডেল থেকেই বৈঁচির স্টেশন মাস্টারকে টেলিগ্রাফ ক'রে এসেছি,—সুলতানকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে দুজন স্টেশন-কুলি ও দুটি হারিকেন-ল্যাম্প প্রস্তুত রাখতে।"

মিস্টার হার্ডীর কথায় দুজনেই আশ্চর্য ও অবাক হইয়া গিয়াছিল। কথা শেষ হইলে সতীশ বলিল, "Are you in earnest (ঠিক বললেন, না, তামাসা করছেন)?"

মিস্টার হার্ডী হাসিয়া বলিলেন, "আমার পূর্বের ব্যবহার দেখে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না! সেটা ছিল আমার duty (কর্তব্য), যার জন্যে আমি মাইনে পাই। চাকরির কর্তব্য আর নিজের কর্তব্য কি একই জিনিস? সেটা আমি কোম্পানির জন্যে করি, আর এটা আমার নিজের।"

সতীশ কথা না বাড়াইয়া বলিল, "যখন টেলিগ্রাফ করেছেন, তখন আবার কষ্ট ক'রে এলেন কেন? বৈঁচি ছোট স্টেশন—রাত্রে কষ্ট হবে।"

মিস্টার হার্ডী বলিলেন, "তুমি ঠিকই ঠাউরেছ, কিন্তু কেন যে এলাম সেটা

বললে তোমার ভাল লাগবে না। আমি যদি আজ কোন 'মিস্টার অমুকের' জন্য ব্যবস্থা রাখতে বলতুম, তা হ'লে আমার আসার আবশ্যকই ছিল না; কিন্তু নিজের দেশের লোক—এমন কি স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও, তোমাদের দেশের ঐসব জীবগুলির উপর আমার আদৌ আস্থা নেই। নিজের ছাড়া, দেশের লোকের উপকারে তারা অভ্যস্ত নয়—"

সতীশ কথাটার ভাল প্রতিবাদ খুঁজিয়া না পাইয়া ঢোক গিলিয়া কেবলমাত্র বলিল, "একে তো বহুদিনের পরাধীনতায় লোকের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তার উপর সেই বিদেশীর তাঁবেই চাকরি,—কাজেই সে মানুষ সহজেই নিজেকে হারিয়ে বসে।"

এই সময় গাড়ি আসিয়া বৈঁচি স্টেশনে থামিল।

মিস্টার হার্ডী গার্ডকে বলিলেন, "একটু দেরি করতে হবে।"

বৈঁচির স্টেশন-মাস্টার গদাধর গাঙ্গুলী, মিস্টার হার্ডীকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেলেন।

মিস্টার হার্ডী বলিলেন, কই, তোমার লোক কই?

তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একবার—"পল্টু—পল্টু" করিয়া এদিকে, একবার "গণপৎ—গণপৎ" করিতে করিতে ওদিকে, ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন।

মিস্টার হার্ডী সতীশের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত হইতেই সেই 'পল্টু' আর 'শালা', কখনও 'গণপৎ' আর 'রাস্কেল' শ্রুত হইতে লাগিল। চার-পাঁচ মিনিট চীৎকার আর ছুটাছুটির পর স্টেশন-মাস্টার মশাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন, "এখান তারা আসছে সার্।"

মিস্টার হার্ডী।—তারা কোথায়?

স্টেশন-মাস্টার।—একজন সার্ খেতে বসেছে, আর রাস্কেল গণপৎ সার ডিস্টেন্ট-সিগ্নেলে তার কে মেসো আছে সার্, সেখানে দোস্তি দেখাতে গেছে। সব শালা বেইমান সার্।

মিস্টার হার্ডী।—অর্থাৎ তুমি কিছু কর নি, করতেও না। কিন্তু আমি এই বসলুম,—দশ মিনিটের মধ্যে আমার এই young friend-কে আমি বাড়ি পাঠাতে চাই।

স্টেশন-মাস্টার "Beg your pardon sir—মাপ করবেন সার, আমি

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব হাজির করছি সার্। বদ্‌মাইস ব্যাটাদের টিকি দেখতে পাবার জো নেই সার্—আমাকে হায়রান ক'রে মারলে। চোট্টা ব্যাটা লক্ষণ-ভোজনে বসেছে।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে আবার ছুটিলেন।

একটু অন্তরাল হইয়া গাঙ্গুলী মশাই সিগ্‌নেলার বাবুকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "ওহে নেপেন, এ ব্যাটা দেখছি যমের মত ঘাড়ে চাপল, শালাকে চেন তো! দুটো হারিকেন ভাই চট্ ক'রে যোগাড় ক'রে রাখ, নইলে জান্ খাবে। উঃ, আমি তো আর পারছি না! (চীৎকার করিয়া) ওরে পল্টু, ওরে শা—লা! (নেপেনের প্রতি) এ কাঁচাখেগো দেবতা ব্যাটা কোথা থেকে এক মড়াঞ্চে নবাবপুত্তুর সঙ্গে ক'রে এল,—তাঁর বাঁধা রোশনাই না হ'লে চলবে না,—বাবুর যেন শ্বশুরবাড়ি, একটা জোটে না, দু-দুটো ল্যাম্প! একলা পেলে দেখতুম চলত কি না!- ওরে পল্টু, তোমার পিণ্ডি গেলা হ'ল রে ব্যাটা? ওহে নেপেন, ব্যাটারা যে সাড়া দেয় না হে, শুলো না কি! আমি তো দাঁড়াতে পারছি না। দুটো ল্যাম্প দেখ্ বাবা, লক্ষ্মীটি।"

নেপেন বলিল, "তেল যে নেই।"

স্টেশন-মাস্টার।—তোমরা আমার চাকরি খেলে দেখছি। (দাঁত মুখ বিকৃত করিয়া) এত দিন কাজ ক'রে,—'তেল নেই!' এখানে তেল আবার থাকে কবে? এখানেই যদি থাকবে তো বাড়িতে রাধার কুঞ্জে জ্বলবে কি! দাও না দাদা জল ঢেলে পুরিয়ে, ওপরে মিনিট দশ-পনরো জ্বলবার মত দু পলা ছড়িয়ে দিলেই ঢের হবে। পো-খানেক পথ যাবার পর, নিবে গেলে কি আর বাড়িমুখো-লোক ফেরে! এই বুদ্ধি নিয়ে বুঝি চাকরি করতে এসেছ!

নেপেন।—হ্যাঁ, তারপর ফিরে এসে যদি ঐ কথা রিপোর্ট করে? গণপৎ ব্যাটা যে রকম জালিম লোক।

স্টেশন-মাস্টার।—হাডা ব্যাটা সত্যি থাকবে নাকি? ওর নীল চোখ দুটো দেখলে আমার বুকে খিল্ ধরে! বল কি হে, ও থাকবে!

এমন সময় মিস্টার হার্ডী ডাকিলেন, স্টেশন-মাস্টার!

স্টেশন-মাস্টার।—ঐ নাও। দুর্গা দুর্গা,—(উচ্চকণ্ঠে) ইয়েস সা—র। চাকরি আর রইল না। নেপেন, শীগগির নে ভাই,—কুলি ব্যাটাদের 'ডব্বব উপুড় ক'রে কাজ সেরে ফেল্।

এই সময় টেলিগ্রাফের শব্দ আসায় নেপেন বলিল, "এখন কি করি বলুন? স্টেশন-মাস্টার বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কি করি কি আবার? মরুকগে

ও টরা-টক্কা, বাঁচি তো সামলে নেব। ওর তো আর ঘুষিও নেই লাথিও নেই, এ শালা যে ছুয়েতেই ওস্তাদ, মহীরাবণের বাচ্চা! খোকোশ ব্যাটা আবার চাকরি পাবার কুম্ভকর্ণ! রক্ষে কর্ দাদা, আর কথা ক'স্ নি।—ওরে পল্টু, —ও বাপ গণপৎ, জল্‌দি ল্যাম্প লেকে আও রে যাদু—" এই হাঁকিয়া, 'মধুসূদন, মধুসূদন' বলিতে বলিতে মিস্টার হার্ডীর সম্মুখে হাজির হইয়া বলিলেন, "সব ready Sir (সব ঠিক সাব্)।"

মিস্টার হার্ডী।—তা বুঝেছি! লাইন ক্লিয়ার পেয়েছ, Late (দেরি হয়ে যাচ্ছে, ঘণ্টা দাও।

গাঙ্গুলী মশাই নিজেই ঘণ্টা দিতে ছুটিলেন,—মিস্টার হার্ডীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচেন।

মিস্টার হার্ডী তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া সতীশের হাত ধরিয়া করমর্দন করিতে করিতে বলিলেন, "দেখলে তো তোমাদের দেশের লোকের—দেশের লোকের প্রতি টানের নমুনাটা? আমরা কিন্তু এই সব জীবই পছন্দ করি। এদের যা বলাই—বলে আমাদের সাইকেলখানাও নিজে ব'য়ে গাড়িতে তুলে দেয়। এখন গুড-বাই—তুমি নিশ্চিত থেকো, আমি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে তোমার বন্ধুকে বাড়ি পৌছে দেব। পৌছানো খবর না নিয়ে এখান থেকে নড়ছি না।'

সতীশ দেশী-লোকের সম্বন্ধে মিস্টার হার্ডীর কথা ও নজির কষ্টের সহিত হজম করিতেছিল। সুলতানের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বল ভায়া, এখন আমি যেতে পারি? তোমার সঙ্গে যেতেও আমার কোন আপত্তি নেই।'

মিস্টার হার্ডী বলিলেন, "সে কি কথা! না না, মিছিমিছি তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন! আমি সে ভার নিয়েই তো এতদূর এসেছি।

সুলতান।—(সতীশের প্রতি) "দাদা, আপনার কাছে কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়, সাহস হয় না। সেলিনাকে যে বেদনা মলিন দেখতে হবে না, যা আমার হৃদয়ে চিরদিন একটি ক্ষতের মতই থাকত সে আপনার কৃপায়। আপনার সহৃদয়তা, স্নেহশীলতা ও নির্ভীক সত্যনিষ্ঠাই—সকলকে আমার মত অযোগ্যের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ ক'রে দিয়েছে। আপান এখন অনায়াসেই যেতে পারেন,—আপনি তো আমাকে অসহায় ফেলে যাচ্ছেন না।" এই বলিয়া সুলতান হিন্দুদের প্রথামত সতীশের পদধূলি গ্রহণ করিল। সতীশও তাহাকে বুকে চাপিয়া আলিঙ্গন করিল। উভয়ের চক্ষু বাস্পাকুল হইয়া আসিল।

মিস্টার হার্ডী সুলতানকে বলিলেন, "মনে ক'রো না আমি তোমার গুণ সম্বন্ধে অন্ধ। তোমার কোমল প্রকৃতি, আর তোমার আদর্শ ভগ্নীস্নেহ, আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার প্রকৃতিতে আমি Oriental (প্রাচ্যের) মাধুরী লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সতীশবাবু is a square man (চৌকোস লোক)।" পরে তিনি সতীশকে বলিলেন, 'এইবার উঠে পড়, দেরি হয়ে যাচ্ছে—Good-bye (মঙ্গল-বিদায়)।"

সতীশ গাড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "Yes, for the present (আজকের মত)। কিন্তু আপনার কাছে আমার দুটি বিষয়ের ভুল পাওনা রইল,—আপনার চাকরির কর্তব্য আর নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার, আর আমাদের দেশী (চাকুরে) লোকের—দেশের লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে।" গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

মিস্টার হার্ডী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মাই লর্ড! তুমি শব্দ দুটো ভোল নি। আমি জানি তুমি unsparing (ছাড়বার পাত্র নও)।"

সতীশ।—(চলন্ত গাড়ি হইতে) আজকের জন্যে স্টেশন-মাস্টারকে কিছু বলবেন না।

মিস্টার হার্ডী।—(দুই পা ছুটিয়া) এটাই তোমাদের weakness (চরিত্রের দুর্বলতা); তোমরা রোগ পুষতে ভালবাস। আচ্ছা, তাই হবে।

* * *

তখনও পল্টু ও গণপতের দেখা নাই। স্টেশন-মাস্টার ক্ষিপ্তের মত একবার এদিক, একবার ওদিক করিতেছেন, ও কালিদাসের সপ্ত পুরুষকে নানাবিধ উপহার দিতেছেন।

নেপেন একটি ডিব্বি হাতে বাহিয়া আসিতেছিল, তাহাকে পাইয়া হতাশের মত তাহার হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন, 'ভাই রে, যা হয় করগে। কোথা থেকে যম এসে হাজির হ'ল—আমার চাকরির দফা আজ গয়া হয়ে গেল! বিপদকালে কোনও শালার দেখা নেই!" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।—"আমি এই কাশবনে ঢুকলুম, ব্যাটা ডাকে তো ব'লো—'লম্বা লম্বা দাস্ত চলছে, আবার ছুটেছেন।'—দয়া ক'রে সাপে খায় তো বাঁচি,—এখন সে শালারাও কি ছোঁবে?—উপকার হবে যে! গেরোয় পড়ছে কি না, তাই সেদিন মাগী আবার রোশনাই ক'রে মনসা-পূজো দিয়ে মরেছেন!"

নেপেন তাঁর ফ্যাকাশে মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, তাই তার হাসিটা

দমিয়া গিয়াছিল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের গায়ে হাত দিয়া দেখে, সব রক্ত জল হইয়া গিয়াছে—গা যেন হিম! তিনি অত্যধিক নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেপেন তাঁকে সত্বর বাড়ি গিয়া একটু গরম দুধ খাইয়া শুইয়া পড়িতে জেদ করায়, তিনি হতাশ-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন, "দুধ! সে আর এবার নয় নেপেন, এবারকাব মত ও-বেলা শেষ তিন পো খেয়ে নিছি। এখন ভাই এক বাটি শেঁকো দাও তো খেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হই।—বুধিটাকে তুমি নিয়ে যেও নেপেন।"

নেপেন টিকিট-বাবুকে দিয়া তাঁহাকে কোয়ার্টারে পাঠাইযা দিল ও বলিল, "ভাববেন না, আমি সব ঠিক করছি।"

"আর ঠিক!"—বলিতে বলিতে তিনি টিকিট-বাবুর সাহায্যে কোয়ার্টারে গিয়া 'খাটিয়া' লইলেন।

স্টেশন-মাস্টারেব অবস্থাটা কাহারও কাহারও নিকট বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হওয়াই সম্ভব; কিন্তু কিছুমাত্রও নয়। যেখানে চাকরি plus ( সঙ্গে সঙ্গে ) নানা প্রকাব গলদ, সেখানে মিস্টার হার্ডীর মত কড়া অ ফসবেব ( কমচাবীর ) সমক্ষে ঐ অবস্থাই ঘটে। বিশেষত মিস্টার হার্ডীব report বা recommendation ( মন্তব্য ) যখন ব্যর্থ হয না। এই কাবণে সকলেই তাঁহাকে ভয করিত,—রিপোর্ট ছাড়া তাঁহার হাত-পাও খুব সচল ছিল। তাঁহাব কোপ-দৃষ্টিতে পড়িলে কাহারও বাঁচোযা ছিল না।

* * *

গাড়ি স্টেশন ছাড়িয়া গেল, সতীশ চলিয়া গেল। ষষ্ঠীব জ্যোৎস্নাও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। স্টেশন একপ্রকার লোকশূন্য হইয়া পড়িল।

মিস্টার হার্ডী সুলতানকে বলিলেন, "এইবাব তোমাব পালা।" এবং সেইখান হইতেই উচ্চ গম্ভীর স্বরে "পালটু—ইউ গাণপাটু" বলিয়া নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া যে শব্দ প্রেরণ করিলেন, দূর বৃক্ষবাজি ও মাঠের বিপুল বক্ষ তাহা যেন সহিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা ফেবত দিল:—চতুর্দিক কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই "হুজুব" বলিযা পল্টু ও গণপৎ সম্মুখেই স-সেলাম দেখা দিল, যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিল।

মিস্টার হার্ডী তাহাদের হুকুম করিলেন, "এই বাবুকো ঘর পহুছাদেকর আও। বাবা বাজেকে ভিতব আকে হামকো খবব দেনেসে হাম বকশিশ্ দেগা। বাবু যো চিট্টি দেগা—লেকে আও—হাম্ ইহাঁই রহেগা।"

মিস্টার হার্ডী সুলতানকে নিজের একখানি কার্ড দিয়া বলিলেন, "ইহারা তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে কি না, কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া, এদের হাতেই ফেরত দিও। সেটা কিন্তু বাড়ি পৌঁছিয়া করিও, তার আগে নয়। Mind, they are veteran rouges ( এরা পাকা বদমাইস। )"

গণপৎ বলিল, "হুজুর, লাল্‌টেম্‌ মিলেগা ?"

মিস্টার হার্ডী "আলবৎ" বলিয়া সোজা স্টেশন-মাস্টারের আপিসে ও বুকিং-আপিসে যে দুটি হ্যারিকেন জ্বলিতেছিল, তাহা স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া তাহাদের দিলেন।

পরে সুলতানের হাতে হাত দিয়া একটু নাড়িয়া বলিলেন, "Now—good-night my young friend,—God speed."

সুলতান।—আপনার সাহায্য আমি কখনও ভুলতে পারব না—

সুলতান গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় লইয়া, গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। পরক্ষণেই শোনা গেল, গণপৎ গান ধরিয়াছে—"বতা দে সখি—"

*　　*　　*　　*　　*

স্টেশন-মাস্টারবাবুর তত্ত্ব লওয়ায় নেপেন বলিল, "তাঁর লম্বা লম্বা দাস্ত হচ্ছে।"

মনে মনে হাসিয়া সাহেব বলিলেন, "তুমি গিয়ে তাঁকে সেটা বন্ধ করতে বল,—সেটার আর আবশ্যক নেই। আজকের ত্রুটির আমি কোনও নোটিশই নেব না, কিন্তু ভবিষ্যতে কিছু পেলে, সুদ শুদ্ধ আদায় হবে—সেটা যেন মনে রাখেন।"

মিস্টার হার্ডী এইবার নক্ষত্র-খচিত চন্দ্রাতপ-তলে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া উদাসভাবে বসিলেন। তাঁহার একমাত্র ভগ্নী সোফিয়ার কথা মনে পড়িল। দেড় বৎসর হইল সোফিয়া তাঁহাকে পর পর তিনখানি পত্র লেখে, ও প্রত্যেক খানিতেই—ভারতের রমণীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির, আর নুরজাহান ও তাজমহলের ফোটো পাঠাইয়া দিবার জন্য আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ জানায়। তিনি 'মিছে কাজ' বলিয়া তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। আজ সেই বিস্মৃত কথা বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সোফিয়ার অভিমান-ভারাবনত চক্ষুর মধ্যে, ভ্রাতৃত্বের অবমাননার নালিশ, তিনি আজ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। অন্যমনস্ক হইবার আশায় টেলিগ্রাফ আফিসে ঢুকিয়া পকেট হইতে সেইদিনকার 'ইংলিসম্যান' বাহির করিয়া পড়িতে

বসিলেন।

এদিকে, রাত্র এগারোটার মধ্যেই, পাঁচ-জাতের হৃদয়ের একই সুরে বাঁধা—সত্যকার সাড়াটি—ওড়নাখানিকে পূজার অর্ঘ্যরূপে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

সপ্তমীর প্রভাতে গ্রামস্থ সকলের **"আনন্দময়ী-দর্শন"** ঘটিল।

# পুরসুন্দরী

একজন পাশ্চত্য পণ্ডিতের উপদেশ-মধ্যে পেয়েছিলুম—"তোমার মাথা ধরেছে, এ কথা কাকেও বলতে যেও না ; কারণ, সে বলার কোন সার্থকতা নেই। তোমার মাথা ধরেছে তো অপরের কি ? ও-কথা শোনবার তরে কেউ উৎসুকও হয়ে নেই, তাতে কারও সমবেদনা পাবে না ; কারণ, বেদনাটা তোমার মাথার—অপরের মাথার নয়।" ইত্যাদি।

কথাটা বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক হ'লেও, হিসিবী লোকের কথা,—ফেলে দিতেও পারি নি ; তাই, যে জায়গাটায় মাথা ধরে, সেও তারই এক পাশে বাসা বেঁধেই ছিল।

*     *     *     *

১

তাঁকে আমাদের গ্রামের মেয়েরা রাজার মেয়েই বলত। আমাদের দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তাঁর এক অদূর-সম্পর্কের ভাই থাকতেন ; তাই কখনও কদাচ তিনি এলে গ্রামের মেয়েরা তাঁকে দেখতে পেত।

পুরসুন্দরী ছিলেন—সেকেলে সদরওলার ( সব-জজের ) মেয়ে। সুন্দরী তো ছিলেনই, তার ওপর যখন হীরের বালা হাতে দিয়ে, মুক্তোর মালা গলায় প'রে তিনি আসতেন, সকাল সকাল সংসারের কাজ সেরে দুপুর-বেলা মেয়েদের মধ্যে তাঁকে দেখতে যাবার একটা ছুটোছুটি প'ড়ে যেত। তারপর মাসখানেক ধ'রে তাদের মুখে তাঁর গয়নার বর্ণনা ফুরুত না। শেষে সেটা জমাট বেঁধে দাঁড়াত—"যেন রাস-গাছ" !

তারপর—কোনও বাধা না মেনে, কারুর মুখ না চেয়ে, বার বছর চ'লে গেছে। পুরসুন্দরীর সে বারো বছরের ইতিহাস জানবার তরে আমাদের গ্রামের মেয়েদের কোন দরকারই ছিল না। কেবল ইতিপূর্বে তিনি যখন আসতেন, —তাঁর রূপ, অলঙ্কার আর ঐশ্বর্য দেখে কেউ কেউ ভাবত বটে, তাদের জন্মটাই

মিছে, এমন জন্ম না হ'লেই ভাল ছিল,—পোড়ারমুখো দেবতাদের যেন আর কাজ ছিল না !

ইতিমধ্যে স্বর্গের চোরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—স্বামীকে নিয়ে গেছে; মর্ত্ত্যের চোরে তাঁর হীরা-মুক্তাদি হরণ করেছে; তাঁর কত আদরের মেয়ে গিরিবালা বিধবা হয়ে থান পরেছে। দুর্দৈব—এই শেষের ঘটনাটির ওপর তাঁর দুর্দিনের আর চরম দুঃখের জয়পতাকা এঁটে দিয়ে জয়ী হ'লেও, তাঁকে কোন আত্মীয়ের বা জ্ঞাতীর দ্বারস্থ করতে পারে নি। তিনি আধপেটা খেয়েও স্বামীর ভিটে ছাড়েন নি।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামের তাঁর পূর্বকথিত ভায়ের সন্তানাদি ছিল না; তাই তাঁর বিশেষ আগ্রহপূর্ণ অনুরোধে গিরিবালাকে তাঁর সংসারে পাঠাতে পুরসুন্দরী আপত্তি করেন নি বটে, কিন্তু তার প্রধান কারণ ছিল—তাকে চোখের আড়াল করা। অতিবড় আদরের জিনিসের জীবনব্যাপী যাতনা চোখে দেখার চেয়ে, লোকে তার মৃত্যু পর্যন্ত কামনা ক'রে থাকে,—এটাও সেই হিসাবে।

অবস্থানান্তরের পর এই তাঁর প্রথম গ্রামান্তরে আসা। তিন-চার বিঘে জমি যা অবশিষ্ট ছিল, তার খাজনা দিতে হবে। একাদশীতে পেটের চেষ্টা না থাকায়, টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন। নিমতের উদ্ধব কৈবর্তের কাছে সাত সিকে পেতেন, তাই আমাদের সব-জজের মেয়ে সাত কোশ হেঁটে কাল নিমতেয় গিয়েছিলেন।

আজ সকালে খানকতক শশায় কচি, একটু গুড় আর একপেট পুকুর-জল খেয়ে ফিরছিলেন।

বেলঘর না পেরুতেই ভেদবমি আরম্ভ হয়, একটা পুকুর-ধারে শুয়ে পড়েন। বেলা তিনটের পর বুঝলেন, এতদিনে স্বামী ডাকলেন। তখন কষ্টে মাথায় দু-হাত ঠেকিয়ে, চোখ বুজেই বললেন, "ভগবান, সুখ দিয়েছিলে, ভোগ করেছি; দুঃখ দিয়েছ, মাথা পেতে নিয়েছি; তোমা ছাড়া কারুকে কিছু জানাই নি; তাই আজ তোমাকেই জানাই,—সকল পাওয়াই হয়েছে, যেন গঙ্গা পাওয়াটি থেকে বঞ্চিত না হই। সে উপায় তুমি না ক'রে দিলে আমার আর কে আছে ঠাকুর ?" বলতে বলতে সেই তেজস্বিনীর এতদিনের রুদ্ধ-অশ্রু দু-চোখ বেয়ে ভূমি স্পর্শ করলে।

বেলঘরের বাদল গাড়োয়ান ঘোড়াকে জল খাওয়াতে পুকুরে নাবছিল। সব কথাগুলোই তার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে প্রাণে পৌঁছল। সে

থমকে দাঁড়িয়ে ভিজে গলায় জিজ্ঞেস করলে, "মা, আপনি কোথা যাবে ?"

পুরসুন্দরী চোখ চেয়ে দেখলেন, পুরুষমানুষ। মাথায় একটু কাপড় টেনে আর গায়ের কাপড যথাসম্ভব সামলে বললেন, "বাবা, মা গঙ্গা এখান থেকে কতটা ?"

বাদল।—বেশি নয় মা, কোশটাক। আপনি কোথায় যাবে বল না ?

পুরসুন্দরী।—উপায় হ'লে দক্ষিণেশ্বরের মোডলদের ঘাটে যাই, কিন্তু আমার তো একপা যাবারও বল নেই বাবা !

বাদল।—এই ওপবেই আমার গাডি দাঁড়িয়ে রযেছে মা, ঘোডা দুটোকে জল খাইযে নিতে যা দেরি।

এই ব'লেই সে ঘোড়াকে জল খাইয়ে গাড়ি জুড়ে ফেললে। কিন্তু পুরসুন্দরী দাডাতে পারলেন না। তখন ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন, বললেন, "তোমার কাছে আর তো কিছু চাইতাম না, এই যে আমার শেষ চাওয়া ছিল গো—"

সেই পুকুর-পাডেই বাদলের বাড়ি। সে পরিবারকে ডেকে এনে তার সাহায্যে কোন প্রকারে পুরসুন্দরীকে তুলিয়ে নিয়ে গাড়ি হাঁকিযে দিলে। পুরসুন্দরী প্রায় অজ্ঞান ভাবেই রইলেন। গাড়ি যখন দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এসে থামল তখন বিকেল পাঁচটা।

বাদল যখন বললে, "মা, ঘাটে এসেছ" তখন তাঁর সংজ্ঞা হ'ল ; গঙ্গা-পানে চেয়ে দু-হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকালেন। মনে যেন একটা চরম লাভের আনন্দ আর বল এল,—নাববার তরে চঞ্চল হলেন ; কিন্তু হাতে পায়ে খিল ধরতে লাগল।

এই সময় হিমি-পাগলী গঙ্গা থেকে এক কলসী জল নিয়ে আসছিল, সে হাঁ ক'রে থমকে দাঁড়াল।

হেমাঙ্গিনী আমাদেরই পাডার বউ। শোকে আর দুঃখ-দৈন্যে এক-রকম হয়ে গিয়েছিল। চুপ ক'রেই থাকত, আর নিজে নিজেই হাসত, কাঁদত, কথা কইত ;- উগ্রা ছিল না। সবাই তাকে হিমি পাগলী বলতে শুরু করেছিল।

বাদল তাকে বললে, "মার অসুখ, নামতে পারছেন না, আপনি একটু ধরতে পারবে ?"

হিমি হেসে বললে, "ওমা, তা পারব না কেন—আমাকে কি কেউ কিছু করতে বলে !" এই ব'লে কলসী নাবিয়ে রেখে "এস মা, এস" ব'লে, দু হাত

বাড়িয়ে কোলে নিতে গেল। দেখে, পুরসুন্দরীর মুমূর্ষু মুখেও হাসি এল। তিনি বললেন, "তুমি দাঁড়াও মা, আমি তোমাকে ধ'রে নাবি।"

হেমাকে ধ'রে নাবতে নাবতে, বাদলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আজ অসহায় না হ'লে, আমার যে কত ছেলেমেয়ে, জানতে পারতুম না। মা হয়ে জন্মানো আজ সার্থক হ'ল। তোমরা সব সুখে থাক।" বলতে বলতে চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে দুটি ধারা মুখে বুকে নেবে পড়ল।

আর তিনি দাঁড়াতে পারলেন না, পা থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। গঙ্গাবাসীর ঘরে—মাটির ওপর শুয়ে পড়লেন। বাদল আবিষ্টের মত তখন দাঁড়িয়ে। একটু সামলিয়ে বললেন, "বাবা, তোমার ধার জন্ম নিয়েও শুধতে পারব না, আমার আঁচলে সাত সিকে—"

বাদল আর দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে।

হেমা বললে, "ওমা, মাটিতে শোবে নাকি? আমার চেয়েও বড় হ'লে যে!"

সব কথা তিনি আর শুনতেও পাচ্ছিলেন না, বুঝতেও পারছিলেন না; বললেন, "চাড়ুয্যে-পাড়ায় আমার গিরি থাকে, একবার খবর দিবি মা?"

হিমি-পাগলী হাঁ ক'রে তাঁর মুখের ওপর তাকিয়ে বললে, "তুমি গিরির মা? ওমা, কি হবে গো! পোড়ারমুখো দেবতারা কি সব মরেছে!" এই ব'লেই ছুটল। তার জল-শুদ্ধ কলসী আকাশপানে চেয়ে রাস্তায় প'ড়ে রইল।

৩

আমাদের গঙ্গার ঘাটটি দাতারাম মোড়লের ঘাট ব'লেই প্রসিদ্ধ। তার প্রবেশ -পথের দু ধারেই—গঙ্গাযাত্রীর বা গঙ্গাবাসীর ঘর। দ্বিতলেও একটি সুন্দর ঘর, সেটি অপেক্ষাকৃত নূতন বা হালের তৈরি। আমরা সেইটি দখল ক'রে রিডিং-রুম ও লাইব্রেরি করেছি। তখন আমাদের তরুণ-দলের সে কি উৎসাহ!

সেটা—এখনকার সার্ (Sir) আর তখনকার বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের যুগ; সুতরাং বুঝি না-বুঝি বার্ক, ম্যাটসিনি প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজী বই পড়বার বা নাড়াচাড়া করবার ঝোঁক খুবই। আমাদের মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে

ত্ কথা বলতে পারেন, তাঁর পায়া খুবই উঁচু। বাংলা বইয়ের মধ্যে—হেমবাবুর কবিতা, পলাশীর যুদ্ধ, যোগীন বিদ্যাভূষণের গ্যারিবল্‌ডি, ম্যাজিনি, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি পুস্তকেরই আদর ও পাঠক বেশি। এসব প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা হ'লেও, সেইটাই দেশের চিন্তার, স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষের দিন ; তবে ধাবাটা পূরো ইংরেজীই ছিল।

আবার ইংরেজী শেখা ভদ্রেরা তখন কেউ গভর্মেণ্টের ছাপাখানায়, কেউ জর্জ-হেণ্ডারসন, মেকিনান্ মেকিঞ্জি প্রভৃতি সওদাগরী আপিসে তাঁবেদারি নিয়েছেন। কাজেই তাঁবা গঙ্গার ঘাট ছেড়ে সন্ধ্যা করেন আপিসে, আর বন্দনা করেন অফিসারের,—গঙ্গাতীরের সে ভিড় ভেঙে গেছে। এখন ঘাটটির পুরো পাট্টা আমাদেরই হাতে পড়ায়,—নিঃসঙ্কোচে বৈকালী-বক্তৃতার বেগ বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। ছেলেরা তখন এক-একটি যেন ইংরেজী 'ইডিওমেটিক ফ্রেজের' ফোয়ারা।

হরিগোপাল সে দিন বক্তৃতা করছিল। বিষয় ছিল—মেকলে ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণ। বক্তৃতার মধ্যে যতই ফ্রেজের ফুলঝুরি কাটছিল, ছেলেদের বদন ততই প্রফুল্ল হয়ে উঠছিল। কার সম্বন্ধে এখন স্মরণ নেই, হরিগোপাল যখন ঘাড় তুলিয়ে বললে—"He was a literary abortion, a huge hyperbolic hypocrite,—and a black horse of Western Civilization"—শুনে স্ফর্তিতে সকলেরই মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠল,—করতালির করকাপাত হয়ে গেল। সবারই মনে হতে লাগল, কালে হরিগোপাল দেশের একটা দিকপাল হয়ে দাঁড়াবে।

হরিগোপাল ছাড়া ক্লাবের বাইরে দেখবার শোনবার কিছু থাকতে পারে, সেদিন সে হুঁশ কারুরই ছিল না।

এই সময় আমাদের বড় মাঝি মেঘনাদ এসে সংবাদ দিলে, "একটি ভদ্দর-ঘরের মা-ঠাকরুণ নীচে গঙ্গাবাসীব ঘরে মাটির ওপর প'ড়ে ঝ্যানো কইমাছ কাতরাচ্চে। আমরা তো কিছু করতে পাচ্চি না, তাই হুজুরদের জানাতে এলুম।"

শুনেই যোগীন আর নিবারণ "এস মেঘনাদ" ব'লেই দ্রুত চ'লে গেল।

আমরা ছাতে বেরিয়ে দেখি, পশ্চিম দিক কে যেন গঙ্গাপার হবার জন্যে জটায়ু ডানা মেলেছে—এমনিই মেঘের ঘটা! গঙ্গার ওপর তার ছায়া প'ড়ে জল ধূসরবর্ণ ধরেছে ; তখনও জোর হাওয়া দেয় নি। পালতোলা

পান্‌সিগুলো বকের সারের মত নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটেছে। দৃশ্যটা তখন উপভোগ করবার মত মনও ছিল না, অবকাশও ছিল না। যারা দূরের আসামী তারা বাড়ি ছুটল; কেবল আমরা দু-তিনটি তাড়াতাড়ি ক্লব ঘরের দোর-জানালা বন্ধ করতে লেগে গেলুম। একটা যেন প্রলয় আসছে!

বন্ধ ক'রে ছাদে দাঁড়িয়েছি, তখনও সেই মেঘের গম্ভীর ভাব, মন্থর গতি—সাড়াশব্দ নেই।

দেখি, হিমি-পাগলী এক বগলে একটা ছেঁড়া ময়লা বালিশ, আর এক বগলে তারই রাজযোটক—একটা মাদুর, তার খানিকটা ভুঁয়ে লুটুচ্ছে। মূর্তিতে আর বেশে সেও নিজে তাদের উপযুক্ত বাহকরূপে হন্তদন্ত হয়ে ঘাটের দিকে ছুটে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "এসব নিয়ে কোথায় ছুটেছ গা?'

হিমি হেসে ঘোমটা টেনে বউমানুষের মৃদু গলায় বলছে "ওমা, দেখ নি—রাজকন্যে যে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে! আমার যা ছিল তাই কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি,—আর তো কিছু নেই। তখন তো কত লোক দেখতে ছুটত,—আজ তোমরা কেউ দেখবে না গা? আমার কি দাঁড়াবার সময় আছে,—বকতে পারি না বাছা।" এই বলতে বলতে সে দ্রুতবেগে ঘাটে ঢুকল।

নীচে থেকে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ ওপরে এসে পৌঁছল।

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দেখি, বামাচরণ একটা কুড়োনো ভাঙা কলসী ক'রে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে ছুটে এল। কিছু না পেয়ে, সেই ঘরে কার একটা পরিত্যক্ত নারকোল-মালা দেখতে পেয়ে, সেইটে একটু ধুয়ে তাইতে জল গড়িয়ে রোগীর শুষ্ককণ্ঠে ঢেলে দিলে,—জলের হাত চোখে মুখে বুলিয়ে দিলে। কপালে-ওঠা চোখ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এল,—রোগী যেন একটু আরাম বোধ করলেন।

একটি সুন্দরী যুবতী বুক-ভাঙা বেদনায় কেঁদে উঠল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে মালায় ক'রে জল দিও না গো!"

চেয়ে দেখি, আমাদের পাড়ার গিরিবালা। তবে তো হিমি পাগলী ঠিকই বলেছে—রাজকন্যে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই কি আমাদের বারো বছর পূর্বের সেই হীরের-বালা পরা পুরসুন্দরী!

বিস্ময়ে বেওকুবের মত হয়ে গেলুম। এই রকমই হয় নাকি! এইটেই জগতের নিয়ম নাকি! প্রাণটা দ'মে গেল, এতটুকু হয়ে গেল। আমাদের

তখন প্রখর যৌবন, অসীম আশা, উদ্দাম বাসনা। মুহূর্তের তরে বিশ্বাসটা যেন কালো হয়ে গেল,—'সবুজ' সরে দাঁড়াল,—পাতায় যার বাস, তার ভিতের ভরসা কতটুকু!

৪

মেঘনাদ একটি পিদ্দিম এনে জ্বেলে দিলে। সেটা মৃত্যু-উৎসবের উপযুক্তই ছিল। তার ঘুমভাঙা চোখের মত নিষ্প্রভ মিটমিটে শিখা,—ঘরটার কোথাও আলোর, কোথাও কালোর ছায়া ফেলে, ঘরের মধ্যিকার মনগুলোতে আড়ষ্ট ভাব আর আতঙ্ক এনে দিলে;—রাজকন্যের মৃত্যুর ঘটাটাকে ঘনিয়ে তুললে। শিষটা মাঝে মাঝে মাথা উঁচু ক'রে গলা বাড়িয়ে দেখছিল—আর দেরি কত।

গিরিবালা মার বুকে মুখ গুঁজে পাষাণদ্রাবী কাতর কণ্ঠ তুলেছে। পুরসুন্দরীর তখন সর্ব শরীরে অসহ্য মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত। দশ বছর মুখ বুজে দারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করার—আজ তিনি শেষ পরীক্ষা দিচ্ছেন। পাছে তাঁর কষ্ট দেখে গিরিবালার কষ্ট হয়, তাই—সে কি বরদাস্ত, সে কি সংযম, মৃত্যুর সঙ্গে সে কি কস্তাকস্তি! সন্তানের মুখ চেয়ে, প্রতি মুহূর্তে এমন ক'রে মরণের বিষদাঁত ভাঙতে এক মা-ই পারেন। বললেন, "ভাবিস নি গিরি, ভগবানের পায়ে রইলি।" বলতে বলতে স্বর বন্ধ হয়ে এল, দু চোখ জলে ভেসে গেল।

গিরিবালা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতেই, হাতড়ে হাতড়ে তার মাথায় হাত দিয়ে, কপালে মায়ের শেষ স্নেহহস্ত বুলুতে বুলুতে কষ্টে কম্পিত কাতর-কণ্ঠে বললেন, "গিরি, কাঁদিস নি মা,—মাথা ধরবে।

শুনে চমকে উঠলুম।

বাতাস স্তব্ধ হয়ে, আকাশ বেদনা-বিষণ্ণ মুখে গুম হয়ে এতক্ষণ সব সহ্য করছিল; তারাও আর পারলে না। একটা দমকা দীর্ঘশ্বাসে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে, বিপুল বেদনায় আকাশটা বিকট একটা চীৎকার ক'রে ফেটে গেল; আর তা থেকে তীব্র আলো ছুটে এসে ঘরে ঢুকে সকলকে চমকে দিয়ে, আমাদের পুরসুন্দরীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

# থাকো

১

কথাটা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের। তখন কলিকাতা হইতে গঙ্গার উভয় তীরস্থ দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে গ্রামগুলি ক্রমেই 'কেরানী গ্রাম' হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ভদ্রলোকের ছেলে হইলেই সোনার দোত-কলমের আশীর্বাদ পাইত এবং হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই 'হাত পাকাবার' উপদেশ ও তাগিদ চলিত। এই হাতের লেখাই 'ভাতে'ব উপায়—এই কথাটাই যখন তখন শুনিতে হইত।

বাংলা পডায কোন লাভই নাই, তাই তাডাতাড়ি বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইযা আমিও ইংরাজী ইস্কুলে যাতাযাত আরম্ভ করিয়াছি।

ঠিক এই সময় বঙ্কিমবাবু তাঁহার নব-প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে' লিখিলেন—"বাঙ্গালীর বাহুবল"। (এ গৌরবের কথাটা আমাদের সময পর্যন্ত সম্মান পাইয়া আসিযাছে।) তাই বোধ হয় বাবার খরদৃষ্টি (এখনকার ফ্রেজ্ অনুসারে angle of vision) ছিল, ছেলেদের মাথার দিকে নয়,—হাতের উপর। কাজেই নিত্য ছয়-তক্তা ইংবাজীলেখা মক্স করিতেই হইত; পড়ার কাজটা পশ্চাতেই পড়িয়া যাইত।

সেই সবে লেনি সাহেবের 'গ্রামার' ধরিয়াছি, এবং বেণী মাস্টার 'মাব' ধরিয়াছেন। এই দ্বিবিধ মারের চোটে আমার ঝোঁকটা পিতৃ-আজ্ঞা পালনের দিকেই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। স্বপক্ষেও পাইয়াছিলাম—"পিতবি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা"; এবং সাহেবেরা যে দেবতা নহেন, এমন ধারণা ইতর-ভদ্র স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তখন ছিল না বলিলেই হয়। প্রীত পিতার আশীর্বাদে আমাব হাতের রঙ ধরিতে বিলম্ব হয় নাই।

সন্তাগণ্ডা থাকায় বিশ-পঁচিশ টাকা বেতনই তখন যথেষ্ট বলিয়া মেয়ে-পুরুষের সমর্থন পাইত, কারণ ও-জিনিসটির বাড় 'কেব্‌মে কেব্‌মে'।

তাই ছেলেকে প্রথম চাকুরিতে পাঠাইবার দিন, মা একাগ্র কামনায় 'মা মঙ্গলচণ্ডীর' ঘট স্থাপনা করিতেন। ছেলে তাহা প্রণামান্তে, তুলসীতলায় প্রণাম সারিয়া, পিতামাতা ও গুরুজনের পদধূলি এবং দধির ফোঁটা লইয়া, গৃহদেবতা নারায়ণেব তুলসী কানে গুঁজিয়া, শত দুর্গানামের মধ্যে রওনা

হইত। মা তখন বাষ্পাকুল নেত্রে হরির তলায় প্রণাম করিয়া সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি মানসিক করিতেন। ছেলেরও জন্ম সার্থক হইত, মাও রত্নগর্ভা বলিয়া পরিচিতা হইতেন। ছেলেকে চাকুরিতে এই দীক্ষা দেওয়াটা দশবিধ সংস্কারের কোনটা অপেক্ষাই ছোট ছিল না।

তখন এই সম্মানের কাজটিতে ঝুঁকিয়াছিলেন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। সম্মানের কাজ ভাবিবার কয়েকটি কারণ ছিল,—চাকরি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের নিকট 'বাবু' আখ্যাটি লাভ হইত; তাহারা বুঝিয়া লইত, বিদ্যার জাহাজ না হইলে আর ইংরাজী দপ্তরে কাজ হয় নাই। ধারে জিনিস যোগাইতে মুদীর আপত্তি অন্তর্হিত হইত। চাকুরির সহিত চাপকানের নিকট-সম্বন্ধ ঘটায় ধোপার সংস্রব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিত; আর এই বিবিধ সংযোগে পরিধেয়টা সম্মানসূচক দাঁড়াইয়া মনটাকেও উচ্চ সুরে বাঁধিয়া দিত। অশিক্ষিতেরা আপদে-বিপদে বাবুর নিকট সলা-পরামর্শ লইতেও আসিত।

আবার অসুবিধাও ছিল অনেক; তবে তাহার অধিকাংশই বাড়ির স্ত্রীলোকেরা ভোগ করিতেন।

আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি গঙ্গার পূর্বকূলে, কলিকাতা হইতে ছ মাইল উত্তরে। কুটির-পান্‌সি ছিল কুটিওলা বা কেরানীবাবুদের আপিস যাতায়াতের একমাত্র যান। তাহা দুই ঘণ্টায় কলিকাতায় পৌঁছিত, জোয়ার-কোটালে আরও অধিক সময় লইত। কাজেই কুটিওলাকে, কি শীত কি গ্রীষ্ম, আটটার পূর্বে প্রস্তুত হইয়া রওনা হইতে হইত।

এই প্রস্তুত হওয়াটির পশ্চাতে থাকিত—বাটির স্ত্রীলোকদের ৪টা থাকিতে উঠিয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া এবং গৃহদেবতা নারায়ণের 'পূজার জো' সারিয়া 'কুটির-ভাত' চড়ানো। সেই গতিশীল অবস্থাতেই তাঁহাদের আহ্নিক. জপ, স্তোত্রাদি আবৃত্তি, বিষ্ণুর সহস্রনাম অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিত।

বউ-ঝিরা ইতিমধ্যে গৃহাদি মার্জন, বাসন মাজা, শয্যা-সঙ্কোচ সারিয়া, গা ধুইয়া কুটিওলার জন্য পান সাজা, আহারের স্থান প্রস্তুত, কুটির কাপড় গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি কার্যে ও কর্ত্রীঠাকুরাণীর ফাই-ফরমাজ খাটিতে ব্যস্ত থাকিতেন। ফল কথা, রাত্রি চারিটা হইতে বেলা আটটা পর্যন্ত বাড়িতে যেন একটা নিত্যনিয়মিত চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট ছিল, এবং তাহা শেষ হইত কুটিওলাকে 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া বিদায় দিবার পর।

এই উদ্‌যোগ-পর্বের মধ্যে কেরানীবাবুর নিজের যে কোন কাজ ছিল না

তাহা নহে। তাঁহাকেও পাঁচটায় উঠিয়া ছয়টার মধ্যে স্নানাদি ও পুষ্প সংগ্রহ শেষ করিয়া পরে নারায়ণের পূজা ও ভোগ সারিয়া আহারে বসিতে হইত।

যে সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল মাতা বা অন্য কেহ বর্ষীয়সী আত্মীয়া আর বধূ এবং বধূর কোলে কাচ্চাবাচ্চা, তাঁহাদের পক্ষে এই নিত্যকর্মটি নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। বোধ করি, তাঁহাদের জন্যই আমাদের গ্রামে একটি 'থাকো'র আবির্ভাব হয়।

আমাদের কথাটা সেই থাকোকে লইয়া।

২

থাকোর বয়স বা রূপের সহিত আমাদের এ প্রসঙ্গের কোন সম্পর্কই নাই।

বাল্যকালে একটি প্রৌঢ়াকে নিত্য সকালে দশ বাড়ি ঘুরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতে দেখিতাম; তাহাতে এমন কোন অসাধারণত্ব ছিল না যে, তাহা কাহারও লক্ষ্যের বস্তু হয়।

পিসি, মাসি, খুড়ি প্রভৃতি সম্বোধনেই স্ত্রীলোকেরা থাকোর সহিত কথা কহিতেন। কোন কোন বর্ষীয়সী এই স্ত্রীলোকটিকে 'বউমা', কেহবা 'থাকো' বলিতেন। বধূরা 'মা'ও বলিত। পল্লীগ্রামে এই আত্মীয় সম্বোধন চিরপ্রচলিত ও এতই সহজ যে, কাহারও অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করে না। ব্রাহ্মণ-কন্যা কৈবর্ত-কন্যাকে মাসিমা বলিতেছেন বা ব্রাহ্মণে মুসলমানে খুড়ো জ্যেঠা সম্বোধন—ইহাই ছিল পল্লীর মধুর বন্ধন, ইহাতেই ছিল পল্লীর শক্তি ও সুখ।

থাকো ছিল একটু ঢ্যাঙা; রোগাও নয়, মোটা তো নয়ই। গৌরাঙ্গী, প্রশস্ত সুস্পষ্ট সিন্দূররেখা-সমুজ্জ্বল উন্নত ললাট। কপাল-ঢাকা অবগুণ্ঠন সর্বদাই থাকিত। নাকে মাঝারি মাপের একটি টক্‌টকে সোনার নথ। কানে বা গলায় কি ছিল না-ছিল তাহা স্ত্রীলোকেরাই দেখিয়া থাকিবেন। হাতে শাঁখা, নো, আর দুগাছি মাটা বালা। থাকোকে কখনও ধোপদস্ত ধপধপে কাপড় পরিতে দেখি নাই, মলিন বাসেও দেখি নাই। টকটকে লালপেড়ে আড়্‌ময়লা শাড়ি পরিতেই দেখিতাম।

কখনও কোনদিন থাকোকে হঠাৎ দেখিয়া মনে হইয়াছে,—বরাবর এই স্ত্রীলোকটিকে এক ভাবেই দেখছি,—মুখে কথা নাই, খাটুনিরও বিরাম নাই।

বিরক্তিও দেখি নি, ব'সে গল্প করতেও শুনি নি ; খুব সামর্থ্য বটে ! একা বিশ বাড়ির তোলা-পাট সামলে বেড়ায়, অথচ ভদ্রঘরের মেয়েদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। মেয়েদের গয়না পরার সাধ ইতরভদ্র-নির্বিশেষে স্বাভাবিক। সেই সাধ এর বোধ হয় খুব প্রবল, তাই এত খাটতে পারে। বাড়ি-পিছু আট আনা ক'রে পেলেও মাসে দশ-বারো টাকা হয়। ইত্যাদি।

থাকো এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি এত দ্রুত চলিয়া যাইত যে, তাহার মুখের একটা ঠিক ছাপ কাহারও চক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না। বহুদিন পরে একবার চকিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম,—শান্তি গাম্ভীর্যের উপর চক্ষু দুইটিতে যেন প্রসন্নতা ও করুণা মাখানো। কই, এত দ্রুত যাতায়াতের মধ্যে চাঞ্চল্য কোথায় !

আমাদের অতশত ভাবিবার, বা বুঝিবার, বিশ্লেষণ করিবার বয়স তখন নয়। তরুণ-চাঞ্চল্যের মুখে ওসব ভাব, ওসব চিন্তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়,—বিশেষ ছোটলোক সম্বন্ধে !

আমাদের তখন কাজ কত ! লেখাপড়া ছাড়া আরও কত নূতন নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে ও হইবার জন্য উঁকি মারিতেছে। জিম্‌নাস্টিকের আখড়া খোলা হইয়াছে। বামাচরণ কেয়া ভল্ট খায়, কার্তিক ইয়া পিকক্ হয় ! ট্রাপিজের top-boy-কে বা বাচ্চা-চূড়ামণিকে তালিম চলিয়াছে,—শ্যামবাবু শনিবার শনিবার কলিকাতা হইতে আসিয়া শিক্ষা দেন, আমাদের গুল টিপিয়া দেখেন ; উৎসাহ উন্মাদনার সীমা নাই। আবার মুকুজ্জেদের নরসিংবাবু গ্রামে অ্যালবার্ট ফ্যাশানের চুল-ছাঁটা ও চুল ফেরানো আমদানি করিয়া যুবকদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন,—চিত্ত তাহাতেও পড়িয়া রহিয়াছে, - সময়ে অসময়ে নিজের নিজের মাথায় তাহার মশ্ক চলিতেছে। তাহার উপর খগেনবাবু রূপার পইচে পরা ক্লারিওনেট আনিয়া তরুণদের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। বাঁশীর টান সম্বন্ধে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন, যমুনা তীরের নমুনা স্মরণীয়।

ফল কথা, কেরানীদের নিত্য কলিকাতায় যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামে নব নব ভাবের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়া,—অশিক্ষিত ইতর সাধারণের সখ্যবন্ধন হইতে ক্রমেই আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া দিতেছি, এবং তাহারা 'ছোটলোক' আখ্যা পাইতেছিল। এ অবস্থায় ঝি-দাসীর কথা তরুণদের চিন্তা-চর্চার বিষয় হইতে পারে না। আর এত কাজের ভিড়ে আমাদের সময়ই বা

কোথায় !

*     *     *     *

বিন্দুবাসিনী-তলার রাম বন্দ্যো আমার চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের বড় ছিলেন। অমন অমায়িক সহৃদয় মিষ্টভাষী যুবক দেখা যায় না। ওই বয়সেই তাঁর প্রকৃত কবি-প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। বাগবাজারের নন্দ বোসের বাড়ি হাফ-আখড়াই হইবে, এই সংবাদ লইয়া তিনি একদিন সকালে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শেষ বলিলেন "তোমার এ বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাই জানাতে এলুম ;—নিশ্চয়ই যাওয়া চাই।"

এত বড় কম্‌প্লিমেণ্ট ও এমন দুর্লভ জিনিস ছাড়া যায় না, আমি আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। তাহার পর পূর্বেকার কবি ও হাফ-আখড়াই সম্বন্ধে আমাদের খুব উৎসাহের সহিত আলোচনা চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় থাকো এক বাড়ির কাজ সারিয়া অন্য বাড়ি দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল। আমাদের অত বড় প্রিয় প্রসঙ্গটা সহসা থামিয়া গেল। রামবাবু বলিয়া উঠিলেন, "দিনের আলেয়ার মত এ স্ত্রীলোকটি কে হ্যা ?"

হাসিয়া বলিলাম, "আলেয়া মানে কি ? সকালে বাড়ি বাড়ি তোলাপাট ক'রে বেড়ায়।"

রামবাবু আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস হয় না। তুমি জান না।"

বলিলাম, "পাঁচ সাত বছর প্রত্যহই দেখে আসছি—ওই এক ভাব, কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করি নি,—কারও না কারও কচি ছেলে কোলে আছে, আর ওইরূপ দ্রুত যাওয়া আসা ; অনেক বাড়ির কাজ মাথায়—"

রামবাবু বাধা দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত ভাবে বলিলেন, "বুঝতে পারলুম না।"

বলিলাম, "কেন বলুন দিকি ? আর আলেয়া বললেন কেন ?"

রামবাবু যেন আপনা-আপনি মুগ্ধভাবে বলিয়া গেলেন, "ঘোমটার আড়ালে —বর্ণে স্বর্ণে সিন্দূরে হঠাৎ যেন আঁচল-ঢাকা প্রদীপ দেখলুম। বাঃ !"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "একজন সাধারণ প্রৌঢ়াকে দেখেও আপনাদের এত ভাব আসে ?"

রামবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "দেখ, সোনার মূল্যটা তার মালিকের জাত বা কর্ম ধ'রে কম বেশি হয় কি ? যাক, আমি ভাবছি, ওই অবগুণ্ঠনটুকুর কথা,—ওইটিই হিন্দুনারীর রিফ্লেক্‌টার। ওই আবরণ-ঢাকা প্রকাশেই মাধুর্য।

ভগবান ব্রহ্মাণ্ডটা নিজের আবরণ দিয়ে ঢেকে না রাখলে কবে শুকিয়ে, চুঁয়ে-পুড়ে বদ-রঙ আর কদাকার হয়ে যেত,—এমন তাজা এমন সবুজ, এমন সরস থাকত না।”

শুনিয়া আমি তো অবাক! কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম! কবি বা হাফ-আখড়ায়ের কথা আর জমিল না। রামবাবু একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন, “তুমি একটু খোঁজ নিও। আজ চললুম, শনিবার এক সঙ্গেই যাব।”

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম, “ওর আর খোঁজ নেব কি, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে—”

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া “আচ্ছা, সে আমিই নেব, তোমার বড় কাছে—তুমি পারবে না।” বলিতে বলিতে রামবাবু চলিয়া গেলেন।

ভাবিতে লাগিলাম, কবি মানে পাগল না কি!

* * *

যাহা হউক, মানুষের মন কোন একটা বিষয় গ্রহণ না করিতেও পারে, কিন্তু চক্ষু তাহা এড়াইয়া চলিতে পারে না। প্রায়ই চোখে পড়িত থাকো কে ঘটি দুধ লইয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি ফিরিতেছে; কাহারও কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে, কারুর কোলের-ছেলে থাকোর কোলে। কোন দিন প্রত্যুষে গামছায় তিন-চারিটা ইলিশ মাছ লইয়া তিন-চার বাড়ি ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কুটিয়া দিতেছে। কোথাও বাটনা বাটিতেছে। কোন বাড়ি এক কলস গঙ্গাজল আনিয়া দি[illegible]; কাহারও বাড়ি পান সাজিতেছে। এমন ত্বরিত কর্মী দেখি নাই।

কি ভদ্র, কি ইতর কাহারও বাড়ি ঢুকিতে থাকোর কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না—এটা লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ তাহার সম্ভ্রমের দিকে এত বেশি নজর ছিল যে, মাথার কাপড় অসংযত হইতে বা পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কখনও দেখি নাই। আর একটি বিষয় নজরে পড়িত, থাকোর এই তোলাপাট প্রধানত গরিব বা পরিজন-বিরল মধ্যবিত্ত কুটিওলা বাবুদের বাড়িতেই ছিল। বড়লোকের বাড়িতে তাহাকে এ কাজ স্বীকার করিতে দেখি নাই, বড়লোকের মধ্যে তাহাকে নিয়োগীদের বাড়ি ঢুকিতে দেখিয়াছি। সেটার সময়-অসময় বা নিয়মিত সময় ছিল না, সুতরাং কাজের জন্য নিশ্চয়ই নয়।

৩

গ্রামের তিন-চার ঘর বড়লোকের মধ্যে নিয়োগীরা ছিলেন অন্যতম ও আধুনিক, অর্থাৎ এক পুরুষে হালি বড়মানুষ। তাহার মূলে ছিল,—রেড়ির তেলের কলকারখানা ও ফালাও কারবার,—জাহাজী চালান। তাহাতে গ্রামে লোক ও শ্রমিক সমাগম, কর্মচাঞ্চল্য, বাজার, বসতি, দোকান প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল, ও ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে নব-জীবনের সাড়া আনিয়া দিতেছিল।

নিয়োগী-কর্তা লেখাপড়া সামান্যই জানিতেন; কমবুদ্ধি, শ্রম ও অধ্যবসায় বলেই তাঁহার বৈভব। সুন্দর অট্টালিকা, গাড়ি-জুড়ি, দাস-দাসী, দ্বারবান, বহু পরিজন, বারো মাসে তেরো পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, ক্রিয়া-কলাপ, দান-দক্ষিণা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা ভোজ, গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করা—সবই তাঁহার ছিল; আর ছিল—এক পুত্র ও একটি নাতী। তাঁহার বাড়ির ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক বিদায়, বস্ত্র বিতরণ, কাঙালী-ভোজন, দুর্গাপ্রতিমা, প্রতিমার সাজ, এ সবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল,—কোথাও কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র থাকিত না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, "বাগবাজারের পোলের এপারে ইদানীং আর এরূপ ক্রিয়াকর্ম অন্য কোথাও দেখা যায় না।" আমরাও দেখি নাই।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল—নিয়োগী-বাড়ির শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মীপূজা। সেরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমা, সাজ, সমারোহ, আয়োজন, উপকরণ, ভোজ আর কোথাও দেখি নাই। তাহার ব্যয় দুর্গোৎসবের ব্যয়ের তুল্য বা সমধিক ছিল। এই উপলক্ষে রাত্রি জাগরণচ্ছলে যে আনন্দোৎসবের আয়োজন হইত, তাহারও বিশেষত্ব ছিল। গ্রামের লোকে যে-বৎসর যাহা দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই ব্যবস্থা করা হইত। তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির ভাগ্যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শখের কি পেশাদার অপেরা, থিয়েটার, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন প্রভৃতি দেখিবার শুনিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের সর্বসাধারণকে প্রীতি ও আনন্দ দানের উৎসাহ ছিল বলিয়া, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া ধরণীঠাকুরের কথকতা, জগা স্যাকরার চণ্ডী প্রভৃতি বিশেষ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানগুলিও মধ্যে মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া চলিত। তাহাতে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার আনন্দলাভ, শিক্ষা ও চিত্ত পুষ্টি সহজেই হইত।

এ সব ছিল নিয়োগী মহাশয়ের 'ছিল'র দিক। ছিল না কেবল

বনিয়াদী-বুদ্ধি, টাকা ব্যয়-বর্জনের পাকা হিসিবি-চাল ও চাপা হাসির মধ্যে বিদ্রূপ-মিশ্রিত বিজ্ঞ বক্তৃতা।

এরূপ সংসারে আর যা কিছু থাকুক না থাকুক, কুড়ে আর কুপোষ্যের অভাব থাকে না। তাঁরও কুকুর বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিপাল্য জুটিয়াছিল।

তিনি একদিন আহারের সময় একটি বিড়ালকে দেখিতে না পাওয়ায় কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে, সে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া মাছ খাওয়ায় তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমার এ শুভাকাঙ্ক্ষী উপকারীটি কে? পেটের জ্বালায় ভদ্রলোকেও চুরি করে;—সে খেতে পেলে হাঁড়ি ভাঙতে যাবে কেন? সকলে জেনে রেখো, আমি মুখ্খু চাষা, এই গ্রামেই মুড়ি-মুড়কি বেচেছি। এ ধন-দৌলত 'মা'র, আমি মজুর;—কার ভাগ্যে এ সব আসে, আর কাদের জন্য তিনি দেন, তা জানি না। এতে সবারই অধিকার আছে। এ বাড়িতে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের তাড়াবার অধিকার কারুর নেই। যত দিন নেউকীর এক মুঠো জুটবে—তাদেরও জুটবে।"—এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, আহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

গৃহিণী অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "আমাকে এ কথা কেউ শোনায় নি—"

গৃহিণীকে কথাটা সাঙ্গ করিতে না দিয়াই কর্তা বলিলেন, "তোমাকে বাড়ির কথা শুনিয়ে ফল নেই ব'লেই শোনায় নি।"

খোঁচাটার অর্থ বুঝিতে কর্ত্রীর বিলম্ব হইল না। তিনি ব'লেন, "জগতে শুধু তো ঘর ব'লে জিনিসটি নেই, 'বার' ব'লে তার চেয়ে ঢের বড় জিনিসটিও রয়েছে। দুজনকেই কি ঘর নিয়ে থাকতে হবে! এই যে কাল রাত্তিরে বুধুয়া-সইসের বউ, আহা, কি ব্যথাটা খেয়েই বিয়োল, তোমাকে কেউ তা শুনিয়েছে কি, না, তোমাকে তার সেবার ব্যবস্থার ভার নিতে হয়েছে? এখানে তার কে আছে বল তো?"

কর্তা সাফাই হিসাবে একটা ভবা ধ্রুবণের জবাব দিবেন ভাবিয়া আরম্ভ করিলেন, "স্ত্রীলোকের খোঁজ—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোক হওয়াটা তো কারুর অপরাধ হতে পারে না, তারও তো আপদ বিপদ, দুঃখ কষ্ট আছে; তাকেও তো কারুর দেখা চাই! আর তোমার শঙ্করীই (নির্বাসিত বিড়ালটি) কি—।" এই

পর্যন্ত বলিযাই গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিলেন, তাঁহার চক্ষে হাসির আভাস ভাসিয়া উঠিতেছিল।

কর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এখন দুটো পান পাব কি? আজ আর কলকেতা যাওয়া হ'ল না, শঙ্করীকে খুঁজে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গৃহিণী পানেব ডিপে কর্তার হাতে দিয়া বলিলেন, "বেলা তিনটের পর কিছু খেতে হবে কিন্তু। শঙ্করী তো এখন বাইরের লোক, তায় স্ত্রীলোক, তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, গয়লা-বউ সাত দেশ বেড়ায, শঙ্কবীকেও চেনে, আমি তাকেই ধরছি।'

কর্তা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন ও বলিলেন. "কিন্তু আনাই চাই।" তাহার পর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "হাঁ, বুধুযাব বউযের আব কোন কষ্ট নেই তো? বুধুয়া ব্যাটা কি পাজি গো, আমি ববাবর জানতুম ভালমানুষ,—বদমাইস ব্যাটা—"

কথা শেষ হইবার পূর্বেই গৃহিণী ঈষৎ হাস্য ও কোপ মিশ্রিত কটাক্ষে "তুমি চুপ কর তো" বলিয়াই দ্রুত সরিয়া গেলেন। কর্তা বহির্বাটীতে গিযা বসিলেন ও চাড়ুজ্জে-মশাইকে সংবাদ দিলেন।

এই চাড়ুজ্জে মশাই ছিলেন কর্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিযোগী-বাডির সবত্রই তাঁহার অবাধ গতি ছিল, তাঁহার নিকট কর্তাব কিছুই গোপন ছিল না। উভযের মধ্যে একত্র ওঠা-বস', হাস্যালাপ, সলা-পরামর্শ নিত্যই ছিল। নিয়োগী বাড়ি ও নিয়োগী-কর্তা সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবাব আমাদেব কোন প্রয়োজন নাই,—এই সংক্ষিপ্ত সারটুকুই যথেষ্ট।

পূর্বেই বলিয়াছি, বড়লোকদেব বাড়িব মধ্যে কেবল এই নিয়োগী-বাড়িতেই থাকোর সহজ গতিবিধি দেখিযাছি। কর্তা ও চাডুজ্জে মশাই সদর-বাড়ির রোয়াকে বসিযা গল্পাদি করিতেন, থাকোকে কখনও কখনও এক আধ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রশ্নের বা ইঙ্গিতের জবাব দিতেও শুনিয়াছি।

একদিন থাকোকে নিয়োগী-বাড়ি হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কর্তা কথাচ্ছলে চাড়ুজ্জেকে বলিলেন, "দেখ চাডুজ্জে, ভগবান সব সুখ দিলেও কপালে না থাকলে কটা সুখই বা লোকে ভোগ করতে পারে!"

কথা শেষ না হইতেই থাকো সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। "কারও সুখের হিসেব রাখবার মুহুরিগিরি না ক'রে নিজেরাই সেটা ভোগ করুণ

না।"—বলিতে বলিতে থাকো বাহির হইয়া গেল।

চাড়ুজ্জে হাসিয়া বলিলেন, "ওকে জিততে পারবে না।"

একদিন কানে আসিল, নিয়োগী-মশাই বলিতেছেন আর ঠিক সেই সময় থাকো নিয়োগী-বাড়ি ঢুকিতেছে,—"লোকে বলে লিখে লিখে হাত পাকে—ওটা কথার কথা; বরং বাটনা বেটে হাত পাকে, কি সুন্দর রঙ ধরে, কি সুশ্রীই দেখায়! নয় কি চাড়ুজ্জে?"

চাড়ুজ্জেকে কিছু বলিতে হইল না।

"তা হোক, আমার তো আর ঘটকির ভয় নেই।"—বলিতে বলিতে থাকো ভিতরে চলিয়া গেল।

পল্লীগ্রামে এরূপ রহস্যাদি গ্রাম-সম্পর্কবিশেষে দোষের তো ছিলই না, বরং সহজ আনন্দ ও প্রীতির পরিচায়ক ছিল।

* * *

বেলা তিনটার সময় বিড়াল কোলে করিয়া থাকো তাড়াতাড়ি নিয়োগী-বাড়ি ঢুকিতেছিল। সদরেই কর্তা ও চাড়ুজ্জে-মশাইকে দেখিয়া, কর্তার কোলে শঙ্করীকে দিয়া, তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই অন্দরে গিয়া ঢুকিল।

কর্তা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করীকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাঁহার অল্পই ছিল। সামলাইয়া বলিলেন "এ জাতের অসাধ্য কিছুই নেই, এরাই একাধারে জগতে সোনার কাটি রূপোর কাটি।"

চাড়ুজ্জে বলিলেন, "ও আর আমাকে বলছ কি! ওঁরা ভানুমতীর সহোদরা,—চক্ষু দুটির একটি অনুবীক্ষণ, একটি দূরবীক্ষণ,—ছাতে উঠলেই Observatory (মানমন্দির), ঘাটে গেলেই Newspaper (সংবাদ-পত্র)—"

কথা শেষ না হইতেই বাড়ির মধ্যে ডাক পড়িল। সেথায় উভয়কেই জলযোগে বসিতে হইল।

শঙ্করীও একবাটি দুধে মনোযোগ দিল।

৪

দুর্গোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নিয়োগী-বাড়ির সাজসজ্জা তেমনই আছে, কারণ, চার দিন পরেই শ্রীশ্রীকোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, এবং সে পূজার সমারোহ, ব্যয়, আনন্দ, কোনটিই দুর্গোৎসব অপেক্ষা কম নহে। প্রকৃত

কথা, নিয়োগী-বাড়ির দুর্গোৎসব যেন কোজাগর-পূর্ণিমান্তে—প্রতিপদে শেষ হইত।

এবার কিন্তু একটি ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। একাদশীর রাত্রে পুরোহিত-ঠাকুরের মা গঙ্গালাভ করায়, এবৎসর তাঁহার দ্বারা লক্ষ্মীপূজা আর সম্ভব নহে।

নিয়োগী-মহাশয় এই ঘটনায় বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন; কারণ, তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা ভঙ্গ করিতে ভয় পান, অথচ এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরও নাই।

পুরোহিত-ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ভাল লোকই এনে দেব, সুপণ্ডিত—"

ঐ পর্যন্ত শুনিয়াই চিন্তাকুল কর্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ মুখ্খুর বাড়ির কাজে টুনি সাহেবকে (প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপল টনি সাহেব) তো দরকার নেই। পূজা করতে পারেন এমন লোকই দরকার।"

পুরোহিত বলিলেন, "বেশ, তাই হবে; কালীঘাটের তন্ত্ররত্ন-মশাইকে ঠিক ক'রে আসছি। তিনি নিত্য লক্ষ জপ ক'রে সন্ধ্যার পর একটু দুধ খান।"

কর্তা আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "থামুন থামুন, লক্ষ্মীপুজো তো 'গেরোন' নয় যে, আমার পূর্ণাভিষেকের জন্যে তান্ত্রিক জাপক চাই। কারুর সার্টোফিকট আমাকে শোনাতে হবে না। দুধ খেয়ে শঙ্করীও থাকতে পারে।"

চাড়ুজ্জে-মশাই পুরোহিত-ঠাকুরকে ইশারায় চুপ করিতে বলিয়া স্বয়ং বলিলেন, "অত-শতয় কাজ নেই, তোমার জানাশোনা একটি ভাল লোক দিলেই হবে।"

কর্তার মনটা আজ খুবই খারাপ ছিল, তিনি প্রিয় সহচর চাড়ুজ্জের প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, "তুমিও গোল্লায় গেছ দেখছি! না না, আমি ওসব ভাল-টালো চাই না। ওই 'ভাল' কথাটায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। এক-একজনের ভাল এক-এক রকম, ভাল আমার অনেক দেখা হয়েছে। ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে শুনেছিলুম, 'খুব ভাল মেয়ে, ইংরিজীতে কথা কইতে পারে।' 'খুব ভাল'র মানে বুঝলে? এখন ভালর কথা ছাড়, মার পূজাটি করতে পারেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হ'লেই হবে।"

পুরোহিত এবার বিশেষণ বাদ দিয়া বলিলেন, "তা না তো কি, আমি তাই

আনব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

চাটুজ্জে হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, উনি তৈলঙ্গ স্বামীকে কি বিদ্যাসাগর-মশাইকে আনছেন না।"

কর্তা ব্যাজার ভাবে বলিলেন, "না হে, তুমি বোঝ না; নেউকীর পয়সা হয়েছে, ওখানে একটা 'পেল্লেয়ে' কিছু না হ'লে ভাল দেখাবে না, মানাবে না—তোমাদের এ রকমের ভুল খুবই আছে, আর তা করাও হয়।"

চাটুজ্জে-মশাই হুঁকার অন্তরালে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, পুরোহিত-ঠাকুর বলিলেন, "তবে এখন আমি চললুম।"

কর্তা বলিলেন, "কিন্তু বৈকালে একবার আসা চাই, বাড়িতে কি বলেন সেটা শোনা দরকার; কি বল চাটুজ্জে?"

"তা চাই বইকি, আমি আসব 'খন।"—বলিয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন।

চাটুজ্জে বলিলেন, "এইবার কাজের কথা কয়েছ, আমিও তাই ভাবছিলুম, ব্যাপারটা কি, লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর ইচ্ছাটা বাদ পড়ে কেন? এমনটা তো কখনও দেখি নি, ধাত বদলাল না কি?"

এতক্ষণে কর্তা সহজ অবস্থায় আসিয়া বলিলেন, "তা ব'লে তুমি ভেবো না—"

চাটুজ্জে হাসিমুখে বলিলেন, "রামঃ, এমন কথা কে বলে!"

এইবার কর্তাও সহাস্যে বলিলেন, "তবে চল, ও কাজ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল; আমার মনটা বড খারাপ হয়ে গেছে।"

উভয়ে অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্রী পূজার চাল বাছিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া উঠিয়া চাটুজ্জে-মশাইকে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

চাটুজ্জে-মশাই আরম্ভ করিলেন, "কর্তা বড় বিপদে প'ড়ে তোমার শরণ নিতে এলেন।"

মৃদুহাস্যে কর্ত্রী বলিলেন, "বিপদটা কি শুনি, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?"

চাটুজ্জে বলিলেন, "লক্ষ্মীর চিন্তাই ওই; কিন্তু আজ একটু রকম-ফের আছে। পুরুত-ঠাকুরের মার গঙ্গালাভ হয়েছে শুনেই থাকবে।"

কর্ত্রী সহজভাবেই বলিলেন, "আহা, ব্রাহ্মণের মেয়ে বেশ গেছেন!"

কর্তা চাটুজ্জের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শুনলে চাটুজ্জে, আমরা যেন

আচার্যি-বাড়ি জানতে এসেছি, তিনি ভাল গেছেন কি মন্দ গেছেন, কোনও দোষ পেয়েছেন কি না!" পরে গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেশ গেছেন আমার মাথা, তুমি আমার বিপদটি তো ভাবলে না; কেন, আর পাচটা দিন তাঁর সবুর সইল না?"

কর্ত্রী আশ্চর্য হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "ওমা, একবার কথা শোন! তিনি ঢের সবুর সয়েছেন; মেয়েমানুষের অত বেশি বাঁচা ভাল নয়।"

কর্তা স্ত্রীর মুখে ওই বাঁচাবাঁচির কথাটা শুনিলে বড়ই কাহিল বোধ করিতেন; তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তোমার কাছে ও-কথা শুনতে তো কেউ আসে নি।"

গৃহিণী মৃদুহাস্যে বলিলেন, "না শুনলেই বুঝি এড়ানো যায়! আচ্ছা, থাক্। তা পুরুত-ঠাকুরের মা মরায় তোমার এত দুর্ভাবনা কেন, যা পারবে দিও।"

কর্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার সেই ভাবনায় তো ঘুম হচ্ছে না। বলি—পূজা করবেন কে, সেটা ভেবেছ?"

গৃহিণী গাম্ভীর্যের ভান করিয়া বলিলেন, "তাই তো, মস্ত ভাবনার কথা বটে!" তাহার পরে সহজ ভাবে বলিলেন, "আমরা যাঁর যজমান সে ভাবনা তাঁর, তিনিই ব্রাহ্মণ দেবেন। সে কথা তো তাঁকে ব'লেই দিয়েছি।"

কর্তা বলিলেন, "বটে! কি রকম ব্রাহ্মণের কথা বললে শুনি?"

গৃহিণী আশ্চর্য হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ যাচাই-বাচায়ের ভার সদ্‌গোপেরা আবার কবে থেকে নিলে! তুমি আগোড়-পাড়ার ইংরিজী ইস্কুলে গিয়েছিলে না কি! পুরুতমশায় হয়ে লক্ষ্মীপূজা করবেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হ'লেই হ'ল, তাঁর আবার এ-রকম ও-রকমটা কি?"

কর্তা কেবল চাড়ুজ্জের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "দেখলে, কেমন সহজে মিটে গেল!"

চাড়ুজ্জে-মশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাইকোর্ট যে!"

৫

আজ শ্রীশ্রীকোজাগর-লক্ষ্মীপূজা। মা পদ্মাসনা,—কমলালয়া।

গ্রামের মধ্যস্থলে নিয়োগী মহাশয়ের গোলাপী রঙের বাড়ি, আজ মার আবির্ভাবের অপেক্ষায়—সৌন্দর্যে, সজ্জায়, শোভায়, সৌরভে, পদ্মের মতই দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে আবাহনের সুরে সানাই আকাশে বাতাসে সুমধুর

নিবেদন পাঠাইতেছে। গ্রামের বালক-বালিকারা ভ্রমরের মত আনন্দ-গুঞ্জন তুলিয়া দলে দলে যাতায়াত করিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। পুষ্পমাল্য-বেষ্টিত ঝাড় লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, সেজ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দালানের জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা দেবদ্যুতি বিকীর্ণ করিলেন। পূজা-সম্ভার, উপকরণ-পারিপাট্য, পুষ্পপ্রাচুর্য ও বিবিধ সুগন্ধির মধ্যে তৃপ্তি-প্রফুল্ল পবিত্র মনে, নূতন পূজারী পূজারম্ভ করিলেন।

পূজা শেষ হইল।

পূজারী শেষ-আরতী করিতে উঠিলেন—তন্ময় যন্ত্রবৎ। গাঢ় সুগন্ধি ধূমাবরণে এক-একবার জ্যোতির্ময়ী মাকে কি লোকাতীতই দেখাইতেছিল! মধ্যে মধ্যে পূজারীর কণ্ঠ নিঃসৃত বালক-সুলভ 'মা মা' রব কানে আসিতেছিল. অপূর্ব, অনির্বচনীয়। সে যেন কোন্ সুদূরের, এ পৃথিবীর নয়। শেষ-আরতি শেষ হইল। পূজারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সকলেই প্রণাম করিল, সকলেই মুগ্ধ আবিষ্ট ও স্তব্ধ।

একটু সামলাইয়া চাডুজ্জে-মশাই কর্তাকে বলিলেন "লোকটি খাঁটি লোক বটে।"

কর্তার দৃষ্টি অবনত ছিল, তিনি মুখ না তুলিযাই ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস মোচন করিতে করিতে একটি ছোট্ট হুঁ দিলেন মাত্র। তাহার পর ধীরে ধীরে পূজার দালান হইতে নামিযা গেলেন।

চাডুজ্জে অবাক হইয়া অনুসরণ করিলেন।

দালানের ভিড় দ্রুত ভাঙিযা গেল। সকলে সদরে বাজি পোড়ানো দেখিতে ছুটিল; তাহারও একটা সমারোহ ছিল।

কবি রাম বন্দ্যো আমার পাশেই ছিলেন। তিনি বলিলেন, "মর্ত্যে সুরলোকের ছায়া-পরিচয় পেলে?"

কবি হইবার মক্‌শ হিসাবে বা স্বভাবের বশে আমিও একটু তন্ময় ছিলাম, বলিলাম, "সত্যই, এমনটি পূর্বে কখনও দেখি নাই।"

ইচ্ছা সত্ত্বেও একটা কবির মত কথা যোগাইল না।

রামবাবু বলিলেন, "চললুম।"

বলিলাম, "কোথায়? বাড়ি?"

রামবাবু বলিলেন, "বোধ হয়—না, একটু নিরিবিলিতে।"

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "সে কি? এইবারই তো আনন্দ-পর্ব আরম্ভ

হবে; বাজির পরেই ভোজ; ভোজের পরেই বাগবাজারের বিখ্যাত শখের দল। তিনকড়িবাবুর এক্‌টিং শুনবেন না?"

রামবাবু বলিলেন, "এ ভাবটাকে দাগা' করতে চাই না,— ছাই-ভস্ম চাপা দিয়ে এর মর্যাদা নষ্ট করতে পারব না।" এই বলিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে চলিয়া গেলেন।

সদরে তখন হাউই তারা কাটছে, চরকী সোনা ধুনছে। দেখিলাম, তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটের পথ ধরিলেন।

দোটানায় পড়িয়া আমার মনটা দমিয়া গেল; বাজি দেখার উৎসাহ রহিল না। ফিরিয়া গিয়া পূজার দালানের পৈঠায় বাসয়া পড়িলাম।

তখন বাজি পোড়ানোর ধুম চলিয়াছে, মেয়ে পুরুষ প্রায় সকলেই তাহা দেখিতে গিয়াছে।

পূজার দালানের দক্ষিণ গায়ে স্ত্রীলোকদের অন্দর হইতে যাতায়াতের একটি দ্বার আছে, পূজারী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো মায়েরা, এ বাড়ির গিন্নীমাকে এখানে একবার আসতে বলুন।"

ফিরিয়া দেখি, সেই পূর্বপরিচিত বেশে থাকো উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, "আপনি কি আমাকে ডাকছেন?"

পূজারী বলিলেন, "না, তোমাকে ডাকি নি, এ বাড়ির গিন্নীকে এখানে একবার ডেকে দিতে বলছি।"

থাকো ধীরভাবে বলিল, "তার প্রতি কি আদেশ বলুন?"

পুরোহিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তাঁর প্রতি এখানে আসতে আদেশ।"

থাকোকে তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কি ভাবিয়া ব্রাহ্মণ একটু শান্তভাবে বলিলেন, "ব'লো, তিনি না এলে আমি দর্পন বিসর্জন করতে পারছি না, অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এখনই ভোজ আর নাচ-গান নিয়ে দালান উঠোন একাকার হয়ে যাবে, তার আগে আমার সমাপ্ত করা চাই,—যেন বিলম্ব না করেন।"

থাকো বিনীতভাবে বলিল, "আমি তো আপনার আদেশ পালন করবার জন্যে উপস্থিতই রয়েছি, আপনি কি বলিবেন বলুন না?"

পুরোহিত চকিত ভাবে থাকোর মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কেবল তাহার আধ-ময়লা কস্তা-পেড়ে কাপড়ই দেখিয়াছিলেন।

আবিষ্টের মত বলিলেন, 'ওঃ, তা না তো কি মা নিজে আসেন। কি ভুলই করেছি। আমি নূতন লোক, আজ মাত্র এসেছি, কিছু মনে ক'রো না মা।"

থাকো বাধা দিয়া ব'লল, "ওসব কি বলছেন বাবা। আমাকে কি করতে হবে বলুন?

পূজারী নিজে বড় লজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহার কথায় সেটুকু প্রকাশ পাইল, কিন্তু বাস্তবিক তিনি থাকোর দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। চটকা ভাঙার মত বলিলেন, হ্যাঁ, তা তুমি বিশ্বাস করতে পারবে। দেখ মা কৃপাময়ী আজ এখানে স্বয়ং উপস্থিত, তোমার যা কিছু প্রার্থনা থাকে—মাকে জানিয়ে প্রণাম কর। আজ তোমার কোন কামনাই ব্যর্থ হবে না—আমার এই কথা। মনে রেখো মা। এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলটি গলায় দিয়া থাকো বদ্ধাঞ্জলি হইতেই, পূজারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও কি মা, তবে কি আমার কথাটা তোমার বিশ্বাস হ'ল না? খুব সাবধান, আগে বেশ মনস্থির করে অভীষ্টটি ভেবে-চিন্তে নাও, মনে রেখো, এ শুধু প্রতিমা প্রণাম করা নয়,—একাগ্রে মার কাছে আজ যা চাইবে তাই পাবে। গরিব ব্রাহ্মণের কথা অবিশ্বাস ক'রো না।

বিনীত কণ্ঠে 'আমার যে ভাবা আছে বাবা' বলিয়াই থাকো প্রণত হইল।

পূজারী তাহার প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার কথার গুরুত্বটা একবার ভাবলেও না! এই কথাটাই তাঁর সমস্ত শরীর-মনকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল, একটু অভিমানও অনুভব করিতে লাগিলেন।

মিনিট দুই মধ্যে থাকো চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিতেই পূজারী আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এত বড় গুরুতর বিষয়ে তোমার এই তাচ্ছিল্য-ভাব দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি,—আমার কথাটা তা হ'লে বিশ্বাস কর নি দেখছি। যাক, যদি গোপন রাখবার মত কিছু না হয় তো মার কাছে কি প্রার্থনা করলে—বলবে কি?

"গোপন কি বাবা, মেয়েদের, বিশেষ ক'রে মায়েদের, যা সব বড় কামনা—মাকে তাই জানিয়েছি।" এই বলিয়া থাকো নীরব হইল।

পূজারী মূঢ়বৎ চাহিয়া বলিলেন, "বুঝতে পারলুম না যে মা।"

থাকো নিম্নদৃষ্টিতে সলজ্জভাবে বলিল, "বাবা মা আমাকে কৃপা ক'রে সব

সুখ দিয়েছেন,—স্বামী, একটি ছেলে, একমাত্র নাতি, আর এই যা কিছু দেখছেন। বড ভয়ে ভয়ে এত দিন ভোগ করছি। বড় সুখের সঙ্গে বড ভয়ও থাকে বাবা। তাই মাকে বললুম—এই সুখের মাঝখানে, সব অটুট থাকতে, তিনি দয়া ক'রে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে নিন।"

পূজারী বিচলিতের মত বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, করলি কি মা! এ কি সর্বনাশ করলি! আমি যে এত ক'রে বললুম, খুব সাবধান, মা উপস্থিত, আজ যা চাইবে তাই পাবে।"

থাকো বলিল, "তাই তো চেয়েছি বাবা।"

পূজারী এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়া ফেলিলেন, "আমার মাথা চেয়েছ! এত ঐশ্বর্যের, এত সুখের মধ্যে এ কি চাওয়া! আমি মিছে এত শাস্ত্র ঘেঁটে মলুম, তোমাদের চিনতে পারলুম না।"

সুমধুর বিনম্র কণ্ঠে "আপনি যে মেয়েলী শাস্তোর পড়েন নি বাবা" বলিতে বলিতে থাকো চক্ষের নিমেষে পুরোহিতের পদধূলি লইয়া বিজয়িনীর মত হাসিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিল।

পুরোহিত বিমূঢ়বৎ অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৬

তাহার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন প্রাতে দেখি, গ্রামের ইতর-ভদ্র স্ত্রীলোকেরা—মায় বউ ঝি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসংবৃত, গঙ্গার ঘাটে ছুটিয়াছে।

কারণটা জানিবার জন্য একজন বর্ষীয়সীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আর বাবা, সর্বনাশ হ'ল, আমাদের থাকো চলল।"

গত কোজাগর লক্ষ্মীপূজার কথাটা যুগপৎ স্মরণ হইয়া বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

গিয়া দেখি, ঘাটে লোকারণ্য! সকলেরই বদনে বিষাদ, নয়নে জল, মুখে 'হায় হায়' ছাড়া ভাষা যেন স্বয়ং মূক হইয়া গিয়াছে। থাকোকে শায়িত অবস্থায় সেই পরিচিত বেশেই দেখিলাম, সেই লাল কস্তা-পেড়ে শাড়ি, সেই অর্ধাবগুণ্ঠন, সেই নথ, সেই শাঁখা আর বালা।

ভাষা পাইলাম কেবল কর্তা ও গৃহিণীর মুখে।

থাকো বলিতেছে, "ছিঃ, পুরুষমানুষের অমন হতে নেই, পায়ের ধুলো দাও।"

কর্তা বলিলেন, "ভগবান এতটা দিলেন, সে সুখ একদিন ভোগ করলে না, এই আমার দুঃখ।"

থাকো সিক্তকণ্ঠে বলিল, "ওগো; তুমি জান না, আমার এত সুখ যে তা স'য়ে থাকতে আমার সাহস হচ্ছিল না; মেয়েমানুষের অত সুখ বেশি দিন ভোগ করবার লোভ রাখতে নেই গো।" এই পর্যন্ত বলিয়া হাত দুইখানি কষ্টে বক্ষের উপর তুলিয়া জোড় করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চক্ষু বুলাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এঁদের—নিয়ে—থে—কো।" হাত আর মাথার উপর উঠিল না, দুই ধারে পড়িয়া গেল।

চাড়ুজ্জে-মশাই বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন; শতকণ্ঠে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল!

দর্পণ-বিসর্জন শেষ হইয়া গেল। পল্লীলক্ষ্মী বিদায় লইলেন।

# দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি

চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত স্থূলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ি, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সট্‌কার মাথায় অনির্বাণ বাড়বানল—সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন, আর সান্ধ্য মজলিস,—এই চতুর্বেদ চর্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন,—সাত সের দুধে দু ভরি আফিং সুপক্ক হ'লে, তার সবখানি তিনি ভোগে লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্ষদদের মধ্যে অধিকারী-মত বণ্টন হ'ত।

ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল—গো-সেবা, দুগ্ধ প্রস্তুত আর কল্‌কে বদলে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল, সেটি সে দুধ জ্বাল দিতে দিতেই সেরে রাখত। কথাবার্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত।

চৌধুরী মশাই কখনও কখনও আন্দাজে বলতেন, "নন্দা, ঝিমুচ্চিস বুঝি? খবরদার বেটা, দোর-গোড়ায় ব'সে ঝিমুলে গেরস্তোর অকল্যাণ হয়, জান না পাজি! দূর ক'রে দেব।"

নন্দা চোখ বুজেই বলত, "আপনি দেখলেন কখন হুজুর?"

কথাটা ঠিক। শুনে চৌধুরী মশাই খুশিই হতেন। বড়লোকের, বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়—লোকসেনে লক্ষণ। প্রজা বেটারা চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে—বাঁধি-ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়, মতলব হাসিল ক'রে নেয়, দুঃখ-কষ্ট মাখানো মুখ দেখিয়ে অকস্মাৎ দয়া টেনে বার ক'রে বসে। এটা ছিল তাঁর পিতৃবাক্য। চোখ চাওয়ার তরে রয়েছে ভস্মলোচনরা—নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা।

চৌধুরী মশাইয়ের পেয়ারের নাতী ইন্দুভূষণ আজ বেজায় ব্যস্ত। সে লেখাপড়া ছেড়ে এখন লায়েক হয়েছে। একখানি নাটক লিখে ফেলেছে—"লক্ষ্মণের শক্তিশেল"। তার রিহার্সেলও চলেছে,—পূজার নবমীতে অভিনয়। ইন্দু নিজেই ম্যানেজার আর লক্ষ্মণ—দুই-ই। হনুমানের পাট সে খুব জমাটি ক'রে লিখে ফেলেছে। সে বলে, কি ক'রে যে এমন ফ্লো (তোড়) বেরিয়ে গেছে, সে তা নিজেই জানে না। লেখকদের নাকি ঝোঁকের মাথায় feeling (ভাব) এসে ওরূপ অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়ে দেয়।

বীররসের কথা এলে তার ধমনীগুলো একসঙ্গে ধড়ফড় করতে থাকে,

মনের ভাবগুলোকে ঠেলে বার ক'রে দেয়। লেখাটা ভারি লাগমাফিক বেরিয়ে যাওয়ায় ইন্দুর মনে বড় একটা আপসোসও র'য়ে গেছে,—অমন পার্টটা সে নিজে নিতে পারলে না কেবল হনুমান নামটার জন্যে। বাল্মীকি এত বড় কবি হয়ে একটা ভাল নামও খুঁজে পান নি।

নেপা হনুমানের পার্ট খুব উৎসাহে শখ ক'রেই নিয়েছে,—করেও ভাল। তার ওপর সে ইস্কুলের খেলায় সে-বছর Long Jump আর High Jump-এ (লাফালাফিতে) পদক পুরস্কার পাওয়ায়—হনুমান সাজবার দাবিও তার এসে গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে ইন্দুকে বড় বিচলিত ক'রে দিয়েছে। নেপার বিধবা পিসী খড়দায় থাকেন; তাঁর সঙ্কট পীড়া শুনে নেপাকে সেথায় চ'লে যেতে হয়েছে। আবার, তাঁর শেষ না দেখে তার ফেরবারও জো নেই, —হাবাতে মাগীর টাকা আছে। অভিনয়ের সবে আর সাতটি দিন বাকি, এর মধ্যে কি মাগী মরবে! পাকা হাড়—খাসই টানতে পারে সাত দিন! আপদ দেখ না।

ইন্দু দারুণ দুশ্চিন্তায় প'ড়ে গেছে। পড়বারই কথা। উত্তরপাড়া একটি উন্নত সমাজ-জায়গা,—সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত অভিজাতের বাড়িতে অভিনয়। এখনও প্রহসনের প্লট্‌ই সে ঠিক করতে পারে নি,—সেই চিন্তায় মাথা ভ'রে রয়েছে, তার ওপর নেপার পিসীর এই ব্যবহার! তাই সে দলের মাতব্বরদের ডেকে পিসী-সঙ্কট হতে উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করবার জন্যে মীটিং কল্ (meeting call) করেছে।

## ২

চৌধুরী মশাই সপ্তাহকাল কষ্ট ক'রে, আজ মরিয়া হয়ে গা তুলে নিকটস্থ জমিদারিতে দর্শন দিতে বেরিয়ে পড়েছেন,—প্রজাদের কাছ থেকে পূজার পার্বণী আদায়ের জন্যে। ফিরতে সন্ধ্যার পূর্বে নয়।

এই সুযোগ পেয়ে—মীটিংটা আজ তাঁর বৈঠকেই বসেছে। প্রধান উদ্দেশ্য—নেপার একজন ডুপ্লিকেট্ (মুশকিল-আসান) ঠিক ক'রে ফেলা, যে নেপার অনুপস্থিতিতে তার পার্ট যোগ্যতার সহিত করতে পারে।

ভুবন পারে,—অন্তরায় কেবল ওই হনুমান নামটি।

নেপা সম্বন্ধে সন্দেহের কথা আলোচনার পর, সকলে একবাক্যে বললে, "ডুপ্লিকেট্ নিশ্চয়ই চাই।"

ইন্দু বললে, "চাই তো বটেই, কিন্তু ও-পার্ট করবার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে কজনের আছে? বইখানির মধ্যে ওই পার্টটিই আমার প্রাণ ঢেলে লেখা, কারণ হনুমানের মত অমন ভক্ত, অত বড় বীর, আর সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রেতায় কেউ জন্মান নি। সেই মহাপুরুষের কৃপায় লেখাটাও বেরিয়ে গেছে তেমনই। নেপা সাগ্রহে লুফে নিলে, তাই তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারি নি। অবশ্য 'স করেও মন্দ নয়। কিন্তু ও-পার্ট যখন অর্ধেক লেখা হয়েছে, তখন থেকে আমার নজর ছিল ভুবনের ওপর। আমাদের মধ্যে ও-ই ছাত্রবৃত্তি পাস, আবৃত্তি করেও তেমনই, কারণ তার সঙ্গে অর্থবোধ থাকে কিনা—পাখির মত মুখস্থ বলা তো নয়! কিন্তু নেপাকে তখন ক্ষুণ্ণ করতে পারলুম না। এ কথা সতীশকে privately (গোপনে) ব'লেও ছিলুম,—মনে নেই সতীশ?"

সতীশ বললে, "মনে খুবই আছে, আমি তখুনি তোমাকে বলেছিলুম, এটা তোমার দুর্বলতা।"

"কি করব ভাই, আমাকে তোমরা ম্যানেজার করেছ,—সব দিক দেখতে হয়। ভুবন কিছু মনে করে তো—সামান্য ইঙ্গিতেই কারণটা সে বুঝতে পারবে। দেখলে না—তাই তাকে অন্য কোনও ছোট পার্ট দিতেই পারলুম না, prompting-এ (ধর্তায়) রাখতে হ'ল, কারণ প্রম্‌টিংয়ের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আর ওর মত motion দিয়ে accent ঠিক ক'রে (ঝোঁক দিয়ে সরু-মোটা খেলিয়ে) প্রম্‌ট করতে পারতই বা কে?"

নরেশ বললে, "কথা যখন ফাঁস হয়েই গেল, আজ তবে বলি,—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কম মতভেদ হয় নি। সকলেরই ইচ্ছা ভুবন ও-পার্টটি করে, তা হ'লে একাই মাত ক'রে দেবে, আমাদের অ্যাক্টিংয়ের দোষ-টোস সব ঢাকা প'ড়ে যাবে। ইন্দুর লেখাটা ভুবন একাই সার্থক ক'রে দেবে। ইন্দু হাত-জোড় ক'রে বলেওছিল, 'চক্ষুলজ্জায় ভুলটা যখন হয়ে গেছে ভাই—এবারটি মাপ কর। দ্বিতীয় opening থেকে ও-পার্ট ভুবনেরই রইল, এখন change করতে (বদলাতে) গেলেই একটা মনোমালিন্য ঘটাই সম্ভব।' কথাটাও ঠিক। নেপা যে রকম মেতে রয়েছিল, ও আর এদিকে মাড়াত না। তাই আমরা চেপে গেলুম। যাক, এখন দেখছ তো বাবা, দশের ইচ্ছা কি বিফল হয়!"

শরৎ বললে, "আর ও-সব দুশ্চিন্তা কেন বাবা,—পিসী তো পথ ক'রে দিয়েছে, এখন তিনি গুটিগুটি দশমীতে চোখ বুজুন, আর নেপা টাকার তোড়া নিয়ে এসে জোড়া পাঁঠা ঝেড়ে আমাদের গার্ডেনপার্টি দিক—এই প্রার্থনা করি। ভুবন, লেগে যাও ভাই, তোমার তো সব পার্টিই খাড়া মুখস্থ। আমাদের তো মেমরি (memory) নয়—সব শাঁক্তিগড়! বাংলায় বাপের নামটাও মনে রাখতে পারি না—পেছনে prompter ( তন্ত্রধারক ) চাই। যাক, একেই বলে—যোগ্য পাত্রে কন্যা দান। কি বল সব?"

সকলে সহাস্যে শরতের প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করলে। একটা আনন্দ-কলরোল প'ড়ে গেল। তিন পাক হুর্‌রে ঘুরে গেল। সকলের চক্ষু ভুবনের মুখের ওপর চমকাতে লাগল।

ভুবন হাতজোড় ক'রে সবিনয়ে বললে, "আর যা বল সব করতে রাজী আছি ভাই, কেবল ওই কাজটি ছাড়া। কারে প'ড়ে—নাপার্যমানে একজনের বদলি-খাটার বিড়ম্বনা আমার দস্তুরমত ভোগা হয়ে গেছে! মাপ কর দাদা, ওতে আমি আর নেই।"

শুনে সকলে সহসা যেন চোট খেয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। ইন্দু ব'সে পড়ল! শেষ—ক্ষুব্ধ রোষে বললে, "আমি এখনই 'হনুমান' নামটা কেটে 'মহাবীর' নাম বসিয়ে দিচ্ছি ভাই। যা হয়েছে হয়েছে, এই নাকে কানে খত—রামায়ণ যদি আর ছুঁই! এবারটি মান রক্ষা ক'রে দাও দাদা। ও-পার্ট আর কারুর দ্বারাই ঠিক ঠিক হবে না।"

"না ইন্দু, ও-কারণে নয় ভাই। আর নয়ই বা কেন,—গ্রামের যে সব ছেলে,—তাদের কাছে তো চিরদিনই ওই নাম বাহাল থেকে যাবে! পরিবার থাকলে সেও মুখ পুড়িয়ে সত্যিকার হনুমান বানিয়ে দিত। ছেলে থাকলে তার সঙ্গীরা তাকে মর্কট সাজাবার দাবি রাখত,—এক পুরুষে মিটত না। যাক, তার জন্যে বলছি না! তোমরা তো জান, পাশের গ্রামেই আমার মামার বাড়ি, সেইখানেই থাকতুম। সেখানেও সখের যাত্রার ভারি ধুম। দু বছর আগেকার কথা,—তখন আমাদের রিহার্সেল খুব জোর চলেছে,—পালাটা 'সীতা-হরণ'। সীতা কি রাম লক্ষ্মণ সাজবার মত চেহারা নয়,—গাইতেও পারি না, সুতরাং সেখানেও আমি ছিলুম প্রম্‌টার। হরিদত্ত সাজবে হরিণ। অভিনয়ের দুদিন আগে তার হ'ল জ্বর,—কথাটি

তো সামান্য নয়—সে যেন রাজপুত্তুরের কলেরা! অবস্থা বুঝতেই পারছ,—সকলেই মহা চিন্তিত।

"ম্যানেজার এসে আমাকে ধ'রে বসলেন, 'তোমাকে স্বর্ণমৃগ সাজতে হবে ভুবন।' কেউ আর তখন হরিণ বলে না,—সবাই শোনায় 'স্বর্ণমৃগ'! অর্থাৎ—খুব সম্মানের পার্ট।

"বললুম, ও-পার্ট তো যে-সে একবার ওই সোনালী বসানো খোলটায় ঢুকে ক'রে আসতে পারে, ওতে তো আর কথাবার্তা নেই।

"সবাই চক্ষু কপালে তুলে গাঢ়স্বরে ব'লে উঠল, 'কি বলছ ভুবন! কথাবার্তা নেই, অথচ সে অভাবকে ভাবে ভ'রে দিতে হবে—সে কি যার তার কাজ না, হরি দত্তর কাজ? তোমার ওপর তাই বরাবরই আমাদের নজর,—intelligent (বুদ্ধিমান) লোক না হ'লে ও-পার্ট ঠিক ঠিক করা কি তামাসার কথা! পারেন এক মুস্তফি সা'য়েব, আর পার তুমি,—এ তোমার সামনে বলা নয়।'

"ম্যানেজার বললেন, 'হরি দত্ত দশ টাকা ঝাড়লে, বললে, তার পরিবার দেখতে আসবে, তাকে একটা কিছু সাজা চাই-ই। কি করি, চক্ষুলজ্জায়ও বটে, আর হারমোনিয়ামটা সারাবারও দরকার, তাই দিতে হয়েছিল।' ইত্যাদি।—

"শেষ হরি দত্তর খোলস আমার স্কন্ধেই চাপল। বড়লোকের বাড়ি অভিনয়,—বনেদী ব্যবস্থা,—বিপুল আয়োজন। আলোয়, ছবিতে, ফুলের মালায় আসর হাসছে। সে পঞ্চবটী দেখলে রাজার ছেলেরও বনে যেতে শখ চাপে। আসরে আতরদান, গোলাপপাশ রূপোর থাল ভরা পান; ট্রে ভরা—বেদানা, মিছরির টুকরো, আদার কুচি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বচ প্রভৃতি, আর সুগন্ধ ছড়িয়ে সধূম চায়ের যাতায়াত, চামচের ঠুনঠান শব্দ! এতদ্বারা অভিনেতা আর গাইয়েরা গলা বজায় রাখবেন,—আর বাড়িওলার সম্মান বজায় থাকবে।—

"ব্যবস্থা সবই সুন্দর, সকলে গালে দিচ্ছেনও সুন্দর। অর্থাৎ মুঠো মুঠো,—এন্তোক বনবাসী রাম লক্ষ্মণ সীতা,—যায় কন্সার্ট পার্টি। অসুন্দর কেবল হরিণের সেদিকে নজর দেওয়াটা! এক টুকরো মিছরি, দুটি বেদানা, এক কুচি আদা, একটা পান কি এক চুমুক চা, তার ছোঁবার জো নেই, কারণ, সে যে হরিণ! আর ইন্টেলিজেন্ট হবার মানেই—স্বাভাবিকত্ব

বজায় রাখা, সেটা কেবল হরিণকেই রাখতে হবে! কিছুতে হাত বাড়ালেই, সবাই 'হাঁ হাঁ' ক'রে ওঠে। তার কাজ কেবল—ছোটা, লম্ফানো, হাঁপানো, শেষ তেউড়ে পঞ্চত্ব পাওয়া! হ'লও তাই। হরি দত্ত জ্বর হয়ে বাঁচল,—আর নীরোগ জলজ্যান্ত আমি তার খোলে ঢুকে, সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে মলুম। Intelligent পশু সাজায় সেলাম বাবা!"

হাসির হাউই ছুটে গেল। সবাই বললে, "Bravo ভুবন, এমন বর্ণনা আর কে শোনাতে পারত! ও-পার্ট ভাই তোমাকেই করতে হবে, তা না তো প্লে একদম মাটি,—তা লিখে রেখো।"

শেষটা দলের সকলের একান্ত অনুরোধে আর ইন্দুর কাতর অনুনয়ে ভুবনকে রাজি হতে হ'ল। ইন্দুর দুশ্চিন্তা দূর হ'ল। হুররের হল্লায় সভাও ভঙ্গ হ'ল।

৩

চৌধুরী মশাই আজ বেলাবেলি জমিদারি থেকে ফিরেছেন,—মেজাজ খুব খুশ। পার্বণী আদায় হয়েছে পূজার খরচের দেড়া। তাই কাপড় না ছেড়েই সবাগ্রে—প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম সেরে, বৈঠকে ঢুকেছেন। নন্দা সটকা ধরিয়ে চট্কা ভাঙিয়ে দিয়ে গেল।

ইন্দুভূষণ পাশের কামরায় ব'সে প্রহসনের প্লট ভাবছে। মাথায় বোমা মেরেও কিছু পাচ্ছে না। মাঝে আর পাঁচটি দিন মাত্র। পিসীর পাল্লা পেরিয়ে শেষ প্রহসন যে মাথায় হুতাশন জ্বেলে দিলে! অন্যমনস্কে পেন্সিলটে কামড়ে কামড়ে দাঁতনে দাঁড় ক'রিয়ে ফেলেছে। প্লটের কিন্তু পাত্তা লাগছে না।

চৌধুরী মশার আজ মেজাজ সরিফ। ইন্দু তাঁর পেয়ারের নাতি। চৌধুরী মশার মেজাজ মশগুল থাকলে ইন্দুকে ডেকে কিছুক্ষণ রহস্যানন্দ উপভোগ করতেন। আজও তার ডাক পড়ল।

ইন্দুকে উঠে আসতে হ'ল—কিন্তু বিরক্তভাবে।

চৌধুরী মশাই একবার মুখ তুলে চেয়েই, চোখ বুজে সহাস্যে বললেন, "বিকেলবেলা হাতে দাঁতন যে বড়,—রোজা রাখছিস নাকি?"

ইন্দু তাঁর কথাটা আগে বুঝতে পারে নি, পেনসিলটায় নজর পড়তেই

বুঝলে। বললে, "আপনি যখন মুক্ত-কচ্ছ হয়েছেন, তখন আমাকে তো ধর্মরক্ষা করতে হবে।"

বলাই বাহুল্য, চৌধুরী মশাই বসলেই মুক্ত-কচ্ছ হয়ে পড়তেন।

চৌধুরী মশাই উপভোগের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভুলটা সেরে নিয়ে, "জিত" বলেই বালিশের তলা থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে ইন্দুর হাতে দিলেন।

*　　　*　　　*

তখনকার ন্যাশানাল থিয়েটারে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম অভিনয়-রজনী। আয়োজনের অন্ত নেই। জগৎসিংহ নাকি ঘোড়ায় চ'ড়ে appear (হাজির) হবে। গ্রামের দ্বালে দ্বালে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, বাগানের ফটকে ফটকে— বড় বড় অক্ষরে সোনার জলে ছাপা পোস্টার,—তাতে লেখা—

কে না জানে বঙ্গে বঙ্গে বঙ্কিম লেখনী,<br>কে না জানে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী<br>ইত্যাদি।

যাতাযাতের সময়, উঁচু-নীচু গ্রাম্য পথে গাড়ি যতবার টক্কর খেয়েছে, ততবারই চৌধুরী মশাই "খেলে কচু পোড়া" বলেছেন আর চেয়েছেন। সেই সময় ঝকঝকে হরপের পোস্টারগুলোও এক-একবার নজরে পড়েছে,—এক-একটা কথা প'ড়েও ফেলেছেন, সবটা সাপটাতে পারেন নি। তবে আন্দাজে আর বুদ্ধির জোরে ব্যাপারটা সমঝে নিয়েছেন।

ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্গেশনন্দী লোকটা কে হে? দোকানটা কোথায়, বরানগরে বুঝি? বেজায় বেড়ে উঠেছে দেখছি। মেয়ের বিয়েতে সোনার জলে হেঁয়ালি ঝেড়েছে দেখলুম। তেল বেচে, না? তা না তো এত তেল!"

ইন্দু হেসে বললে, 'নন্দী কোথায় দেখলেন,—দুর্গেশনন্দিনী।"

"ঐ হ'লো,—বাংলা বুঝি না রে শা—। না হয় দুর্গেশনন্দীর মেয়ে, এই তো?"

"না না, ও একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা। অমন বই পড়েন নি। তার একটু যদি দেখেন, নাওয়া-খাওয়া ঘুরে যাবে,—সবটা না দেখে ছাড়তে পারবেন না, অবাক হয়ে যাবেন।"

"থাম্ থাম্, নন্দীর মেয়ে দেখে ওঁর দাদামশাইয়ের নাওয়া-খাওয়া ঘুরে যাবে,

—হ্যাংলার মত অবাক হয়ে দেখবে! ইস্টুপিড! সে বটে 'গোলেবকালী', আলবৎ, কেতাব বটে!"

"কি বলছেন দাদামশাই,—বইখানা যুগান্তর এনে ফেলছে।"

"অ্যাঃ, কলি-প্রবেশ হয়ে গেছে তা হ'লে?"

"না দাদামশাই, অমন সুন্দর বই বাংলা ভাষায় আর বেরোয় নি। পড়বার তরে কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেছে।"

"বলিস কি! 'মজনু'র চেয়েও ভাল?"

"কিসে আর কিসে! সে না দেখলে আপনি আইডিয়াই করতে পারবেন না। অমন একটি আয়েসা দুনিয়া ঢুঁড়ে বার করতে পারবেন না।"

"এটা কি মাস র‍্যা?"

"কেন?—আশ্বিন।"

"এ দুটো মাস আর বাতিক বৃদ্ধি ক'রে মাথা খারাপ করিস নি। কট দিন কোনও রকমে কাটিয়ে দে ভাই। অঘ্রাণের তেরোটা দিন বাদ দিয়ে তোর মুখ বন্ধ করছি, র'স।"

"আপনি তো শুনবেন না! কি ঘটনা-বিন্যাস, সে না শুনলে—"

"বটে! লেখকের বাড়ি কোথায়,—যাত্রার দল আছে বুঝি?"

"না না, মস্ত বিদ্বান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়ি কাঁটালপাড়ায়।"

"বলিস কি, ডিপুটি! ও', বুঝেছি, আইন-আকবরির তর্জমা করেছে! যাঃ, আর জ্যাঠামি করতে হবে না। আগে দেখ, শোন, শেখ্।—ওই জামতাড়া, নারকোলডাঙা, ডুমুর-দ, বেলঘরে, বেলগেছে, কলা৻ . ., কাঁটাল-পাড়া—ওসব জায়গার লোক ফলহরি ঠাকুরের ফলোয়ার (follower)—তারা আবার বই লিখবে! লিখলে, আমলকী কি বয়ড়া বানিয়ে বসবে। আর কি ভারতচন্দ্র আছে,—এক কেতাবে খেতাব বেরিয়ে গেল,—'মেদিনী হইল মাটি,' খবর রাখিস?

শেষ বললেন, "আচ্ছা, আজ সন্ধ্যের পর শোনাস্ দিকি,—সে সময় পাঁচজন পাকা সমঝদারও থাকবে, বোঝা যাবে কেমন কেতাব!"

"আপনি তো তখন ঢোলেন।"

"অজ্ঞান তো হই না রে,—একটু চেঁচিয়ে পাড়স্;—আমি হুঁ দিলেই তো হ'ল।"

সন্ধ্যার পর চৌধুরী মশায়ের সমঝদার-পারিষদেরা একে একে সব উপস্থিত হলেন। তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক চলতে লাগল। ভৃত্য নন্দা দোরের বাইরে আসন নিলে। তার কাজও ঢোলা, আর মাঝে মাঝে কল্‌কে বদলে দেওয়া।

ইন্দু বই হাতে ক'রে উপস্থিত হতেই, চৌধুরী মশাই বললেন, "বুঝলে বিশ্বম্ভর, ইন্দু আজ আমাদের একখানা বই শোনাবে ব'লে বায়না ধরেছে। কাঁটালপাড়ার কে ডিপুটি টঙ্কনাথবাবু নাকি লিখেছেন—"

"আজ্ঞে—বঙ্কিমবাবু।"

"ঐ হ'ল,—আসল অক্ষর তো বাদ দিই নি, 'ঙ'য়ায় ক'য়ে তো বজায় রেখেছি রে। আচ্ছা, শুরু কর্।"

হরদেব খুড়ো তাস পেড়েছিলেন, অনিচ্ছায় তুলে রাখলেন। শম্ভু বাঁড়ুজ্জে বেজার-মুখে—একটা আকর্ণ বিস্তৃত হাই তুলে, দেল ঠেস দিলেন।

ইন্দু আরম্ভ করলে, চৌধুরী মশারও ঢুলুনি এল।

ইন্দু যেই বলেছে—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ -

চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল মেরে আসছিলেন, চোখ বুজেই ব'লে উঠলেন, "বাস্ করো - গল্‌তি হায়। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কখনও হতেই পারে না। এই সব বই লেখা! মানসিং লোকটাই বা কে, কার পুত্র, কাদের দরোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে? তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন যে, সবচিন লোক, আব কেটে দাও। লেখ—ওল্‌সিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্য পুত্র কচুসিংহ, তেঁকার পুত্র ঘেঁচুসিংহ, তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও পাড়ার মেনকা ঠান্‌দি মেয়েমানুষ হ'লে কি হবে —সেটা তাঁর অদৃষ্টের দোষ, তাঁরও এসব জ্ঞান আছে। নিজে মেনকা, মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নাম লক্ষ্মী। খুঁট ধরলেই পটাপট তিন পুরুষ আপসে বেরিয়ে আসে। বই কি লিখলেই হ'ল! কি বল, হরদেব?

"বলব আর কি,—আর কি দেবীবর আছেন! তিনি থাকলে এসব যথেচ্ছাচার ঘটতে পেত না।" এই ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

কালীবর রায় বললেন, "ছেড়ে দাও না, ও-কথা আর বাড়িও না। আমাদের মহাদেব খুড়োর ছেলের নামকরণ হয়েছে 'মেঘনাদ'! সতী সাধ্বী বিন্দ খুড়ীর কলঙ্কটা একবার বোঝ। কার্তিক নয়, গণেশ নয়। 'মেঘনাদ'

হয় কি ক'রে? সমাজ কি আর আছে! তিনি লজ্জায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিয়েছেন। যাক্, ও পাপ-কথা ছেড়ে দাও।"

চৌধুরী মশায় তে-ভাঁজ থুতনিটা তখন বুকে ঠেকে থেবড়ে ছিল। সেটা ঈষৎ চাগিয়ে বললেন, "ছেড়ে দাও কি রকম? আমরা জিন্দা থাকতে জাতটা চোখের সামনে বর্ণসঙ্কর্ মেরে যাবে নাকি? কাল মহাদেবকে ডাক দাও। বুঝলে?"

যাক, ইন্দুকে অনেক ক'রে সে ধাক্কা সামলে শুরু করতে হ'ল। চৌধুরী মশায় থুতনি আবার তাঁর বুকের ওপর থেবড়ে বসল। সট্কার নলটা হাত থেকে খ'সে পড়ল। এক-একবার চমক আসে আর বলেন, "হুঁ, তার পর?"

ইন্দু তখন এগিয়েছে,—"বিমলা আর তিলোত্তমা তখন শৈলেশ্বরের মন্দির মধ্যে, বাইরে ভয়ঙ্কর ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুত, বজ্রপাত—"

চৌধুরী মশাই চমকে দুবার 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ ক'রে ভৃত্যকে ব'লে উঠলেন, "নন্দা, ঢুলছিল বুঝি? দেখছিল না হারামজাদা, মাথার ওপর কী প্রলয়কাণ্ড! গরুগুলো বাইরে নেই তো,—শিগগির তুলে ফেল্। উঠলি?"

ইন্দু থামে নি,—"রমণীদ্বয় ভয়ে জড়সড়।"

শুনেই চৌধুরী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোনও ভয় নাই মা, এ ভদ্রলোকের বাড়ি। নন্দা গিন্নীকে বল্—চট ওদের বাড়ির মধ্যে নে' যান। গেল?"

ইন্দু ছাড়ে নি,—"এমন সময় জগৎসিংহ মন্দিরদ্বারে করাঘাত ক'রে বললেন—'মন্দির মধ্যে কে আছ—দ্বার খোল—'

চৌধুরী বেজায় চ'টে ব'লে উঠলেন, "খোলে কলা-পোড়া,—ওদের বলে দ্বার খুলতে! বেটার বাবার মন্দির! নন্দা, আধি গলাধাক্কা দেকে নিকালো। গিয়েছিস?"

ইন্দু শোনাবেই,—"দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় দমকা হাওয়া ঢুকে প্রদীপ নিবে গেল।"

"অ্যাঁ, ও বেটাও ঢুকল নাকি? কি দেখছ হে হরদেব?"

ইন্দু—"শুনুন না,—জগৎসিংহের মন্দির মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকাল, অমনই তিলোত্তমার সঙ্গে তাঁর চারি চক্ষে মিলন।"

"এই মাথা খেলে" ব'লেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুক্তকচ্ছ চৌধুরী ওঠবার উপক্রম করলেন। চীৎকার ক'রে উঠলেন, "শিবের মন্দিরে বেলকোমো,—

পাহারাওলা—পাহারাওলা—! আচ্ছা হরদেব, মেয়েগুলোই বা কি রকম!—এই দুর্যোগের রাতে,—আমারই শিবমন্দিরে—অ্যাঁঃ! নন্দা, ছাতাটা দে তো। উঃ, কি বিদ্যুৎ! চোখ সামলাও হরদেব, চোখে পড়তে পারে,—পড়—ল!"

এই ব'লে, বোজা চোখ সজোরে বুজলেন।

উঠে পড়েন আর কি, "ওঃ, কি দমকা!"

ইন্দু অনেক ক'রে বুঝিয়ে বসালে। বললে, "আমি দেখছি দাদামশাই।"

"তুই কি দেখবি? তোর যাওয়া হবে না,—ওরা কাঠের পুতুল নয়। দেখলি নি পাজি বিদ্যুতে শুভদৃষ্টি! কি হে হরদেব, কিছু বলছ না যে?"

"কি বলব বলুন? তাস খেললে আর এসব বিভ্রাট ঘটে না। অমন নিরীহ জিনিসটি আর নেই। বিবিগুলো পর্যন্ত বাড়িব চেযে ভাল, মুখে কথাটি নেই।"

"সে তো বুঝলুম, এখন উপায়? মন্দিরের তো দফা—বুঝলে, শিবেরও মাথা খেলে! এখন শুদ্ধির উপায় কর।"

"আজ্ঞে, তারিণী পুরুতকে ডাকতে পাঠান। কাল প্রাতেই পঞ্চগব্য চড়াতে হবে আর দ্বাদশটি—সে তো জানেনই।"

"এই নন্দা, শুনলি? সারা রাতের বেবাক গোবর আর শ্রীচোনা, একরত্তি যেন নষ্ট না হয়। শোন্, সাতটা গরুরই—সবটা। ব্যাপারটি সোজা নয়—বুঝলি?…দিন যায় তো ক্ষণ যায় না হে! হারামজাদাকে বলি, শীতল-আরতি হযে গেলেই তালা বন্ধ করতে; শুয়ার হরগিজ শুনবে না! দূর ক'রে দেব।"

চৌধুরী ব'লেই চললেন, "হ্যাঁ, কি নাম বললে, তিলের ধামা আর কি? কি বিদকুটে নাম রে বাবা! না ক্ষ্যান্তো, না লক্ষ্মী, না বিধু! ওরা কখ্খনও ভাল মেয়েমানুষ নয়। খবরদার ইন্দু, ওদিকে যেতে পাবি নি, ফেব বিদ্যুৎ চমকাতে পারে। তোর এত ছটফটানি কেন রে রাসকেল? ব'স এখানে।"

এই ব'লে ইন্দুর হাত মনে ক'রে, সট্কার নলটা ধ'রে জোরে টান মারতেই, গড়গড়িটা উলটে প'ড়ে—লঙ্কাকাণ্ড!

এতক্ষণে চৌধুরী মশার ঘুমের ঘোরটা একেবারে কেটে গেল, চোখও খুলে গেল।

ইন্দু হাসি চেপে গম্ভীরভাবে বললে, "তারিণী পুরুত বললেন, আপনাকে নেড়া হয়ে প্রাচিত্তির করতে হবে।"

চৌধুরী মশাই একদম অবাক, "কেন? মুংলী মরেছে বুঝি, গলায় দড়ি ছিল?"

এতক্ষণের ঘটনাটা তাঁর মাথায় ধোঁয়াটে মেরে ঘোলাচ্ছিল, কিছু ঠিক করতে পারছিলেন না। ইন্দুর কথায় যেন কুয়াশা কেটে গেল;—তবে তো সত্যি!

সহসা চ'টে উঠে "হারামজাদ্, মশা-মাছিতে মেঘ দেখতে পায়, আর তুমি বেটা চোখ বুজে ব'সে আছ!" ব'লেই নন্দার পিঠে পটাপট চটি-প্রহার। সে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

ইন্দু তাঁকে ধ'রে বসিয়ে বললে, "আজ্ঞে, শুধু তাই নয়,—শিবের মন্দিরে ঐ যে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কাণ্ডটা--"

"ওঃ, হ্যাঁ! হ্যাঁ, তারা কি এখনও –"

"না, তাঁরা বোধ হয় বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন। আমি দেখে আসছি দাদামশাই,—এক মিনিটও লাগবে না, এলুম ব'লে।"

"দাঁড়া বলছি ছুঁচো! তোর এত দেখতে যাবার মাথাব্যথা কেন রে ইষ্টুপিড! শুনলে হরদেব, আমার নীতিবোধ-পড়া নাতি কি বললেন, 'তারা বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন!' তাঁরা!! ওরে গাধা, তোর দাদামশাই জানে, তারা ঘরে থাকবার নয়। নন্দা, দেখ্ দিকি, অমনই গোবরজল ছড়া দিয়ে আসবি;—আর আমার জন্যেও একটু গঙ্গাজল আনিস, কান দুটো ধুয়ে ফেলি।"

*    *    *

ইন্দু তখন সদরবাড়ির বাগানে আনন্দাতিশয্যে ছুটোছুটি করছে, আর আপনা-আপনি হো-হো ক'রে হাসছে, আর হাঁপাচ্ছে।

রিহার্সেল-ঘরে না পেয়ে শরৎ তাকে খুঁজতে এসে তার অবস্থা দেখে অবাক!

"কি হে, ব্যপার কি? একা একাই সিদ্ধি চড়িয়েছ নাকি?"

ইন্দু—" 'সখি রে কি কহিব আনন্দ ওর!' চড়া-নি, লাভ করেছি।"

"কি রকম?"

"ভাই, সারা বিকেলটা প্রহসনের প্লটের জন্যে মাথায় পেরেক ঠুকেও একটা

প বার করতে পারি নি,—পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম। পিসী-পর্ব পার হয়ে শেষ প্লটে ঠেকে গেলুম। এই অবস্থায়—

স্বপ্নে কহি দিলা দেবী—"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি ?"

"না হে,—ভূতাবিষ্ট দাদামহাশয় প্রমুখাৎ,—একদম খাঁটি স্বপ্নাদ্য।"

# পেন্‌শনের পর

আমরা বাঙালী। বাঙালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞেরা—অর্থাৎ লেখক-বক্তারা, একবাক্যে শেষ কথাটা ব'লে দিয়েছেন যে, এরা চাকুরে জাতি।

চাকরিই যদি পেশা হ'ল, ভাল চাকরি খোঁজাই স্বাভাবিক। সরকারী চাকরিই সেরা, তাতে পেন্‌শন আছে, ভাগ্যে থাকলে খেতাবও মেলে।

আজকার এই সম্মিলনী-সভায় অনেক ভদ্রসন্তানই থাকতে পারেন,—যদি অপরাধ না হয় তো তাঁদের অনুমতি নিয়ে বলি,—যাঁরা সরকারী চাকরি করেন, পেন্‌শনের আশা রাখেন; কিন্তু পেন্‌শন কথাটা তাঁদের আজও শোনা জিনিস; কাগজে-কলমে জানলেও সেটার আস্বাদ তাঁরা পান নি। আমি কিছু কিছু পেয়েছি, তাই বোধ করি সে সম্বন্ধে বলবার একটু দাবিও আছে।

আমাদের দেশে চাকুরেরাই বোধ হয় বেশি লিখেছেন, ডেপুটিরাও চাকুরে,—অবশ্য বড় চাকুরে। সম্ভবত সেই আশাতেই সম্মিলনীর * প্রধান কর্মচারী মহাশয়, আমাদের কাছ থেকে গবেষণাপূর্ণ মৌলিক কাজের কথা প্রভৃতি চেয়েছেন। তা তিনি নিশ্চয়ই পাবেন, তবে আমার কাছে নয়।

পেন্‌শন-প্রাপ্তির পরের অভিজ্ঞতাটা গবেষণা-প্রসূত বা মৌলিক না হ'লেও, অনেকের কাছে নতুন আর কাজের কথা ব'লে গৃহীত হতে পারে। অবশ্য এটা আমার অনুমান। আমি সেই সম্বন্ধেই এদু' বলছি। বিষয়বুদ্ধি কোনদিনই না থাকায়, বিষয় খুঁজে পাই নি; অপরাধ ক্ষমা করবেন।

জীব মাত্রেই মুক্তি খোঁজে, বন্ধন কেউ চায় না। সেটা এড়াতেই চায়। আমিও জীবের মধ্যে একটি, তাই "জীব মাত্রেই" বলেছি, "মানুষ মাত্রেই" বলি নি। পেন্‌শন নেবার জন্য ছটফট করছিলাম, দিন গুনছিলাম। আপিসের প্যাডখানা পঞ্জিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যেদিন থার্ড বেল দিলে, তিনটে বাজতেই "আর কারোর চাকর নই," ব'লে কাগজপত্র গুটিয়ে, বাসায় চ'লে এলুম। অনন্তশয্যা পাতাই ছিল, এসেই সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। সর্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল, গায়ে আর ধরছে না। পা দুটো সামনে, আর হাত

---

* প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন—দিল্লী

দুটো মাথা ডিঙিয়ে সজোরে সোজা ক'রে দিয়ে, উপর দিকে চেয়ে বললুম, "উঃ, এতটা দিন কাটিয়ে দিয়েছি! পঁ-চি-শ বছর। আজ তুমি এলে! সত্যি এলে!" বলতে বলতে এমন লম্বা হয়ে পড়লুম, খাটের বাইরে পা গিয়ে পড়ল, হাত দুটো মাথা পেরিয়ে যেন দু হাত তফাতে। আজও বুঝতে পারি নে, সত্য কি মিথ্যা। মনে আছে, চোখে জল গড়িয়েছিল। আনন্দের বেগ যে এটুকু শরীরে ধরছিল না। নিজেই অবাক হয়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে—হবে না কেন, বন্ধনমুক্তি যে! বদ্ধ অবস্থায় কি ক'রে বুঝব, আমি কত বড়! নীলাচলে মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল রঙ দেখে, শ্রীকৃষ্ণ ভেবে আনন্দে "এই যে এই যে" ব'লে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জেলেরা তোলবার পর অনেকেই দেখেছিলেন, তাঁর দেহ দেড়া হয়ে গেছে; আনন্দে অঙ্গ শিথিল হয়ে হাত-পায়ের খিল খুলে গেছে।

যাক, মুক্তির আশার আনন্দেরই এতটা প্রভাব। প্রকাশের বেদনা উপস্থিত, কার কাছে বলি, বাসায় কেউ নেই। চাকরটাকেই বললুম। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, বাবু ভাঙ খেয়েছেন।

বাসা তুলে বাড়ি গেলাম। দেহমনে কোথাও আর ভার নেই, স্বাধীন জীব। এইবার একমনে ভগবানের নাম করা, গ্রামের স্কুল আর লাইব্রেরিটে দেখা, আর গুড়ুক খাওয়া। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখবার জন্যে ছোট একটি বাগান করা,—বাস্।

দিন দশেক বেশ গেল। কোট, জুতো, মোজা বজায় রইল! তারপর—"ব'সে ব'সে কি করবে, বাজারটা করলেও তো সংসারের উপকার হয়!"

সত্যিই তো। কোট, জুতো, মোজা খসল। পল্লীগ্রামের বাজারে চার আনার বাজার করতে মোজা জুতো প'রে আর কে যায়! গামছা কাঁধে উঠল,—যে কাজের যে বেশ।

ক্রমে, "এটা আন নি, ওটা আন নি, এটা এত কম কেন, ওটা অত মাগ্গি কেন, ঘুশোচিংড়ি সবাই পেলে আর তুমি পাও না!" ইত্যাদি।

আগে আমি হুকুম করতুম, এখন আমি হুকুম শুনি,—সারাদিন বার-বাড়িতেই দিন কাটাই,—ভগবানের নাম করা চাই তো! বউমারা—সোনা, মানিক, গোপাল, যাদু লেলিয়ে দিয়ে যান, ব'লে যান—"পুকুরে না যায়, প'ড়ে না যায়, মানিককে কোলে ক'রে পা নাড়লেই ঘুমুবে, ভারি শান্ত ছেলে।"

কেউ নাক টানে, কেউ কান টানে, কেউ যা করে তা সভায় বলবার

নয়। কাঁদলে আমার দোষ। এই নিত্য। সব ছেলেই শান্ত। গোপাল লাফিয়ে প'ড়ে দাড়িটে কাটলে, কপাল পোড়ে আমার। বউমা বলেন—"বুড়ো মিন্‌সে ব'সে ব'সে ফেলে দিলে গা! কাজকর্ম নেই, ছেলেগুলোকে দেখতে শুনতেও পারেন না", ইত্যাদি।

কর্তা ছিলুম। এখন আমি একাধারে ঝি-চাকর দুই-ই। অবশ্য তারা যা বলে আর করে, তা নাকি আমার ভালর জন্যেই।

ভগবানের নাম করবার কথা মুখে আনলে সদুপদেশ পাই, "ছেলেরা কি ভগবান নয়, ওদের নিয়ে থাকলেই ভগবানকে নিয়ে থাকা হয়।" ঠিক।

বোধ হয় পূর্বজন্মে কড়া সাধন-ভজন ক'রে থাকব, তাই ভাগ্যে এতগুলি ভগবান জুটেছেন।

সব গঙ্গাস্নানে কি নিমন্ত্রণে যান, বাড়ি চৌকি দিতে হয়, বৎসগুলি সামলাতে হয়। এই শেষেরটিই সাংঘাতিক, যেহেতু সবাই শান্ত। তারা আমার প্রাণান্তের পাশ ছড়িয়ে দিলে।

আর তো পারি নে। এক বছরেই বেশ বুড়িয়ে দিলে। চুল পাকল, মেরুদণ্ড বাঁকল। এখন যা জলখাবার পাই, তা ওই পঙ্গপাল—তারাই খায়, আমি দেখি। ক্রমে স'য়ে গেল। একদিন দেখতে পেয়ে বললেন, "কি, আনন্দ বল দিকি?" বললুম, "অত্যন্ত।"

সকাতরে ভগবানকে বলি, "বন্ধন-মুক্তির সাধ মিটেছে প্রভু। ত্বয়া হৃষীকেশ, আর নিযুক্তোঽস্মি নয়, দয়া ক'রে বিযুক্তোঽস্মি!"

একটু ফাঁক পেলে, কোন দোকানে কি ঘাটে ব'সে বাঘ মারি অর্থাৎ আপিসের আর সাহেবের গল্প করি।—আপিস ছিল মুঠোর মধ্যে, আর সাহেব ছিলেন হাতের পুতুল। যা ছ'কে রেখে এসেছি, এখন অন্ধে কাজ চালাতে পারে; তবু এই একের অভাবে তিন তিনজন রাখতে হয়েছে, ইত্যাদি। সেই সময়টুকুই কাটে ভাল।

পরম স্নেহের আর মোহের 'গ্লোবিউল্'গুলি ক্রমে অসামাল ক'রে তুললে। বুড়ো বয়সে পালাবার পথ এনে দিলে। মনে পড়ল, বাল্যবন্ধু ভগবতীবাবুও পেন্‌শন নিয়েছেন, দেওঘরে আছেন। তিনি কেমন আছেন, দেখা যাক। ভাগ্যবান লোক, ভালই থাকবেন।

অবস্থা পাকাই দাঁড়িয়েছিল, খসতে বিলম্ব হ'ল না। এখন আমার পা বাড়ালেই অমৃতযোগ।

দেখে বন্ধু ভারি খুশি, বললেন, "বাঁচালে ভাই, দুটো কথা ক'য়ে বাঁচব।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "আগে বল তো, আছ কেমন?"

"বড়ি মজিমে হ্যায় ভায়া।"

শুনে বড় আনন্দ হ'ল, বললুম, আমিও পেন্‌শন নিয়েছি, তোমার রুটিন্‌টে জানতে এলুম, অবশিষ্ট জীবনটা সেই আদর্শমত কাটাবার চেষ্টা করব।"

"ও ভেবো না, কোনও চেষ্টা করতে হবে না হে, আপ্‌সে এসে যাবে। আমাকে কি কিছু করতে হয়েছে, না করতে কেউ দিচ্ছে?"

বললুম, "সব সংসার তো একরকম নয় দাদা, না সব অদৃষ্ট।"

"সব এক ভাই—সব এক! পেন্‌শন নেবার পর সব এক, বৈচিত্র্যের বেয়াদবি নেই—দেখতেই পাবে।"

স্নানাহারের পর আমাকে বিশ্রাম করতে ব'লে ভগবতীবাবু ভিতরে গেলেন।

বেলা তিনটের পর এসে বললে, "কই, ঘুমোও নি তো?"

"দিনে বড় একটা ঘুমোই নে, একটু গড়িয়ে নিই বটে। বই কি খবরের কাগজ থাকলে তাই নিয়েই থাকি!"

"ও বদ-অভ্যাসটা থেকে মা সরস্বতী কৃপা ক'রে আমাকে রেহাই দিয়েছেন,—যথালাভ। বাংলা হরফগুলো ভুলে না যাই, তাই পাঁজি একখান' থাকে। ফি-বছর কিনতে হয় না,—সবই 'নূতন পঞ্জিকা,' মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনগুলো দেখি,—ভারি interesting হে! কিন্তু ঝঞ্ঝাটও বড়, বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখতে হয়,—ছেলেমেয়েদের হাতে না পড়ে।"

বললাম, "তুমিও তো শোও নি দেখছি।"

"আমি? হেঃ, পেন্‌শন নিয়েছি যে! দেখছ না, তোফা মানস-সরোবরে রয়েছি, বুকে পিঠে রাজহংস-রাজহংসীরা কেলী করে, চোখ বুজতে ভয় হয়—কখন্ কোন্‌টা চোখ খুবলে নেবে!"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল, বললুম, "পড়েন না, ঘুমোন না; তবে আহারের পর এ চার-পাঁচ ঘণ্টা করেন কি?"

"করেন কি?—করেন কর্মভোগ। গ্রহ কি সূত্র ধ'রে কখন যে দেহে প্রবেশ করে, তা বলা যায় না ভাইয়া। কৈশোরে শিল্পের দিকে বেশ একটু ঝোঁক ঝামরেছিল। বেগুনী রঙের রেশম এনে, চাদরে পাড় তুলে ব্যবহার করতুম। দেখে বাহবা পড়ে গেল। মামা আমাকে নিয়ে জ্যোতিষীর বাড়ি

ছুটলেন। পণ্ডিত বললেন—'এ যে কাশ্মীরের শাল-শিল্পী বিখ্যাত কুদ্‌রৎ খাঁ! বাংলায় এসে জন্মেছে। কালে এ জামিয়ার বানাবে।' মামা প্রতিভার কদর জানতেন,—ইস্কুলটা ছাড়িয়ে দিলেন। তাঁরই আশীর্বাদে এখন নিদ্রা ত্যাগ ক'রে জামিয়ার বানাচ্ছি। কাট্‌তিও তেমনই!

আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম আর ভাবতে লাগলুম—জগতে এসে দিনগুলো বৃথাই কাটিয়েছি, দেখছি, সকলেই কিছু না কিছু জানেন। বললুম, "বিজ্ঞাপন দেখি নি তো! নেবার লোক পান কোথা?"

"নেবার লোক? অভাব কি! বছরে তিন-চারটে বাঁধা খদ্দের আসেই; প্রত্যেকের অন্তত এক ডজন ক'রে চাই। পারলে তিন ডজন ক'রে দিন না। অধিকন্তু ন দোষায়, কেউ 'চাই নে' বলবে না। অত পেরে উঠি নে, সেজন্য সৎপরামর্শ সামলাতে রাতের ঘুমটাও যায়-যায় হয়েছে।

বললুম, "না দাদা, ছুঁচের সূক্ষ্ম কাজ এ বয়সে রাত্রে আর ক'রো না। পয়সা আছে বটে—"

বন্ধু বাধা দিয়ে "বললেন, পয়সা।"

বললুম, "না হয় টাকাই হ'ল।"

বন্ধু কথা না ক'য়ে চ'টে বাড়ির মধ্যে চ'লে গেলেন। একটা গাটরি এনে সামনে ধ'রে দিয়ে বললেন, "খুলে দেখ না।"

খুলতেই কতকগুলো ছোট, বড়, মাঝারি, প্রমাণ, তরোবেতরো কাঁথা বেরিয়ে পড়ল।

বললেন, "নির্ভয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখ—নির্ভয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখ, ওতে এখনও আমার কৃতকর্মের পুরস্কার স্পর্শ করে নি। প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হতে এখনও দেরি আছে।"

দেখে শুনে আমি তো স্তম্ভিত।

"চুপ ক'রে রইলে যে?"

"না, ভাবছি, আমাদের শুভানুধ্যায়ী শাস্ত্রকারেরা অনেক ভুগেই ব'লে গেছেন—বাঁচতে চাও তো পঞ্চাশ পেরলেই বনে যাও।"

"কি বললে,—বন? বন তুমি কাকে বল? বাঘ-ভাল্লুক থাকলেই তো বন। তার সঙ্গে চিতে, নেক্‌ড়ে, বিচ্ছু—আর কি চাও? এখানে অভাব অনুভব করলে নাকি?"

ও কথা মাথা পেতে মেনে নিয়ে বললুম, "গৃহস্থালীর ছুঁচের কাজটা সকল দেশেই মেয়েরা—"

বন্ধু ব'লে উঠলেন, "অম্বল, ভায়া, অম্বল। আহারান্তে অমনিতেই বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকে। তার ওপর আবার হাতে ছুঁচ। ব'ল কি!"

অপ্রতিভের মত বললুম, "তা তো জানতুম না, এখন কেমন আছেন?"

বললেন, "কাশীর গারাভৈরবী-দিদি বড় স্নেহ করেন, ওস্তাদও তেমনই, তাঁর ব্যবস্থাতেই বেঁচে আছেন। সিদ্ধা কিনা, চুড়া-বাঁধা চুলে সোনার তারে গাঁথা স্ফটিকের মালা জড়ানো, হাতে জার্মান-সিলভারের high-polish (তেল-চুকচুকে) ত্রিশূল, দেহ চন্দনের ক্ষেত। যেমন সৌম্যা, তেমনই ধৌম্যা। তাঁর টোটকাই চলছে, আহারান্তে ঘড়ি ধ'রে তিন ঘণ্টা গড়ানো, না হয় চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য তিন ঘণ্টা তাস-খেলা, তাতেও যদি না হঠে, সেকেন্দরী সিকার পাক্কা তিন-পো মালাই। শেষেরটিই ব্রহ্মাস্ত্র, পড়েছে কি সব বালাই সাফ, সেইটিই চলছে।

"হ্যাঁ, গৃহস্থালী বলছিলে না? আমার এটা ঠিক গৃহস্থালী নয় ভায়া, নিজের গড়া 'গোলেবকালী'। এই যেমন বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। প্রতিভাবানদের দস্তুরই ওই, বানানো পথ বাদ দিয়ে চলা।"

আমিও অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবছিলুম; শেষটা Penguin Island-এ পৌঁছে গেলুম নাকি, ইনিই মহাপুরুষ St. Mael নয় তো? তাড়াতাড়ি কাঁথার পুঁটলিটা বন্ধুর হাতে দিয়ে বললুম, "করেছ কিন্তু সুন্দর, শিল্পকলা একেই বলে, বাঃ!"

বললেন, "হ্যাঁ, আসল চাটিম-কলা, কুদরৎ খাঁ যে!" ব'লেই হাসিমুখে পুঁটলিটা নিয়ে প্রস্থান।

ভাবলুম, রেহাই। তা কিন্তু হ'ল না।

পুঁটলি রেখেই পুনঃপ্রবেশ।

"হ্যাঁ, যে কথা বলতে এসেছিলুম; আমাদের বন্ধু অমর এখানে এসেছে। আজ দেখি, লোহালক্কড়ের দোকানে দ্বিতীয় প্রহরের রোদটা মাথায় ক'রে ছুটোছুটি করছে! আহা, তার তো পেন্‌শন নয়, এ আরাম পাবে কোথায়? কলকাতায় Hardware-এর লোহার দোকান।

"তাকে বললুম, 'এত বেলায় এই রোদে করছ কি, অসুখে পড়বে যে! বিশেষ দরকারী কিছু নাকি? ছাতাটা ফেললে কোথায়?'

"অমর হেসে বললে, 'যাতে দু পয়সা আছে তাই দরকারী; এই দেখ না, ঘণ্টা দেড়েক ঘুরে দেড়শো টাকা ঘুরিয়ে আনলুম। ভেবো না, আমরা রোদে-জলেই মানুষ, ছাতা নেওয়ার বদ অভ্যাস নেই। অসুখ বলছ! অ-রোজগারের চেয়ে আর ব'সে থাকার চেয়ে অসুখ আছে নাকি?' এই ব'লে হি হি ক'রে হেসে 'ক্যা ভাইয়া!' ব'লেই একটা লোহার দোকানে ঢুকে পড়ল।

"ওর জন্য বড় দুখ্‌খু হয় ভাই, পেন্‌শন পেলে আজ—আহা,—ভাগ্য! বুঝছ তো,—কি বল? তবে পয়সার প্রেম ওকে যৌবনের বল যুগিয়ে জোয়ান ক'রে রেখেছে। আর আমি বেটা চিন্তামণি হ'য়ে রইলুম হে!"

"সে আবার কি! ভগবতীই তো জানি, চিন্তামণি হ'লে কবে?"

"ভগবতী তো বটেই, এটা ছেলেদের কাছে প্রমোশন-পাওয়া খেতাব।"

"বুঝতে পারলুম না তো!"

"খুব সোজা,—ঠেকে একটু কঠিন বটে। এই পেন্‌শন নেবার পরের কথা গো, তখন দেশেই ছিলুম। গরুটা সাত মাস গাভিন; কি ক'রে বেরিয়ে পড়েছে, সন্ধ্যা হয়, ফেরে না। চঞ্চল হতে হ'ল। হ'লে আর হবে কি, বাতে কাত ক'রে রেখেছে। যা হোক, সুক্ষণে কি কুক্ষণে, কড়াই-শুঁটির কচুরি হতে দেরি হওয়ায়, বাবাজীরা আটকে গিয়েছিলেন, তখনও বাড়ি ছিলেন। বললেন, 'ভাবছেন কেন, আমরা দেখছি।'

"শুনে কতটা সাহস আর আনন্দ পেলুম, বুঝতেই পারছ। ভগবানের কাছে তাদের কুশল আর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করলুম। বাতের বেদনা ভুলে গেলুম, আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এল। পুত্রহীনদের জন্যে পরম আপসোস অনুভব করতে লাগলুম। আহা, তারা কি দুর্ভাগা! মজ্জায় মজ্জায় মনে হ'ল—পুত্র plus পেন্‌শন equal to Paradise। বললুম, 'তা হ'লে আর দেরি করিস নে বাবা, কালা-গরু সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেখতে পাওয়া শক্ত হবে। হিঁদুর দেশ, কোন্ বেটা বেড়ো মেরে খেঁড়ো-গাইটে সাবাড় করে দেবে; বেরিয়ে পড় যাদুরা।'

"তাদের গর্ভধারিণী আডানা-বাহারে ব'লে উঠলেন, 'বাছাদের কি খেতেও দেবে না,—এখনও পাঁচখানাও যে পেটে পড়েনি! তোমার তাড়ায় বসে নি পর্যন্ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে দিচ্ছে।'

"অর্থাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কেশ আর কচুরি দুয়ের সেবাই চলছে।

যাক, চুল ফিরিয়ে, পাঞ্জাবি প'রে, পম্পশু মেরে, গরু-খোঁজা বেশ সেরে, চট ক'রে বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা বেরিয়ে পড়ল।

"বাতের তেলের বিদ্‌ঘুটে গন্ধ সারাদিন ভোগ করার পর, সহসা সুমধুর সৌরভে ঘরটা ভ'রে যাওয়ায়, নিশ্বেস টেনে—আঃ! কি আরামই পেলুম! ছেলেরা বোধ হয় রুমাল টেনে মুখ মুছতে মুছতে গেল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে বললুম, 'কচুরিগুলো সবই ফেলে গেল নাকি? রেখে দাও, এসে খাবে'খন।'

"বললেন, 'গোনাগুনতি করেছিলুম, তার আবার ফেলে যাবে কি,—সোমত্ত বয়েস,' ইত্যাদি বহুৎ।

"বললুম, 'যাক, বোধ হয় ভালই হয়ে থাকবে।'

"বললেন, 'মন্দ হ'লে ওরা মুখে করত কিনা!'

'রাম কহো—ওরা সে ছেলেই নয়।'

"পুত্রগর্বেই বোধ হয় আবার বাতের বেদনা ভুলে গেলুম। চিন্তায় চুর হয়ে কেবল কালা-গরুই ভাবছি। সাতটা বাজল, আটটায় ঘা দিলে—এই আসে। গরু এল না, নটার আওয়াজ এল। কান দুটো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। সে কী প্রতীক্ষা!

"তদুপরি ব্রাহ্মণী তর্জনসহ বললেন—(যেহেতু পেন্‌শন আর তর্জন কবিতায় শ্রেষ্ঠ মিল না হ'লেও উভয়ে পরম আত্মীয়)—'ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে গেল, এখন তাঁরা ফিরলে বাঁচি! কেবল গরু গরু আর গরু; আর সোনার চাঁদ ছেলেরা হ'ল ওঁর গরুর চেয়ে কম।'

"কি বলছ গো! এমন কথা আমি কখনও ভুলেও যে ভাবি নি! আর যা বল বল, এতবড় মিথ্যা অপবাদটা আমাকে দিওনা গিন্নী।'

"একখানা মোটর এসে সশব্দে থামল। এত রাত্রে আবার কে! বোধ হয় রহিম মিঞা বিজয়ার নমস্কার করতে এসেছে,—মোটরে আর কে আসবে! সে আমাদের সহিস ছিল, এখন তার সময় ভাল। আজ দু বছর আসছে; শুধু হাতে আসবার লোক সে নয়।

"সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে, ধামা চেঙারি লুকিয়ে রাখতে ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

"সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রবেশ—

"পাঁচ টাকা দশ আনা Taxi-ভাড়াটা চট ক'রে দিন তো। বেটাকে

ছ টাকা দেবে, না, আরও কিছু! দিন, আর দেরি করবেন না, বজ্জাৎ বেটা, লাভের ছ গণ্ডা টেনে নেবে, দিন।'

"ভাঙানো ছিল না, ছ টাকাই হাতে দিতে হ'ল।

" 'শ্যামলীকে কোথায় পেলি?'

" 'সে অনেক কথা—বলছি।' ব'লেই বেরিয়ে গেল।

• "যাক গাভিন গরুটা যে পাওয়া গেছে সেইটেই পরম শান্তি, দুভাবনা গেল। উপরি লাভ 'পাইভরের' পরিমল। অকৃত্রিম মহামাষ তেলটা খানিকক্ষণ মগজ মথন করবে না।

"পাশের ঘর থেকে মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণ জুড়িয়ে দিতে লাগল। সে কি একটা অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি! সংসারের সুখই এই! সবই ভাগ্যসাপেক্ষ। দেখ না, এরা আদিতে কেউ ছিল না, মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে এই মধুচক্র রচনা করেছে. গৌড়জন যাহে,—বুঝেছ তো—

শুন শুন রবে, কেমন সুখেতে সব
মধু পান করে।

"নয় কি! আবার—God forbid. অন্তেও কেউ থাকবে না অবশ্য আমার প্রাণান্তের ‍ ‍র।

"একেই বলে—ভগবৎলীলার শিলাবৃষ্টি। আদিতে জল, অন্তে জল, মধ্যে মাথা সামলাও।

"যাক, আনন্দোচ্ছ্বাস কিনা, সামলাতে পারি নে।

"খোদ্দাটা শুনলুম—বাবাকে চট ক'রে নিশ্চিন্ত করবার ‍ ‍ বাবাজীবা মোটর নিয়ে গরু খুঁজতে রওনা হন। হোটেল, বায়স্কোপ, 'কিন্নরী' সেরে ইডেন ঘুরে হয়রান হয়ে ফিরেছেন। বলছেন—'গড়ের মাঠে যে গরু মেলে না, সে গরুই নয়।' এক গন্ধবণিক বন্ধু ব'লে দিয়েছেন,—মহামাষ তেলের গন্ধেই গরু পালিয়েছে. তোমরা সাবধান। একটা ক্যানেঙ্গা-ওয়াটার কিনে নিয়ে যাও। দেড় টাকা দিয়ে কিনতেই হ'ল! সে গরু আর ফিরছে না। বাবার দোষেই তো এইটি হ'ল! ও-তেল আর মাখতে দিচ্ছি নে, বাথ্‌গেট্‌ থেকে দু বোতল নিয়ে তবে ফিরেছি। মাথায় মাথাই তাঁর দরকার. সোজা কথাগুলিও আর ওঁর মাথায় আসছে না। রোজ এক টাকার দুধ কিনলেই হয়,—তা বুঝবেন না।'

"বামাস্বর শোনা গেল, 'আগে তো এমন ছিল না, কাছারি যাওয়া ঘুচিয়ে

এসেই বুদ্ধিশুদ্ধি বিগড়ে গেল। এক হাবাতে বাত জুটিয়ে দিনরাত ব'সে আছেন. বেরুতে বললেই বেদনা বাড়ে! দুধ কেনবার কথা পাড়লেই ব'লে ব'সে আছেন—টাকা আসবে কোথা থেকে?'

"বাবাজী ব'লে উঠলেন, সে তুমি ভেবো না মা, যে খায় চিনি তাকে যোগান চিন্তামণি।'

"শুনলে ভায়া! গরু গেল, গরু খোঁজার মোটর ভাড়া গেল, উপরন্তু সাত সেলামী! এখন 'চিন্তামণি' বানিয়ে রেখেছে। যা চাইবে যোগাতেই হবে। পন্থ পন্থা—বেঁচে থাকতে—বিদ্যতেহয়নায়। কি বল?"

বলব আর কি, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, একটু হাল্‌কা বোধও করলুম।

বন্ধু আর দাঁড়ালেন না। যাবার সময় যে হাসিটে মুখে ক'রে নিয়ে গেলেন, সেটা আমাকে বেদনাই দিলে।

তাঁর রুটিনের রপট শুনে শিউরে উঠেছিলুম।

এখন উপায়?

ভাবলুম, পেন্‌শনারের পিঁজ্‌রাপোলে যাওয়াই ভাল। কাশী রওনা হয়ে পড়লুম।

ওঁ শান্তি।

# দূরের আলো

অপূর্ববাবু সাত বছরের ডিপুটি। আমাদের গ্রামেই বিবাহ করেছেন। কচিৎ কখনও তাঁর আবির্ভাব হ'ত; ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিন দিন কখনও কাটাতেন না। মাথার অসুখ হওয়ায় কবিরাজের স্মরণ নেন। তিনি বলেছেন—এই সময় দিনকতক নথিপত্র থেকে মাথাটা নড়িয়ে, শহরের ধূলি-ঘন বায়ুর বাইরে গঙ্গাকূলে—কোন বৃক্ষলতা-বহুল শীতল পল্লীতে থাক', আর প্রাতে নিয়মিত গঙ্গাস্নান। আড্ডা দিতে পারলে আশু ফল পাবে,—অবশ্য দাবা পাশা বাদ, সেরেফ গান গল্প গুড়ুক. হাসি তামাসা; তাস খেলো তো এক ঘণ্টা,—বাস্, তার বেশি নয়। এই হ'লেই সেরে যাবে; ঔষধের আবশ্যক নেই। তাই এক মাসের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, যেহেতু আমাদের গ্রামখানি গঙ্গার ওপরেই, আর বৃক্ষলতা-বহুল তো বটেই।

আমাদের বৈঠকের আড্ডাটা ছিল বিশুদ্ধ। তিনি খোঁজ নিয়ে তাইতেই ভর্তি হয়ে পড়লেন। বেশ মিশুক লোক, দু-তিন দিনেই বেমালুম আপনার লোক ব'নে গেলেন।

আমার 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আসত, একদিনের পুরাতন সংখ্যাখানা দুপুরবেলাটা কাটাবার জন্যে নিয়ে যেতেন। সেদিন ইংরিজী ১৯২২ সনের ২-রা জুলাইয়ের কাগজখানা ফিরিয়ে দেবার সময় বললেন, "কত বড় জাত দেখুন, ওরা বড় হবে না তো হবে কে! আকাশে ওড়া জলের মধ্যে যাওয়া, হাজার হাজার মাইলে বেতার-বার্তার আদান-প্রদান, বৃদ্ধকে যৌবন দান, ইত্যাদি ইত্যাদি অল্পদিনের মধ্যে সেরে ফেললে। এবার দেখছি, মৃত্যুর পরপারের পাড়া লাগিয়েছে। দেখবেন, সপ্তলোক ভেদ করতে ওদের সাতটা বছরও লাগবে না,—আয়না বানিয়ে ফেলবে, ডাক বসিয়ে দেবে।"

"বলেন কি! পরলোকের সাড়া কিছু পেলেন নাকি?"

"আপনি বুঝি কাগজখানা কেবল নেন, দেখেন না? Sir Conan Doyle-এর (সার্ কোনান্ দয়াল-এর) নাম শুনেছেন তো? তিনি যে-সে লোক নন, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক—এডিনবরার LL. D., লণ্ডনের নামজাদা ডাক্তার, অসাধারণ বক্তা, আবার সাহিত্যজগতে দশজনের একজন। যেমনই হাতে বহরে, তেমনই স্বাস্থ্য, তেমনই মাথা। তিনি বিনা প্রমাণে বা

চক্ষে না দেখে একটি কথাও বিশ্বাস করবার লোক নন। আজ ১৫।২০ বৎসর তিনি অলৌকিক বা পারলৌকিক রহস্যের পেছনে পড়েছিলেন। এখন প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে অর্থাৎ ভূতের বা সূক্ষ্মদেহের ফোটো নিয়ে আর পারলৌকিক স্ত্রী-পুরুষ ডেকে এনে তাদের কথা শুনে, জগতে সেই বাণী প্রচার করতে দেশবিদেশে বেরিয়েছেন। অনেক ঘুরে সম্প্রতি আমেরিকায় লেকচার দিচ্ছেন। সর্বত্রই লোকারণ্য—স্থানাভাব—চড়া দরে টিকিট কিনেও লোক দাঁড়াতে স্থান পায় না। তিনি এক পয়সাও ছোঁন না,—সব টাকাটা Psychic ( আধ্যাত্মিক ) গবেষণার জন্যে দেন।

"তাঁর হচ্ছে—মৃত্যুর পর মানুষের জীবন নিয়ে কথা, অর্থাৎ ভৌতিক জীবন এবং তাদের সুখ বা দুঃখানুভূতি সম্বন্ধে!* আর তাঁর প্রধান বাণী হচ্ছে—'এ জীবনে যে-কোন বীজ ছড়াবে বা যা বুনবে, পরলোকে তার কড়ায় গণ্ডায় আদায় পাবে বা আদায় নিতে হবে।'†

"তিনি বলেছেন, 'যে বাণী (message) তিনি শোনাচ্ছেন, হয় তার মত মহত্তম বাণী মানুষকে কখনও দেওয়া হয় নি, না হয—এটা একটা ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি—মায়া।' তার পরই তিনি বলছেন, 'আমি যা দেখেছি, আমি যা শুনেছি, আর আমি যা সত্য ব'লে জেনেছি, সেইটাই শপথ ক'রে জানালুম।'"‡

"শুনলেন? কত বড় ব্যাপারটা বলুন দিকি,—ওদের অসাধ্য কিছুই নেই।"

বললুম, "ওঁর যা বর্ণনা শোনালেন, তাতে মহাপুরুষ ব'লেই মনে হয়। মানবের এতটা উপকার করছেন, একটি পয়সা নেন না। ওঁর Sherlock Holmes প'ড়ে ভারি আকৃষ্ট হয়েছিলুম বটে। যা হোক, উনি যে-কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ এর চেয়ে মহত্তম বাণী মানুষকে কেউ কখনও দেয় নি, তাতেই বোঝা যায়, বিশ্বের সব দেশ সম্বন্ধে খোঁটা অভিজ্ঞতা না থাকলে, এতবড় কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না। আনন্দের কথা এই, আমরা সব হারালেও 'দয়াল' আমাদের জোটেই, দয়ালের কমতি কখনও হয় নি।"

---

* . Life in the spirit world and the realization of happiness or woe.

†Whatever is sown in this life will be reaped to the uttermost limit on the other.

‡ .He says himself—The message he is delivering is either the greatest ever transmitted to mankind, or it is the most appalling delusion.

I testify to that which I have seen and heard and known to be true.

ডিপুটিবাবু একটু অবাক হয়ে আমার মুখের ওপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আপনার ভাবটা বুঝতে পারলুম না।"

"কেন, সত্য কথা নয় কি? বরং কবে যে ওঁরা দয়া ক'রে ব'লে দেবেন— 'মৃত মা-বাপের শ্রাদ্ধ করা অবশ্যকর্তব্য, সেই সাইন্টিফিক্ বাণী শোনবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছি যখন অতদূর পৌঁছেছেন, দেবেনই একদিন। ওঁরা না বললে বিশ্বাস করতে পারি না যে!"

তিনি একটু হেসে বোধ হয় মেনে নিলেন। আমিও আর কথা বাড়ালুম না।

ডিপুটিবাবুর ঝোঁক ছিল গল্প শোনবার। পল্লীর প্রাচীন কথা শুনতে তিনি ভালবাসতেন। একদিন একটা বলেছিলুম, সেই দিন থেকে নিত্যই তাঁর অনুরোধ পেতুম।

বললেন "নির্মলবাবু, আজ আপনাকে এত বড় জিনিসটে শোনালুম— আপনার তো দৃষ্টি এড়িয়েই গিয়েছিল, তার বদলে এমন একটি গল্প শোনাতে হবে যাতে আপনাদের গ্রামের পূর্বেকার ইতর ভদ্র ছেলে-বুড়ো দেখতে পাই।"

বললুম, "সেটা তা হ'লে গল্পের আইন-কানুন ছাড়িয়ে, পূর্বের পল্লী-পরিচয়ে দাঁড়াবে- আর তার মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে পড়বে। সেটা ঠিক গল্প হবে না।"

তিনি হেসে বললেন, "আপনার বলবার ধরনে সেটা যে গল্প হয়ে দাঁড়াবেই, সে ধারণা আমার হয়ে গেছে। তা ছাড়া, আমি তো নিছক মিছে গল্প শুনতে চাচ্ছি না।"

বললুম, "বেশ. তবে তামাকটা সেজে বসি।"

১

সেদিন ছিল শনিবার।

সকাল আন্দাজ ছটা হবে। বাড়ির সামনে ছোট বাগানটাতে পাইচারি করতে করতে দাঁতন করছি। পাড়ার একজন প্রৌঢ়া কলসী কাঁখে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। দেখি, একটি ছোট মেয়ে তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমার দিকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মেয়েটি কে? কই, কখনও তো দেখি নি! শ্যামবর্ণ, একখানি ডুরে কাপড় পরা, কোঁকড়া কোঁকড়া রুক্ষ কেশ কপালের ওপর দুলছে, বয়স হবে আট, কিন্তু সঙ্কোচ-মাখা সুন্দর চোখ দুটির বিনম্র ভাব বয়সটা যেন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে,—চোখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্র নাই। অবাক হয়ে চেয়ে আছি, মেয়েটি বেড়ার ধারে এসে বললে, "আমি যে আপনার কাছে যাব।'

"এস না,—ওই ওখান-দে এস।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পদদ্বয় স্পর্শ ক'রে মাথায় দিয়ে, উঠে বললে, আমি বিন্দুবাসিনীতলার মাধব ঘোষের মেয়ে। আপনিই তো আমার বাবার দাদাঠাকুর?"

হাসিমুখে বললুম, হাঁ, আমি তোমার বাবার দাদাঠাকুর, আবার দাদাবাবুও। তোমার বাবা কেমন আছেন?"

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল; সে বললে, আমার বাবার বড় অসুখ জ্যাঠামশাই, কাল ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আজ আবার দীনেশকাকা ডাকতে গেছেন। বাবা আপনার পায়ের ধুলো চেয়েছেন।"

শুনেই প্রাণটা দ'মে গেল। মুখে বললুম, "ভয় কি, সেরে যাবেন, চল, তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্ছি, চাদরখানা নিয়ে আসি।"

আমার স্ত্রী শুনে বললেন, "মেয়েটিকে বাড়ির ভেতর আনলে না কেন? হাতে কিছু দিতুম।".

"এর পর দিও।" ব'লেই চাদর নিয়ে বেরিয়ে এসে বললুম, "চল। তোমার নামটি কি মা?"

"আমার নাম গৌরী।"

আজ প্রায় বিশ বৎসর মাধবের সঙ্গে কোন সংস্রব না থাকলেও আমি কোন দিনই তাকে ভুলতে পারি নি। তার নামটি আজ আমার প্রাণে এই প্রভাতের পবিত্রতার মতই পরশ দিলে। প্রাণ যে তার কোন্ অদৃশ্য কক্ষে দুর্লভ স্মৃতিগুলিকে তাদের সত্যরূপ দিয়ে সসম্মানে অথচ গোপনে রাখে, তা বলতে পারি না। আজ নাম মাত্রই মাধবকে যেন সর্বাঙ্গে—শুধু অনুভব নয়,—উপভোগ করলুম।

২

মাধব ছিল গয়লার ছেলে। তার বাপের ছিল পাঁচ-সাতটি গরু আর নয়-দশ বিঘে ধান-জমি। তাইতেই তাদের বেশ চ'লে যেত। ওই একমাত্র ছেলেটিকে হীরু ঘোষ পাঠশালে লেখাপড়া শিখতে দেয়। মাধব পাঠশালের পড়া শেষ করলে; কিন্তু তার পড়বার ইচ্ছা শেষ হ'ল না। হীরু নিজের জাতের অনেক কথা, অনেক বিদ্রূপ স'য়ে, তাদের কাছে বিনীতভাবে মঞ্জুরি আদায় ক'রে আর বাবুদের অনুমতি নিয়ে মাধবকে ইংরেজী ইস্কুলে পাঠায়।

মাধব আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়। সে এল যেন ভদ্রলোকের ছেলেদের ভৃত্য, তাদের হুকুম তামিল করাই তার কাজ। কারুর পেন্‌সিল কি বই প'ড়ে গেলে মাধব তা কুড়িয়ে দেয়, কারুর মার্বল হারিয়ে গেলে কি দূরে গিয়ে পড়লে, মাধব তা খুঁজে আনে। কেউ তাকে কিছু হুকুম করলে মাধব সেটা সৌভাগ্য ব'লে নেয়। রোজ সকলের স্লেট ধুয়ে দেওয়াই ছিল তার কাজ। আমি জানি, মার্বল-খেলায় মাধবের টিপ ছিল খুব সুন্দর। পাঠশালে কোন ছেলে তাকে কোনদিন খাটাতে পারে নি; কিন্তু ইস্কুলে এসে পর্যন্ত যদি কেউ দয়া ক'রে তাকে নিয়ে খেলত, হেরে খাটাটাই ছিল তার কাজ। আমি খুব লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, বাবুদের ছেলেদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ইচ্ছে ক'রেই সে হারত—সব খেলাতেই।

ইস্কুলের প্রথম বছরটা তার কি নির্যাতনের মধ্যেই কেটেছিল! বোধ হয় কোন ছেলেই সে অবস্থায় এতটা দিন টিঁকে থাকতে পারত না। একটা ভাল কথা, কি হুকুম প্যাবার জন্যে কিরূপ লালায়িত হ'ত, কি সঙ্কোচেই সে আড়ষ্ট থাকত—ভয়ে ভয়ে স'রে স'রে থাকত পাছে কারুর গায়ে গা ঠেকে, কি কাপড়ে কাপড় ঠেকে! অজানতে সামান্য স্পর্শেই তাকে শুনতে হ'ত "এই বেটা গয়লার ছেলে, দেখতে পাসনা।"

আবার দয়াল পণ্ডিত মশাই তার সম্বন্ধে নিজের নামের বিপরীত অর্থটাই বরাবর বাহাল রেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে যে যা অভিযোগ করত, তিনি নির্বিচারে তাকে শক্ত সাজা মুক্তহস্তেই দিতেন। আমি তার হয়ে কিছু বলতে গিয়ে তাঁর মুক্তহস্তের দান প্রায়ই পেতুম। তাতে মাধব যে কতটা কুণ্ঠা বোধ করত, আর আড়ালে আমাকে কাতরভাবে বলত, "দাদাবাবু,

আপনার পায়ে পড়ি, আমার হয়ে কিছু বলবেন না, আপনাকে মারটাই আমাকে বড় বেশি লাগে।" তার সবচেয়ে বড গুণ ছিল, সে কখনও মিথ্যে কথা কইতে পারত না। এ সাহস ও-বয়সের ছেলেদের মধ্যে খুবই বিরল ছিল। বরং মিছে কথা ক'য়ে মাস্টারদের ঠকাতে পারলে ভারি একটা আনন্দ আর বাহাদুরি ছিল। একটা দিনের একটা কথা আজও ভুলতে পারি নি।

নটবর খবর দিলে—বসাকের বাগানে গোলাপজাম পেকেছে। যারা বাগান জমা নিয়েছে, দু-এক দিনের মধ্যে পেড়ে হগ সাহেবের বাজারে পাঠাবে। আমাদের গ্রামের জিনিস আমাদের চোখের সামনে দে বেরিয়ে যাবে আর আমরা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকব—এমনই আমরা অপদার্থ! আমরা কি কেবল গরুর মত গাছে ফুল ধরা থেকে ফল পাকা পর্যন্ত দেখতেই আছি! ইত্যাদি।

নটবরের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বন্ধুবরেরা একবাক্যে রায় দিলে, তা হতেই পারে না, তাতে গ্রামের বদনাম আছে। শুনেছি, কর্তারা ঐ বাগানেই মালীদের ছেকল দিয়ে সাত সাতটা নীচুগাছ নেড়া ক'রে বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। ওঃ, এক-একজনের জোর ছিল কত! শ্যাম জ্যাঠামশাই পাকা দু কাঁদি মর্তমান কলা দু হাতে ঝুলিয়ে নিমতে থেকে এই চার মাইল ছুটে এসেছিলেন—কোনও বেটা ধরতে পাবে নি। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পশ্চাতে এত বড় সব tradition থাকায় তখনই পরামর্শ স্থির হয়ে গেল, সেই দিন সন্ধ্যের সময় গোলাপজাম পেড়ে আনতেই হবে, তা না তো আমরা অপদার্থ—আমাদের মুখ দেখানো উচিত নয়।

একজন এ সংবাদও দিলে, বাগানের লোকেরা সন্ধ্যের সময় গঙ্গা দর্শনে যায়।

কথা হ'ল, কেউ দূরে, কেউ নিকটে পাহারায় থাকবে, আর মাধব বেশ নিশ্চিন্তে গাছে উঠে ডাল-সমেত গোলাপজামের তোড়া ছুরি দে কেটে কেটে তলায় ফেলবে, নটবর আর কার্তিক কুড়িয়ে হাতে হাতে চালান দেবে।

শুনে মাধব যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল। সে কাতর চোখে চেয়ে বললে, "আপনারা আমাকে মাপ করুন, এ কাজটি আমি পারবনা, আমি

গরিব ছোটলোক, বাবুদের বাগানে ঢুকতেই আমার পা ওঠে না। আবার বাবার জ্বর দেখে এসেছি, সন্ধ্যের সময় আমাকেই আজ বাড়ি-বাড়ি দুধ দিতে যেতে হবে।"

সাহস ক'রে সে 'চুরি করতে পারব না' কথাটা মুখে আনতে পারলে না—সেইটাই ছিল তার প্রাণের কথা।

"পারবি নি? আচ্ছা বেটা। ছোটলোকেই ভাল পারে, ঐ ক'রে খায়,—তাই বল। তারা আবার কিনে খায় কবে। ভাল চাস তো এখনও বলছি—।"

মাধব কম্পিত কণ্ঠে বললে, "আপনারা যখন যা বলেন তখুনি করি, কখনও কি না বলিছি? এ কাজটি আমি পারব না—আমাকে মাপ করুন।"

"থাক্ থাক্, দেখছ না, বেটা ধর্ম-পুত্তুর। ছোটলোকের বাড় দেখেছ! সেক্রেটারি অতুলবাবুই তো এইটি করলেন, দয়াল পণ্ডিত মশাই ঢের বারণ করেছিলেন।"

"যা না বেটা কানা-গরু, এখানে আর কেন, দূর হ—"

মাধব মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, একবার কেবল অন্যের অলক্ষ্যে আধ চাওয়া-গোছ আমার দিকে চাইতেই আমি ইশারায় যেতে বললুম। সে যেন ফাঁসি থেকে রেহাই পেয়ে ধীরে ধীরে ঘাড় হেঁট ক'রে চ'লে গেল। সে কি করুণ দৃশ্য! তার সেই অবস্থাটা আমাকে ভারি আঘাত করতে লাগল কিন্তু তার হয়ে একটি কথাও কইতে পারি নি।

অভিযান বন্ধ হ'ল না, কিন্তু সেটা সফলও হ'ল না—সুফলও দিলে না। গোলাপজামগুলি বৃক্ষচ্যুত হয়ে ধরাশায়ী হ'ল বটে, কিন্তু বাগানের লোকেরা এসে পড়ায় একটিও হাতে এল না। আমাদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যত্র-তত্র পথ দেখতে হ'ল।

পরদিন বেলা এগারোটার সময় ঝুড়ি ঝুড়ি গোলাপজাম ইস্কুলে এসে উপস্থিত হ'ল। যারা এনেছিল তারা কেঁদে জানালে তাদের চাকরি তো যাবেই, মাইনেও পাবে না। দু-তিনজনকে সনাক্তও করলে। হেডমাস্টার দয়াল পণ্ডিত মশাইয়ের উপর বিচারের ভার দিয়ে গেলেন।

রাতের-দেখা সনাক্ত মঞ্জুর হ'ল না। ক্লাসের সব ছেলেদের এক এক ক'রে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, এ কাজ কে করেছে? সবাই একবাক্যে বললে,

করেছে মাধব। সে-ই গাছে উঠে কেটে কেটে ফেলে, আমরা তার পরামর্শ-মত রাস্তায় ছিলুম, ইত্যাদি। কেবল হরিবিহারী আর আমি বলি, মাধব সে দলেই ছিল না; তার বাপের অসুখ ব'লে বাড়ি চ'লে গিছল।

সওয়াল-জবাবের উল্লেখ অনাবশ্যক। মাধব নীরবে যে-মারটা খেলে, একটা জানোয়ারেও তা পারত ব'লে মনে হয় না। স্কুলেই তার জ্বর এল। মিথ্যা কথা কবার অজুহাতে হরিবিহারী আর আমি যা পেলুম, তাতে জ্বরটা শুধু আসে নি।

এক কুড়ি সেরা সেরা ফল পণ্ডিত মশাই স্বহস্তে বেছে নিয়ে, বাগানের লোকদের বিদায় দিলেন আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তোমাদের কোন ভয় নেই, বাবুদের কাছে ইস্কুল থেকে চিঠি পাঠাচ্ছি, আর ফলের এই নমুনো রাখলুম,—দর জেনে ফাইনের ব্যবস্থা করাব।"

তারা ফলের ঝুড়ি নিয়ে চ'লে গেল। আর সেই বাছা বাছা উৎকৃষ্ট 'এক কুড়ি'টা দর-যাচাইয়ের জন্যে নটবরের মারফৎ পণ্ডিত মশার বাড়ি প্রস্থান করলে। সে-দিন তার ছুটি হয়ে গেল।

ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। পণ্ডিত মশাই অন্য ক্লাসে চ'লে গেলেন।

আঘাতগুলোর জ্বালা তখনও জীর্ণ হয় নি। কানে পৌঁছুতে লাগল, পণ্ডিত মশাই ছোট ছেলেদের জোর গলায় পড়াচ্ছেন—সদা সত্য কথা কহিবে; প্রবঞ্চনা করিয়া পরের দ্রব্য লইবে না; অবিচার করা মহাপাপ। ইত্যাদি।

হরিবিহারীর চোখের জল তখনও হু-হু ক'রে পড়ছে, সে পিঠে হাত বুলোচ্ছিল—খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। সবাই তার দিকে চেয়ে যোগ দিলে। আবার ভাব হয়ে গেল।

মাধব আরও দু বছর ইস্কুলে পড়ে। তখন আর ভদ্র ছেলেদের তার উপর সে পূর্বভাব ছিল না। সে ব্যবহারে আর চরিত্রগুণে সকলকে জয় করেছিল। বয়সের সঙ্গে বোধ হয় অনেকে তাকে চিনেওছিল।

সকলে যে চিনেছিল, এমন কথা বলতে পারি না। তার বিনীত আনুগত্য আর সুমধুর ব্যবহারকে কেউ কেউ অবশ্য প্রাপ্য ব'লেই ভাবত।

বাপ মারা যাওয়ায়—সংসার, দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী একেবারে তার মাথার ওপর এসে পড়ায়, সে ইস্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ছাড়াটা তাকে যে কতখানি বেদনা দিয়েছিল, সে যে-দিন সকলের কাছে বিদায় নেয়, সেই দিন সবাই তা অনুভব করেছিল। সে যখন হাত জোড় ক'রে অবনত শিরে—

অজ্ঞানে যে-সব অপরাধ হয়ে থাকবে তার জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে চোখের জল সামলাতে সামলাতে দীনহীনের মত চ'লে গেল,—সেই দিন আমরা—ভদ্রলোকের ছেলেরা—ক্লাসে ব'সে স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম, ক্লাসটা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তার চরিত্রমাধুর্যই আমাদের অনেককেই চরিত্র জিনিসটির মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছিল।

* * *

তার পর দীর্ঘ দিন চ'লে গেছে—বোধ হয় বিশ-বাইশ বছর। সে বাপের কাজগুলি—চাষ-বাস, গরু-বাছুর দেখা, দুধ যোগানো প্রভৃতি মাথা পেতে নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে, ভগ্নী দুটির বিবাহ দিয়েছে, নিজেও সংসারী হয়েছে। সংসারও বেড়েছে। তার শ্রমের বিরাম নেই, ছুটি নেই; বোধ হয় সে-বেশে সে দেখা করতে লজ্জাও বোধ করে, তাই বড় একটা দেখাও হয় না। সে সকাল সন্ধ্যা কাজে ব্যস্ত,—আমরা উদয়াস্ত চাকরির পশ্চাতে। দু-তিন মাসে একবার দেখা হ'লে, সেও পূর্ব্বের মত অবাধে কথা কইতে পারে না।

ভগ্নী দুটির বিবাহে সে দীনের মত এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে বন্ধুর মত সব কাজের ভার নিই। তাতে সে কি উৎসাহই পেয়েছিল! সে যে আমাদের নিয়ে কি করবে তা ভেবেই পায় না। কি অমায়িক কুণ্ঠামিশ্রিত হাসি।

মধ্যে মধ্যে বাংলা কি ইংরিজী বই চাইতে আসতো। একটু পেলে ছাড়তে ইচ্ছা হ'ত না, কিন্তু তার কাজে ফুরসৎ কোথায়? 'নরোত্তম-চরিত' আর 'The Imitation of Christ' বই দুখানার সুখ্যাতি তার মুখে ধরত না। তাই ও দুখানা আমি তাকে দিয়ে দিয়েছিলুম—সে কণ্ঠস্থ করেছিল। দেখাশোনার দূরত্ব তাকে কি দূরে ফেলতে পারে! সে যে আদর্শের মত হয়ে হৃদয় অধিকার ক'রে ছিল। তার পর তো অনেক বড় বাবু, বড় ধনী, বড় বিদ্বান, বড় গুণী দেখেছি—অনেক বড় কথা শুনেছি; কিন্তু তথাকথিত এই ছোট-লোকটির সেই ছোট ছোট বিনীত ব্যবহার গুলির দুর্লভ দীনতার পশ্চাতে কি যে একটা পবিত্র মাধুর্য ছিল, যার শীতল সৌন্দর্য ঐ-বড়র মধ্যে মেলে নি।

৩

মাধব মুখে একটু হাসি এনে বললে, "আমি জানি, দাদাবাবু আমাকে পায়ের ধুলো দেবেনই।"

বললুম, "ব্যাপার কি মাধব, কি হয়েছে, অসুখটা কি?"

সেই ভাবেই হাসিমুখে, খুব নীচু গলায় মাধব বললে, "এবার বিদেয় নেবার অসুখ দাদাবাবু, তাই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। জীবনের আরম্ভকালে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমার জন্যে অনেক নির্যাতন স্বইচ্ছায় সয়েছিলেন, এখন বিদায়-বেলায় আপনি বই আর কে সইবে দাদাবাবু?"

সেই মধুর কণ্ঠ, সেই সুমধুর কথা! কিন্তু আজ তা শুনে আগের মত উপভোগ করতে পারলুম না, প্রাণটা সহসা ব্যথায় ভ'রে উঠল। বললুম, "এসব তুমি কেন বলছ মাধব,—তুমি নিজে তো আমাকে কখনও ব্যথা দাও নি ভাই।"

এইবার মাধবের দুই চক্ষু জলে ভ'রে এল,—সে সামলে নিয়ে বললে, "সে যে অনেক কথা দাদাবাবু, আপনার আপিসের বেলা হযে যাবে।" পরে নিমেষ মাত্র নীরব থেকে বললে, "কিন্তু এর পরের জন্যে রাখলে, আমার বেলা যে ফুরিয়ে যাবে! আচ্ছা, আমার কথা থাক্, দীনেশের কথাটা আপনাকে না বললে তো নয় দাদাবাবু।"

"কে দীনেশ?"

"আমাদের লক্ষ্মীদিদির ছেলে বললে বুঝতে পারবেন কি? ও-পাড়ার হরলাল চাটুজ্জে মশাইয়ের বিধবা পত্নী—লক্ষ্মীদিদি। আমাদের বাঁড়ুজ্জে মশাইদের বাড়ির মেয়ে। বিধবা হযে অসহায় হয়ে পড়েছেন, বড কষ্ট। ঐ দীনেশ ছেলেটিই তাঁর আশা-ভরসা। ছেলেটি বড় ভাল।

"এইবার সে এণ্ট্রেন্স দেবে। পূর্ণবাবু বলেছেন, পাস হ'লেই তিনি পোস্ট-আপিসে ৩০৲ টাকায় নিয়ে নেবেন। দিদি বড দুঃখ-কষ্টে মানুষ করছেন—পাস সে হবেই দাদাবাবু।"

একটু থেমে মাধব বললে, "এইবার আর একটু কষ্ট দেব—আমার শক্তি নেই। দোরের মাথায় ঐ যে হাঁড়ি কটা আছে, তার বাঁ দিকের নীচের হাঁড়িটা পাড়তে হবে দাদাবাবু,—একটু ভারি ঠেকবে।"

একটু নয়—বেশ ভারি ; পেড়ে দেখি, টাকা, আধুলি, সিকি, দোয়ানি, পয়সা আর আধলায় আধ হাঁড়ি হবে।

আমি অবাক হয়ে মাধবের মুখের দিকে চাইলুম। সে তার সেই পাণ্ডুর মুখে একটু হাসি ছড়িয়ে বললে, "অনটনের সংসার, কিছু বাধা তো সম্ভবই নয়, এটা না রাখলে নয়—তাই যখন যা পেরেছি চোখ-কান বুজে ঐতে ফেলেছি, ওতে আধলাও পাবেন। ঐ আমার আট-নয় মাসের সঞ্চয়। কত হয়েছে তাও জানি না, আমার চাই অন্তত কুড়িটি টাকা।"

আমি গুনতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলুম। শেষ হ'লে বললুম, "প্রায় তেইশ টাকা হয়েছে।"

উত্তেজিত আগ্রহে "প্রায় তেইশ টাকা হয়েছে!" বলবার সঙ্গে সঙ্গে কি যে একটা আনন্দপ্রবাহ তার চোখে-মুখে তরঙ্গিত হয়ে গেল, তা প্রকাশ করা যায় না। তার পরেই সে চোখ বুজলে,—দুটি চোখের বাইরের কোণ দিয়ে দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ল।

তারপর শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল ক'রে বললে, "পায়ের ধুলোর পরেই এই হাড়িটির ভার দেবার জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। ঐ যা আছে, ওরই মধ্যে দীনেশের এন্ট্রেন্স দেবার ফী আর পরীক্ষার ক'দিন তার কলকেতায় থাকবার ব্যবস্থাদি আপনাকে ক'রে দিতে হবে। কম পড়ে তো আপনাকে আর কি বলব দাদাবাবু,—আমার আর তো কিছু নেই!"

আমার কথা সরছিল না, চেষ্টা ক'রে বললুম, "কম তো পড়বেই না ভাই, বরং কিছু বাঁচবে। কিন্তু আমি বলি কি, পরীক্ষার এখনও দু'মাস বিলম্ব আছে, সম্প্রতি—"

মাধব কাতরভাবে বাধা দিয়ে বললে, "না দাদাবাবু, ও আজ্ঞে করবেন না। আমাদের বাক্স-প্যাঁটরা, লোহার সিন্দুক—সবই ওই হাঁড়ি। যে টানাটানির সংসার, আজই এক সময় সব হাঁড়িকুঁড়ি ওটকাবে। আজ আট-নয় মাস সংসারকে বঞ্চিত ক'রে অনেক চেষ্টায় ওই যা হয়েছে, ও থেকে ওষুধে ডাক্তারে দিলে—আমি তো মরবই দাদাবাবু, কিন্তু বড় অশান্তিতে ছটফট ক'রে মরব।"

"না মাধব, ও আমি নিয়ে যাচ্ছি ভাই, তোমার ইচ্ছামতই খরচ হবে।"

"আঃ, ও সম্বন্ধে আমি এখন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হলুম। ও কাজটি আপনার মত আর কে পারত! আপনাকে দেবতা ব'লে জানি, আর একটি কথা যদি

দয়া ক'রে ব'লে দেন, আমি বল পাই, সম্পূর্ণ শান্তিতে মরতে পারি। আমি মুখ্‌খু গয়লা। এ জন্মে কিছু দেখাশোনার সুযোগ হ'ল না। ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারনা শোনাই রইল, কি ক'রে সকলে ত্বেলা ত্মুঠো খেতে পাবে এই ধান্ধায় শয্যা-ত্যাগ শয্যা-গ্রহণ পর্যন্ত চিন্তা আর পরিশ্রমে জীবনটা কেটেছে। শ্রান্ত শরীর শয্যায পড়লেই রাতটা নিদ্রায় কেটে যেত। তোমার সংসারে তুমি আমাকে চাকর রেখেছ, তোমার ইচ্ছামত তুমি আমাকে চালিয়ে নিও, শক্তি দিও। অপরাধ থেকে রক্ষা ক'রো।—এইরূপ একটা মূর্খের মন-গড়া প্রার্থনা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম। আজ যাত্রা-শেষে তাঁর সংসার তাঁর হাতে দেবার সময় মনটা এক-একবার ন'ড়ে উঠছে, ত্বর্বল হযে পড়ছে, কষ্ট দিচ্ছে। হাঁ দাদাবাবু, দাদাবাবু, চাকর থাকলে, মনিব একটু নিশ্চিন্ত থাকেন। সে গেলে তিনি নিজে না দেখে কি থাকতে পারেন? সব তো তাঁর। চাকরের দেখার চেয়ে ঢের বেশি দেখবেন। তিনি তো শুধু মালিক নন— তিনি অনাথনাথ, নয় কি দাদাবাবু?"

তার পরই ম্লান হাসির সঙ্গে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "ভেবে আর কি করব?

মনটা দ'মে তো গিছলই—বুঝলুম, মাধব মস্ত একটা অশান্তি ভোগ করছে। প্রাণটাও বেদনা-চঞ্চল হয়ে উঠল। জোর ক'রে বললুম, "যে আজীবন সত্যকে ধ'রে চলেছে, তিনি নিজে তাকে ধ'রে থাকেন, তার ধারণা কখনও মিথ্যা হয় না ভাই। তুমি যা ঠাউরেছ তার চেযে সত্য আর নেই, এই আমার বিশ্বাস। এর বেশি আমি বুঝি না, তোমার ভাবনা আসছে কেন?"

মাধব কেঁদে ফেললে। বললে, "বড় অপরাধ হয়ে গেছে দাদাবাবু! আমার মাথা ঠিক থাকছে না, সেই আমাকে ডোবাচ্ছিল। আর নয়, আর হবে না।"—ব'লেই সে তার শীর্ণ হাত ত্বটি একত্র ক'রে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজলে। ত্বই চক্ষে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিন মিনিট শ্বাস নেই। আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম।

সেই একটি নমস্কারে বোধ হয় সে সর্বস্ব সমর্পণ শেষ করলে, আর একটা ঝড়ের মত নিশ্বাসে বাইরের সব-কিছু হটিয়ে দিলে, তারপর 'আঃ'—ব'লে চোখ খুলে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললে, "এইবার মন খুলে পায়ের ধুলোটা দিয়ে যান, আপিসের বেলা হ'ল।"

সে কি প্রফুল্ল মুখ! চোখের সামনে যেন পদ্মের বিকাশ দেখলুম। আমি

কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। মিনিট দুই কেটে গেল। সে-ই কথা কইলে, "কাল রবিবার, না,—পারেন তো এদের একবার—" এই পর্যন্ত ব'লেই হাসি মুখে বললে, "ছিঃ, অভ্যাস কি ম'লেও যাবে না দাদাবাবু? তা আপনাদের হাত দিয়েই তো তাঁর দেখা দেখি।"

বললুম, "মাধব, এসব তুমি কি বকছ, তোমার এমন কি হয়েছে? সে তো একদিন সকলেরই আছে, তোমার তো ভাই ন বিঘে ধান-জমি রয়েছে, ভাতের ভাবনা নেই—।" আমার কথা অসমাপ্ত রইল।

"সে আর নেই দাদাবাবু।"—ব'লে আমার মুখের ওপর চেয়ে একটু জোরে হাসতে গিয়ে তার কাশি এল, ঘুরে ওপাশ ফিরলে, কি খানিকটে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। বিছানাতেই ফরসা ন্যাকড়া ছিল, তাতে মুখ মুছে, সেটা চাপা দিলে।

একটু আগে দীনেশ ওষুধ খাওয়াতে আসে, মাধব তাকে বলেছিল, "বাবা, ওষুধ আর আমাকে দিস নি, গঙ্গাজল দিলেই বেশি উপকার হবে। সে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে বলে, "আচ্ছা, দাও। আর দেখো বাবা বাড়িতে খোঁজটা নাও, চাটুজ্জে মশাইয়ের ছেলের দুধটা গেছে কি না! খোকার দুধটা যেন সকাল সকাল যায়, ভুল না হয়।"

ভাবলুম, ওষুধটা উঠে গেল, আমি ব'সে রয়েছি, তাই কু-দৃশ্যটা চাপা দিলে।

একটু পরে বললুম, "সে আর নেই কি রকম?

"সেই জমিটে?"

দেখি, মাধব চোখ বুজে সামলাচ্ছে, সেই অবস্থাতেই বললে, "পরে শুনবেন দাদাবাবু।"

বুঝলুম, সে কষ্ট বোধ করছে, এখন তাকে প্রশ্ন করাটা ভাল হয় নি। মনে মনে অপ্রতিভ হয়ে বললুম, "আমি এখন চললুম মাধব, তুমি একটু স্থির হয়ে শোও ভাই, বড় বেশি কথা কওয়ানো হয়েছে, কাজটা ভাল হয় নি। আমি সন্ধ্যার সময়, না হয় কাল সক্কালেই আসব 'খন।"

মাধব ক্ষীণ স্বরে বললে, "সে যা হয় করবেন, এখন তো পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিয়ে যান, আমি যে নিতে পারছি না দাদাবাবু!"

তার ওই শেষের কাতর কথা কয়টি আমার হৃদয়ে যেন আসন্ন বিপদের ছায়ার মত এসে পড়ল। এতক্ষণ আমি তার কথাগুলির মধ্যে অবসাদ-মাখা

নৈরাশ্যের সান্ধ্য-সুর পেয়ে ব্যথা বোধই করছিলুম তার পশ্চাতে যে বিদায়ের আয়োজন বিপুল হয়ে উঠেছে, সেটা একবারও মনে উদয় হয় নি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইলুম। সে চোখ বুজেই বললে, "কই দাদাবাবু ?"

আমি যন্ত্রের মত "এই যে ভাই" ব'লে, ভগবানকে স্মরণ ক'রে, তাড়াতাড়ি তার মাথায় পায়ের ধুলো দিলুম। আমার রুদ্ধ শ্বাসটা পড়ল সে বোধ করি জানতে পারলে, তার মুখে একটু হাসির আভাস দেখলুম. কিন্তু আর সে কথা কইলে না। আমারও কিছু যোগাল না। ব্যথাভরা বুকে ধীরে ধীরে দাওয়ায় পা দিতেই বিপদশঙ্কিতা কম্পিতহৃদয়া সমগ্র বিশ্বের মূর্তিমতী দীনতার মত মলিনাঞ্চলখানি গলায় দিয়ে গৌরীর মা আমার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে প্রায় লুটিয়েই পড়ল, দেহ তার হতাশ-শিথিল হয়ে গেছে।

৪

রাস্তায় হরিবিহারীর সঙ্গে দেখা।

হরিবিহারী আমাদের সহপাঠি ছিল। সেও মাধবের জাত, কোন হয় দূরসম্পর্কও আছে। তারা দু-তিন পুরুষ জমিদার, তাই গ্রামের সকলের সঙ্গে তাদের মেলামেশা সহজভাবেই চলে। হরিবিহারীর স্বভাব বরাবরই নিরীহ আর পরোপকারপরায়ণ।

"হাতে হাঁড়ি যে, বিদেয় নাকি ?" ব'লে সে হাসলে।

আমার হাসবার মত মনের অবস্থা ছিল না, বললুম "বিদেয় বটে, মাধব দিলে।"

"মাধবকে দেখতে গিছলে নাকি ? কেমন দেখলে, সে আছে কেমন ?"

"অসুখ তো বটেই, কিন্তু তার অতটা হতাশ হবার মত কিছু তো দেখলুম না। তবে বোধ হ'ল যেন তার ভেতরে কি একটা কঠিন অসুখ আছে, যার ব্যথা তার মর্মে পৌঁছে গেছে, তার উদ্যম উৎসাহ, আশা ভরসা একেবারে মুছে দিয়েছে।"

"তোমাকে কিছু বললে ?"

"না।"

"তুমি কিছু শোন নি?"

"না।"

"সে অনেক কথা। তার পরিবার কামিনী আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে, আমার সঙ্গে কথা কয়; সে-ই আমাকে ডেকে পাঠায়, তা না তো তার অসুখের খবরও পেতুম না। যাক, গুপী দত্তকে চেন তো—যিনি আজ তিন বছর হ'ল আমাদের গ্রামে এসে বাস করছেন? ওঁর জন্ম কেটেছে জমিদারী সেরেস্তায়। সেরেস্তার একটি দক্ষ দানব। মজিলপুর মজিয়ে, আমাদের গ্রামে এসে নতুন ক'রে গজিয়ে উঠছেন। এই তিন বছরের মধ্যেই মামলা-মকদ্দমা শতকরা ঘাটে পৌঁছে দেছেন। আমাদের সাত-আটজন প্রজার সতেরো বিঘে ধান-জমি সাফ উড়িয়ে নেছেন। তারা নাকি টাকা ধার নিছল। তারা বলে, ওঁকে চিনিই না! আমাদের সেরেস্তার রামহরি সরকার বলে, এখনও ওঁর পরিচয় পান নি, সবুর করুন। ঐ দত্তটি ব্রজপুরের বাবুদের স্বত্ব-কত্ব রেখে আসেন নি। জালে অমন সিদ্ধহস্ত কাল কলিতে জন্মায় নি। কোথাও আবির্ভাবের এক সপ্তাহ মধ্যে উনি লোক চেনাটা সেরে ফেলেন। দেখেন উনি দুটি জিনিস, কারা ভাল মানুষ, তাদের উনি কোন একটি স্বনামখ্যাত পশু ব'লেই জানেন। আর দেখেন, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের কে কে খুব কষ্টে দিনপাত করছে: তাদের উনি সহানুভূতি দেখিয়ে আপনার জন ক'রে নেন, কখনও কিছু সাহায্যও করেন। অর্থাৎ মুঠোর মধ্যে করেন। তাবাই ওঁর কার্যাদির সাফাই গান, সাক্ষী হন, অপরের সাক্ষী দিইয়ে তাঁদের কিছু কিছু পাইয়েও দেন।"

"সকালে গুপী দত্তের কথা কেন?"

"বলছি। মাধবকে আর মারলে কে? আজ দশ দিনের কথা, মাধব একখানা রেজেস্ট্রি-করা চিঠি পায়। খুলে দেখে, গুপী দত্তর উকিল উমেশবাবু লিখেছেন, আমার মক্কেল শ্রীযুক্ত গুপীনাথ দত্তের নিকট তুমি হ্যাণ্ডনোটে যে ৩৫০৲ দু বছর সাত মাস পূর্বে কর্জ নিয়েছিলে, সে টাকা মায় সুদ, যেন আজ হইতে সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। নচেৎ আজ হইতে এক সপ্তাহ অন্তে তোমার নামে আদালতে নালিশ রুজু করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে আমার মক্কেল বাধ্য হইবে। ইত্যাদি—

"মাধব ভেবেছিলো, চিঠিখানা ভুলক্রমে তার কাছে এসেছে, এ মাধব আর কেউ হবে। দু দিন আগে তার জ্বর হয়েছিল। জরুরী জিনিস ভেবে সেই

রাতেই জ্বর-গায়ে সে উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে বলে, এ পত্রখানা বোধ হয় ভুলে তার কাছে গিয়ে পড়েছে, তাই সে দিতে এসেছে। গুপীবাবুকে সে একবার মাত্র দেখেছে, তখন সে তাঁর নামও জানত না। তিনি তার লক্ষ্মী ব'লে যে গাইটি সাড়ে ছ সের দুধ দেয়, সেইটি কিছু দিয়ে নিতে চান। তাতে সে হাত জোড় ক'রে বলে, 'আমি অতি গরিব গয়লা, ঐটির কৃপায় কোন প্রকারে চ'লে যায়, আমাকে ক্ষমা করুন বাবু।'

"তিনি তাতে 'বেশ বেশ, লক্ষ্মীকে রাখাই তো পুরুষার্থ হে!' এই ব'লে চ'লে যান। আমি ভদ্রলোকের কথা রাখতে না পেরে আর তাঁর কথার ভাব বুঝতে না পেরে, মনটায় বড় অস্বস্তি বোধ করেছিলুম। তারপর তাঁর সঙ্গে আর কখনও কথা হয়নি,—দূরে দূরেই তাঁকে দেখেছি।

"উমেশ উকিল মাধবকে জানতেন, তিনি বলেন, 'তুমি দেখছি আর সে মাধব নেই! তোমার সঙ্গে গুপীনাথ দত্ত মশাইয়ের যদি আর দেখাই না হয়ে থাকে তো তোমার এই হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁকে দিয়েছিল কে, আর টাকাটাই বা তুমি কার হাত থেকে নিয়েছিলে?' এই ব'লে তিনি মাধবের হ্যাণ্ডনোটখানা দেরাজ থেকে বার ক'রে মাধবকে দেখতে দিয়ে বললেন, 'এ লেখা কার, সইটে কার?'

"মাধব সাগ্রহে দেখতে গিয়ে সহসা যেন ধাক্কা খায়। সাক্ষী রূপে ভগবতী চাটুজ্জে মশাই সই করেছেন দেখে চমকে ওঠে। তার মুখের বর্ণটা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উমেশবাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নীচু ক'রে থাকে। উমেশবাবু বলেন, 'এখন কি বল? এ হ্যাণ্ডনোট কি তোমার নয়?' মাধব কাতরতা-মিশ্রিত বিনীত কণ্ঠে বলে, 'না বলবার তো জো নেই উকিলবাবু।'

'তবে কি এ হ্যাণ্ডনোট তোমার নয়?'

"'নয় তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কথা তো আপনিও বিশ্বাস করতে পারবেন না উকিলবাবু।'

"'এইবার তিনি সুর বদলে বললেন, 'এ কুবুদ্ধি তোমায় কে দিলে? ওসব ফন্দি ছাড়, বিপদে পড়বে, বুঝলে?'

"'যে আজ্ঞে, ছাড়লুম।'

"'হ্যাঁ, আদালতে ও-সব টেঁকে না, বুঝলে? ধর্মের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। তা যদি হ'ত তো ধর্ম এতদিন ধুতবাষ্ট্র হয়ে যেত। তোমার মত অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে আর করেও, তাতে বাধা দিয়ে ধর্মকে রক্ষা

করবার তরেই আদালত আছে, আর আমরা আছি, বুঝলে ?'

"মাধবের ও-সব কোন কথাতেই কান ছিল না। উমেশবাবু ব'লে চললেন, 'তুমি গ্রামের লোক, ভাল লোক ব'লেও জানতুম। কারুর কুপরামর্শে পড়েছ দেখছি। যাক, টাকা যোগাড় করতে যদি না পার তো যা বলি তাই করগে, সুবিধে হ'লেও হতে পারে। গুপীবাবু মহাশয় লোক, তাঁর কাছে গিয়ে দুখ্খু জানালেই কাজ হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিছু ধান-জমি আছে না ?'

"'আজ্ঞে ন বিঘে।'

"তাতে তো অর্ধেকও হয় না হে। আচ্ছা, যাও দিকি একবার, তিনি তেমন লোক নন, হাতে-পায়ে ধরলে—, বুঝলে ? যাও, গ্রামের লোক তুমি—না হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে আমিও উপস্থিত হচ্ছি, দেখি, সুদটো যাতে—,বুঝলে ? যাও। হরে গয়লা বেটা নিছক খাঁটি জল খাওয়াচ্ছে হে। মোটা হচ্ছি কি ড্রপ্সি দাঁড়াল, বুঝতে পারছি না তোমাদের জাতের উপকার করাই ভুল, তবে শুনেছি, তুমি ভাল লোক, দেখি। আচ্ছা, আগে গুপীবাবুর কাছে যাও তো, সংসারে নিজের কাজ আগে, শুভস্য শীঘ্রং, বুঝলে ?'

"মাধব অতিষ্ঠ হয়ে শুনছিল, জ্বরটাও যাতনা দিচ্ছিল, সে প্রণাম ক'রে টলতে টলতে বেরিয়ে বাঁচে।"

* * * *

হরিবিহারী ব'লে চলল···

"আমাদের বাল্যবন্ধু রাম রায় উমেশ উকিলের ক্লাক ( ? ) কিনা, সে তখন উপস্থিত ছিল। জানই তো, সে নকুলে লোক, আমাকে 'শোন শোন, বিদুর-দুর্যোধন সংবাদটা শুনে যাও' ব'লে ডেকে সমস্ত কথাবার্তা যেমন যেমন হয়েছিল, অভিনয়ের মত ক'রে শুনিয়ে শেষ বললে, 'মাধবের ও ন বিঘে তো গেছেই, আবার সুদের বদলে দুধ চাই, ওর লক্ষ্মী ব'লে গরুটাও গিলবে। আমার হাতে ভাই অনেক কাগজ আসে, কিন্তু অঙ্কের লেখার এমন নিখুঁত নমুনো কখনও নজরে পড়ে নি। তায় গুপীর দৌলতে উকিলবাবুর এখন যথেষ্ট 'রূপী' আসছে, দুজনে হরিহরাত্মা। কোন উপায়ই তো দেখি না ভাই।'

"যাক, রাম রায় যা যা বলেছিল, ঠিক তার কথাগুলিই তোমাকে বলেছি। বাদ গেছে কেবল তার ভাবভঙ্গী আর কণ্ঠস্বর।"

বললাম, "মাধব উমেশবাবুর পরামর্শমত গুপী রত্তর কাছে গিয়েছিল ?"

"তুমি কি মাধবের প্রকৃতি জান না? সে এই কদর্য প্রস্তাব শুনে, অত বড় মিথ্যাটা মাথা পেতে নিতে যেতে পারে? তার চেয়ে সে মরণটাই বরণ ক'রে নিলে দেখছি।"—এই ব'লে হরিবিহারী উদাসভাবে একটা নিশ্বাস ফেললে।

বললে, "জ্বর নিয়ে বেরিয়েছিল রাত আটটা আন্দাজ। যখন উমেশবাবুর বাড়ি থেকে ফেরে, তখন জ্বর অনেক বেড়ে গেছে। চৌধুরীপাড়া পেরুতে পারে নি, পোলটার উপর শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যের আগে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, সব ভিজে ছিল, জ'লো হাওয়াও দিচ্ছিল। রাত হওয়ায় দীনেশকে ব'লে পাঠনোয় সে খুঁজতে যায়। যখন বাড়ি আনলে, তখন বারোটা বেজে গেছে। মাধবের ভাল সংজ্ঞা ছিল না, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, কথার মধ্যে 'না না, চাটুজ্জে মশাই তা হতেই পারে না', কখনও 'ব্রাহ্মণ—অত বড পবিত্র বংশ', কখনও 'আহা, বড় কষ্টেই প'ড়ে থাকবেন'; কখনও বা 'বডঅভাবেই ক'রে থাকবেন'; কখনও 'তাতে কি হয়েছে, ব্রাহ্মণ দেবতা—অভাব যে বুঝি গো, সেই তো মানুষকে ভুল করায়'; 'কানেনী, খববদার, ছেলের দুধ না বন্ধ হয়, সকাল সকাল পাঠিয়ে দিও। ওটা অভাবেতে করিয়েছে, অভাবেতে। ওঁর দোষ নেই। উনি করতেই পারেন না, ব্রাহ্মণ যে!' সারারাত এইসব অসংলগ্ন কথাই বার বার কয়েছিল। সকালে ঘুমিয়ে পড়ে, জ্বর ক'মে যায়।

"সাত দিনের দিন ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'ডবল-নিউমোনিয়া' কাল থেকে রক্তও দেখা দিয়েছে

শুনে চমকে উঠলুম, প্রাণটা অবলম্বনে খুঁজে পেলে না, হায় হায় ক'রে উঠল। বুঝলুম, সে 'কু-দৃশ্য' চাপা দেয় নি; আমি না বেদনা-বিচলিত হই, তাই কালের জরুরী ডাকের রক্ত-লিপিখানা ঢাকা দিয়েছিল।

বললুম, "হরিবিহারী, তুমি ভাই মাধবের কাছ থেকে আর ন'ড়ো না, আমি এলে তোমার ছুটি। আমার দুর্ভাগ্য, এমন একটা কাজ ফেলে এসেছি, আমাকে আপিসে যেতেই হবে ভাই। তা ছাড়া চাবিও আমার হাতে। তুমি গিয়েই মহেন্দ্র ডাক্তার মশাইকে আনতে দীনেশকে পাঠিয়ে দেবে, রাজকুমারবাবুরও থাকা চাই। খরচ সব আমার।"

"বেশ, তাই হবে। কেবল ব'লে যাও, হাঁড়িটাতে কি?"

বললুম। শুনে ম্লান-হাসির সঙ্গে একটা নিশ্বাস ফেলে সে বললে, "জান, ওর জন্যে সে কি কাণ্ড করেছে! কাপড় কপি কাড়াইশুটি আঁব পান ইলিসমাছ এ-সব থেকে ও-বাড়ি আজ প্রায় এক বৎসর বঞ্চিত। গয়লার

বাড়ির ছেলে-মেয়েরা দুধ খায় নি, ওই দিনেশ ছেলেটির এণ্ট্রেন্স দেবার খরচ সঞ্চয়ের জন্যে, ওর লক্ষ্মীদিদির দুঃখ দূর হবার আশায়।"

পাঁচ দিন আগেও জানতে পেলুম না! অসহায় বালকের মত হাত-পা আছড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বললুম, "হরিবহাদ, আর শোনাস নি ভাই, মাধব যাতে বাঁচে তাই কর্। মহেন্দ্র ডাক্তার যা বলবেন, ঠিক তাই করা চাই, খরচ যতই হোক। আমার ফিরতে সন্ধ্যে—"

তখন কটিং-পানামার চলন ক'মে গেছে। আমাদের গঙ্গা পার হয়ে, বালা থেকে ট্রেনে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। মেঘনাদ-মাঝি আমাদের পারাপার করে। খালের একটা ঘাটে আমরা উঠতুম নাবতুম। ট্রেনের টাইম বুঝে দুবেলাই নৌকো ছাড়া হ'ত, এমন দু তিন বার। আমরা ছিলুম মাসিক বন্দোবস্তের যাত্রী, অপর কারুর কাজ পড়লে, তাঁরাও আসতেন যেতেন, মানা ছিল না। কোন কোন দিন বাধা ব্যবস্থার বাবুরা তাতে বিরক্ত হতেন, বিশেষ ক'রে আপিস যাবার সময়, বেশি বোঝাই হ'লে পাছে বেলা হয়, ট্রেন মিস হয়। মেঘনাদ তখন হাত জোড় ক'রে ধীরে ধীরে বলত, কোথায় এখন ঘুরে বেড়াবেন, ব পড়বেন, কাজের ক্ষেতি হয়ে যাবে, আসতে দিন বাবু, আমি খেটে পৌঁছে দেব 'খন। পয়সার লোভে নয়, পয়সা সে কারুর কাছেই চাইতে পারত না, আসল কথা সে কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পারত না, না বলতে পারত না।

মেঘনাদ জাতে মালা হ'লেও মালাদের মত তার ধোনখানটাই ছিল না। তার স্বভাব-চরিত্র কথাবার্তা ব্যবহার-বিনয় লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হ'তে হত। কোন নেশাই তার ছিল না। গভীর রাত্রে বা যে কোন সময়ে তাকে ডাকলে সে বিরক্ত হ'ত না, পার ক'রে দিত। কখনও বলত না, কি দেবেন? ফল কথা সেই নিরক্ষর মালার মধ্যে যে সব সদ্‌গুণ লক্ষ্য করেছি, শিক্ষিত ভদ্রের মধ্যে তা বিরল। তাই সে সম্বন্ধে মেঘনাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখবার আমার একটা ভারি কৌতূহল ছিল, এতটা বৈশিষ্ট্য তাতে কোথা হতে এল, নিশ্চয়ই সে কোন

শক্তিমান গুরু পেয়ে থাকবে। কিন্তু কথাটা পাড়বার আর আমার সুযোগ ঘটত না, ইচ্ছাটাই থেকে যেত।

আজ শনিবার, আপিস থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে কিছু বেদানা, আঙুর আর আপেল নিয়ে, সাড়ে চারটের ট্রেন ধরলুম। মহেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই আশা নিয়ে গেছেন, এতক্ষণ তাঁর ওষুধ বোধ হয় তিন দাগ প'ড়ে গেছে।

খালধারে পৌঁছে দেখি, মেঘনাদ নৌকা নিয়ে হাজির আছে। আমার আগেই কে দুজন নৌকায় উঠে বাইরে গলুয়ের দিকে বসেছে।

নৌকায় পা দিয়েই চমকে গেলুম।

ভগবতী চাটুজ্জে মশাই বললেন, "এই যে নির্মল! ভাল আছ বাবা, বাড়ির সব ভাল ?"

সেই চিরপরিচিত সদ্বংশসুলভ সরল আন্তরিক সহজ সুর। কেবল চক্ষু দুটি বোধ হ'ল কলুষনত। ঘৃণা আমার ভেতর থেকে ঠেলিয়ে উঠেছিল, সেটা মুখে-চোখে পৌঁছবার পূর্বেই, 'আজ্ঞে ভালই আছি। বাড়ির সব ভাল ? ভেতরে এসে বসুন না' বলতে বলতে হালের দিকে নৌকার ছইয়ের উপরে গিয়ে বসলুম।

"না, এইখানেই আমরা বেশ আছি বাবা, দেরি তো হবেই, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিতে পারব।"

আমার শনিবার-সোমবার ছিল না, স-ছটার ট্রেনেই আসতুম। মেঘনাদের দিকে চাইতে সে বললে, "আজ পাঁচটা বিশ মিনিটের গাড়িতেই বাবুরা সব আসেন, সেইটাই শনিবারের বড় গাড়ি। ভেঁটেল ঠেলে গিয়ে, সময়ে এসে জুটতে পারব কি ? তাড়া আছে কি বাবু ?"

বাবুদের মেজাজ আমার জানা ছিল, পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে হ'লে মেঘনাদকে অনেক কথা শুনতে হবে। সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্ত ক্ষুধিত বাড়িমুখো বাঙালীর মেজাজ ঠিক রাখার আশা করাও অন্যায়। বললুম, "তাড়া তো খুবই ছিল মেঘনাদ, কিন্তু উপায় কি, থাক্।"

মেঘনাদ বড় কুণ্ঠায় প'ড়ে বললে, "বলেন তো—"

বললুম, "না থাক্ মেঘনাদ, বিশ-পঁচিশ জনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে।"

মেঘনাদ ভারি কিন্তু হয়ে বললে, "একখানা নৌকা দেখব কি বাবু ?" আমি তাকে শান্ত করবার জন্যে বললুম, "না, মেঘনাদ, আমি ওই গাড়িতেই যাব। অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব-করব ক'রে করা হয় নি, আজ এই ফাঁকে সেইটাই শুনি।"

মাধবই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। হঠাৎ মেঘনাদের মধ্যে তার ছায়া যেন দেখতে পেলুম। তাই কথাটা মনে প'ড়ে গেল। ভালই হ'ল, তা না হ'লে মেঘনাদ সারাক্ষণটা ক্ষুণ্ণ মনেই ছটফট করত।

গুপী দত্ত চাটুজ্জে মশায়ের গা ঠেলে, ঠোঁট উলটে, ভুরু তুলে বিদ্রূপের হাসি ফলিয়ে বললেন, "আজকালের উদারতা! চুলোয় যাক, আটটার পরই উমেশ আসবে, আজ তো তোমার পেটের চিন্তা নেই, ঠোঙা-পোরা খাবার, আর—এই দুটো রাখ।" এই ব'লে চাটুজ্জে মশাইয়ের হাতে কি দিয়ে বগল থেকে নথিপত্রের বাণ্ডিল বার ক'রে, চাটুজ্জে মশাইকে কি সব বোঝাতে লাগলেন। সেটা আর শোনা গেল না।

বেশ বোধ হ'ল, চাটুজ্জে মশাই অনিচ্ছায় একটু ঝুঁকলেন মাত্র, কান আমার দিকেই রইল।

তিনি আমার কাছ থেকে হাত চার-পাঁচ তফাতে ছিলেন। মেঘনাদের কাছে আমি যা শুনতে চেয়েছিলুম সেটা নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়ে থাকবে।

দু-চার বার ইতস্তত ক'রে মেঘনাদ সশাস্ত্র বিনয়ে বললে, "সে শুনলে আপনি হাসবেন বাবু, বিশ্বাস করবেন না।"

বললুম, "তুমি মিছে কথা কইবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে মেঘনাদ, তা না তো শুনতে চাইতুম না।"

"তবে শুনুন, সে অনেক দিনের কথা বাবু, তখন আমার বয়স পনরো-ষোল, এখন দু কুড়ি চোদ্দ চলছে। ঐ বয়সেই আমি লম্বা-চওড়া জোয়ান হয়ে পড়েছিলুম। মালাপাড়ায় কেউ আমার সঙ্গে পারত না, সবাই ভয় করত। সাঁতার কেটে দুবেলা ও-পারে গাঁজা খেতে যেতুম, ছোটলোকের আরও যে-সব আয়েব তা ধরতে আরম্ভ করেছিল। এ-পারে ও-পারে সঙ্গীও জুটেছিল তেমনই। এমন সময় আমার কলেরা হ'ল। মধু ডাক্তার মশাই দেখলেন, বাঁচাতে পারলেন না। সন্ধ্যে থেকে ঘরের মধ্যে বড় বড় অচেনা চেহারা আর কুকুর দেখতে লাগলুম। ভয়ে আর কথা কইতে পারলুম না। তাদের একজন বললে, 'নটা হয়েছে, আর নয়, এইবার চলে আয়।' আমাকে যেন জাদু করলে,—না বলতে পারলুম না, কেবল বললুম, 'কি ক'রে যাব?' আর একজন ধমকে বললে, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, হাঁ ক'রে চ'লে আয়।' হাঁ করতেই দেখি, আমি বাইরে, দেহটা মাদুরে প'ড়ে। মা-বোনেরা চীৎকার

ক'রে কাঁদছে, পাড়ার সবাই ছুটে আসছে, কেউ বললে—অসুর-পাত হয়ে গেল, অতবড় জোয়ান আর দেখব না। দূরে কেউ কেউ বলাবলি করছে - যে বাড় বেড়েছিল, ও কি থাকে!

"আমি তখনও আমার ঘরে আর বাড়ির চারিদিকে ঘুরছি, দেহটাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। কোথায় যাব? ঐ তো আমার ঘর। দেহ ছেড়ে থাকব কোথায়? এমন সময় তারা ধমকে বললে, 'আয় আমাদের সঙ্গে। তোর থাকবার জায়গায় চল্।' একজন বললে, 'এখানেও আসতে পাবি, এখন যায়।' এই বলতেই কুকুরগুলো এগুল, তার পরই তাদের সঙ্গে আমরাও শূন্যে চললুম। খানিকক্ষণ কিছুই বুঝলুম না। তার পর সে যে কি, তা বোঝাতে পারব না বাবু,—ভিজে ভিজে কালো স্যাঁৎসেঁতে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। তা থেকে আবার কোয়াশার মত ধোঁ উঠছে,—দম আটকে যেতে লাগল। লক্ষ লক্ষ দুঃখী অসহায় স্ত্রীপুরুষের হাহাকার এক-সঙ্গে কানে ঢুকে মাথা বোঁ-বোঁ করতে লাগল। ছটফট করতে লাগলুম। একজন বললে, 'দু ধার বেশ ক'রে দেখতে দেখতে চল্।' কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না, ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করতে গিয়ে শিউরে উঠলুম,— ওরে বাপ রে, এ কি! আমাদের দু ধারে মিসমিসে কালো, দইয়ের মত ঘন নদী চলেছে, কি দুর্গন্ধ! তাতে সব মানুষ! মাছের মত গিসগিস করছে! কেউ ভাসছে, কেউ এক কোমর, কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ ডুব দিচ্ছে; কেউ কিনারায়। স্থান নেই। তাদেরই চীৎকারে যেন হাজারটা পাটের কল চলছে। তাদের অবস্থা আর কষ্টের কথা বলতে পারব না বাবু, মাপ করবেন। পাঁচ ছয়জন চেনা লোকও দেখলুম,—উঃ, ও-পাড়ার দাদাঠাকুরের কান্না দেখে কেঁদে উঠেছিলুম। তিনি চিনতে পেরে বললেন, 'মেঘা এলি নাকি! আহা! এই পথ দিয়ে, আহা! তা তোদের এতটা নয় বাবা, আমি যে ব্রাহ্মণ ছিলুম! আমার কোনটারই মাপ নেই। এই দু বছর তো এসেছি। কি করেছিলুম জানিস তো সব। চৌধুরী মশাই দেশান্তরী হলেন, তারই ফল। একটু এগিয়ে—কেও দেখতে পাবি। অন্তরে আঘাত, উঃ! তোকে এখন ব'লে আর লাভ কি?' তার পরই তাঁর—, না বাবু, তা মুখে আনতে পারব না, উঃ, কি কষ্ট, কি ভোগ! আর—" এই বলে মেঘনাদ তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মাপ চাইলে। "বললেন, 'আরও ছ মাস, তার পর আবার ফিরতে হবে।'

"আমি আর দেখতে পারলুম না বাবু। সঙ্গীরা বিদ্রূপ ক'রে বললে, 'তুই এর চেয়েও বড় জায়গা পাবি।' তারা মজা দেখে আনন্দ পায়। তারাও আগে ভুগেছে কিনা, এখন এই কাজ নিয়েছে, যেমন জেলের কয়েদীরা কেউ কেউ খালাস পেলে জেলেই কাজ করে, জমাদার হয়। তারাই বেশি নিষ্ঠুর হয়, কষ্ট দেয়।

"সবই কষ্টের কথা, মন্দ কথা, সে কি আর শুনবেন! আরও ঢের আছে, ঢের রকম; সে-সব আপনার শুনে কাজ নেই। আপনার সামনে বলতে পারব না। বিশ্বাস করেন তো শুনেই হৃদকম্প হবে। সরল-বিশ্বাসীদের সংসার ছেড়ে যায়, সে এমনই বাবু। কেবল যাতনা, কেবল কষ্ট; আর সকলেই নিজের নিজের অপরাধ নতুন লোক পেলেই চীৎকার ক'রে বলে।

"রকম-রকমের পাচ থাক্ পেরিয়ে বাড়িঘর দেখা দিলে,—ইঁট-চুনের নয়, কিসের তা তখন ঠাওরায় কে! প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের ফটক, তার দুদিকে [illegible] দুটো মোষ বাঁধা, দুই চূড়োয় দুটো কাগ, তার মধ্যে আমাকে ঢোকালে। দুধারে বাড়ি, অনেকটা গিয়ে সামনের বড় বাড়ির ঘণ্টায় তারা ঘা দিলে। শব্দে প্রাণ চমকে উঠল, কাঁপতে লাগলুম। তারা হেসে বললে, 'আর [illegible], পোঁছে গেছিস তো, এইবার আরাম পাবি।'

"দেখি, দুজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, আমাদের চেয়ে দেখতে কিছু বড়—একজন কালো, দেখলে ভয় হয়, একজন গৌরবর্ণ, বেশ ঠাণ্ডা মূর্তি। কালো লোকটি আমার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কাঁপতে কাঁপতে বলতেই তিনি 'এ কি করলি' ব'লে সঙ্গীদের এমন ধমক দিলে যে, তার ধাক্কায় আমি প'ড়ে গেলুম। 'এ তো পে—র ছেলে নয়! কখন বেরিয়েছে?'

'নটা রাতে।'

'শীগগির নে যা, এখন বারোটা বাজে, দেহ থাকলে হয়—'

"ঠাণ্ডা মূর্তিটি বললেন, 'সোজা দেব-পথে যাবি, তা না তো সময়ে পৌঁছুতে পারবি নি, লোকটির অদেষ্ট ভাল—এই জানোয়ারদের দোষে, আসুক ফিরে। জান্ নিয়ে খেলা!'

"তারা কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'ওরই সঙ্কট অবস্থা ছিল, তাই—'

"আবার সেই ধমক। তেষ্টায় আমার সব শুকিয়ে গিছল। ভাল লোকটির দিকে চেয়ে একটু জলের প্রার্থনা করলুম। তিনি কালোটির দিকে চাইলেন। সঙ্গীদের ওপর হুকুম হ'ল, 'দক্ষিণ খাড়ি।'

"তারা আমাকে নিয়ে ছুটল, ফটক পার হবার পরই 'শিগগির জল খেয়ে নে' ব'লে একটা খাড়ি দেখিয়ে দিলে। আমি ফিরে এসে বললুম, ও যে আর-কিসের মত—'

"'তোর আর ওর বেশি পাবার নেই;—তেষ্টা নেই বল্। এখানে থাকলে ওই তো খেতে হবে।' আমার দেহটা কেঁপে উঠল। 'ওই তো পাবি। সেদিনও আসবে, চল এখন—'

* * *

"তার পর কি সুন্দর পথ, কি উজ্জ্বল ঠাণ্ডা আলো, সেখানে রাত নেই। কি বাতাস, কি সুগন্ধ, দুধারে কি ফুল ফল, কি সব পাখি, কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব লোক। দুধারে যাকে দেখি, সবার মুখেই হাসি আর আনন্দ, চিন্তার দাগ একটাও নেই। তাঁরা চাইলেই মনে হয়, যেন মা-বাপের চাউনি, ভাই-বোনের চাউনি। যেন ভালবাসা আর স্নেহ উপচে পড়ছে। কি নদীই দেখলুম। দুধারে চন্দনের গাছ, হাওয়ায় যেন চন্দন মাখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে! জলে কেউ স্নান করছেন, কূলে কত স্তবপাঠ চলছে, পদ্মের বন, হাঁসের খেলা, পাখির গান, সে কি আমি ব'লে উঠতে পারি, আপনারা দেখলে বলতে পারতেন। আমার সে তেষ্টা, জ্বালা, ভয় সব জুড়িয়ে গেল। একটা কেমন আরামে আনন্দে আমার সবটা যেন নতুন হয়ে গেল। আর ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না, কিন্তু থাকতে দেবে কে? বললে, 'তোর বড় ভাগ্যি, দু-দিক দেখে যাচ্ছিস।'

"সেই আলো পার হতেই আমাকে এক ধাক্কায় এনে ফেললে। তখন আমাদের উঠোনে লাশ নে-যাবার জন্যে সব তোয়ের। চালি বাঁধা হয়ে গেছে, লোকেরা কোমর বেঁধে হাজির; কেবল মার জন্যে দেরি হচ্ছিল, তিনি আমার ওপর প'ড়ে চীৎকার করছিলেন, ছাড়ছিলেন না। আমি ঘরে ঢুকতেই তারা বললে, 'নে, শীগগির দেহের মধ্যে ঢুকে পড়্।'

"কোত্থেকে আমারও তখন দেহের মোহ এসে গেল, বললুম, 'কি ক'রে ঢুকি?' একজন বললে, 'মুখ দে ঢুকে পড়্, মুখ বন্ধ থাকে তো কান দে।' আমি মুখ দে ঢুকে প'ড়েই 'মা' ব'লে ডাকলুম।

"তার পর যা হয়, সকলে ঘরে ঢুকল, কেউ ভয় পেলে। কথা কইলুম, তবু তাদের বিশ্বাস হতে আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ইন্দির, ভুলু, গোপাল, প্রেমচাঁদ—এই সব বড় বড় মোড়ল-মালারা মত দেওয়ায় তবে আমার বাঁচা

ঠিক হয়, বাবু। এত সহজে হ'ত না, যদি না আধ ঘণ্টা পরেই প্রেমচাঁদের বাড়ি জোর-কান্না উঠত; পঞ্চায়েৎ সেই দিকেই সব ছুটল। গিয়ে দেখে, প্রেমচাঁদের ছেলে মদ খেয়ে এসে দাওয়ায় শুয়ে ছিল, হঠাৎ বুকে ব্যথা ধ'রে সেইমাত্র ম'ল, তার নামও ছিল মেঘনাদ।"

চাটুজ্জে মশাই অসীম বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, অ্যাঁ, সেই রাত্রেই!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তখুনি।"

গুপী দত্ত রুষ্ট হয়ে, তাড়নাস্বরে চাটুজ্জে মশাইকে ব'লে উঠল, "আমি কি তোমার চাকর যে সেই পর্যন্ত ব'কে যাচ্ছি, আর তুমি শুনছ মালার মুখে ঐ গাঁজাখুরি গল্প!"

একে তো গুপী দত্তের ওপর ঘৃণায় রাগে আমাকে আগে থেকেই বিষাক্ত ক'রে রেখেছিল, তাই মেঘনাদের উপর তার ঐরূপ ইতর ইঙ্গিতে আমাকে জ্বালিয়ে দিলে। মেঘনাদ সেটা বুঝতে পেরে আমার পা দুটো চেপে ধ'রে নিম্নস্বরে বললে, "আমাকে মাপ করুন বাবু, উনি আমার নৌকোয় এসেছেন।"

আমি তার কথাটা বুঝে আর তার কাতর ভাব দেখে, অতি কষ্টে সামলে উঠেই বললুম, "হ্যা, তার পর?'

"তার পর সেরে উঠলুম। কিন্তু আগের মেঘনাদ আর রইল না। যেন বোবা হয়ে গেলুম। মা অনেক ক'রে চারটি খাওয়াতেন। ঘাটের ওপরেই ঘর, ঘাটেই ব'সে দিন-রাত কাটত, রাতে নৌকোতেও প'ড়ে থাকতুম। সকলে তামাসা ক'রে 'জড়ভরত' বলতে শুরু করেছিল।

"যাবার সময় যা দেখেছিলুম, তা তো আর আপনাকে সব টিয়ে বলতে পারি নি, সেই সব চোখের সামনে থাকত, আর কি বাবু কথা কইতে পারি, না, কাজ কর্ম করতে পারি! ভয় হ'ত, যদি মিথ্যে বেরিয়ে যায়, কি কারুর প্রাণে বাজে! তিন কোশের মধ্যে সংকীর্তন কি 'কথা' হচ্ছে শুনতে পেলেই যেতুম। লুকিয়ে গুরু করলুম, কণ্ঠি নিলুম। তখন সকলে জোর ক'রে বে দিলে। এত পায়ে ধরলুম, কত কাঁদলুম কেউ শুনলে না। তার পর সংসার ঘাড়ে পড়ল। তখন থেকে আপনাদের কাজ নিয়ে, আপনাদের আর মা গঙ্গার চরণে প'ড়ে আছি। যতটুকু পারি, করতে চেষ্টা পাই। ভগবানকে কেবল জানাই, কারুর প্রাণে যেন আঘাত না দিয়ে ফেলি। ওইটিই সর্বনেশে জিনিস, বাবু!

"আমি মুখ্খু ছোটলোক, কিছুই জানি না, আপনাদের চরণে থাকার জন্যে

এত কথা কইতে পারলুম। সব সত্যি ব'লে জানবেন বাবু, এই চোখে দেখা। তার পর কি আর বাবু লোক মন্দ কাজ করতে পারে! কিন্তু পারলুম কই, কত হয়ে যাচ্ছে, হবে।" এই ব'লে মেঘনাদ বিমর্ষ মুখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। পরে বললে, "আহা, দাওয়ানজী-বাড়ির সেই বুড়ো ঠাকুরদা মশাইকে মনে পড়ে তো বাবু, এখানেও যেমন সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, সেখানেও তেমনই দেখলুম। সেই নদীর ধারে একটা কাঞ্চন গাছের তলায় স্ত্রী পুরুষে ব'সে জপ করছেন, এক গাছ ফুলের নীচে যেন দেবদেবী দেখলুম, সেই হাসি। বললেন—"

আর বলা হ'ল না, এই সময়ে পেরো-বাবুরা সব এসে গেলেন। মেঘনাদ নৌকা খুললে, খাল পেরিয়ে গঙ্গায় পড়তেই বড়বাজারের 'গোল গঞ্জা'র ঠোঙাটা টেনে নিয়ে গুপী দত্ত এক মুঠো মুখে ফেলে দিয়ে ঠোঙাটা এগিয়ে ধ'রে চাটুজ্জে মশাইকে বললে, "খাও না।" তিনি অন্যমনস্কে বললেন "হুঁ।"

"হুঁ কি? আমি ধ'রে থাকব নাকি? নাও, ধর।" এই ব'লে আর এক মুঠো তুলে গালে দিয়ে, ঠোঙাটা চাটুজ্জে মশাইয়ের শিথিল-হস্তে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিতেই তিনি ধরতে না ধরতেই সেটা গঙ্গার জলে প'ড়ে গেল। দু-তিনজন "আহা, আহা" ক'রে উঠতেই, দত্ত ব'লে উঠল "অদেষ্টে থাকলে তো।" ভেতর থেকে কে একজন বললেন, "তা বটে, প্রসাদটা—"

মেঘনাদ অবস্থাটা বুঝতে পেরে আর শেষটা ভেবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, দু তিনটে জোর ঝিঁকি মেরে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে দিলে।

চাটুজ্জে মশাই বহুক্ষণ থেকেই অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁর মন বোধ হয় মেঘনাদের সেই কাহিনীর মধ্যে ঘুরছিল। ও-সব কথায় তাঁর কানই ছিল না। নৌকা জোরে ডাঙায় লাগতে তাঁর হুঁশ হ'ল।

দত্ত "এস" বলায় তিনি বললেন, "আমার একটু দেরি আছে।"

"আটটার মধ্যে কিন্তু আসা চাই, উমেশ আমার চাকর নয়, ব'সে থাকবে না।" ব'লে দত্ত এগিয়ে পড়ল। চাটুজ্জে মশাই বিমর্ষভাবে কেবল বললেন, "দেখি।"

ঘাটে ওঠবার সময় দত্ত আপনা-আপনি বলতে বলতে চলল, "টাকা দুটো আগে দিয়ে কি কু-কাজই করেছি, সঙ্গদোষে আমারও বামুনে-বুদ্ধি দাঁড়াচ্ছে দেখছি!"

সকলে চ'লে গেল। আমি শেষে ছিলুম, ঝপ ক'রে একটা শব্দ হওয়ায় ফিরে দেখি, চাটুজ্জে মশাই জামা, চটি, চাদর সব সুদ্ধ গঙ্গায় ডুব দিলেন। এক

ধারে দাঁড়ালুম। দেখি, মেঘনাদকে বলছেন, "মেঘনাদ, বাবা এখন আমি ব্রাহ্মণ, মা গঙ্গার কোলে তুমি-আমি দুজনেই, বাবা ঠিক বলিস, নির্মলকে যা বলছিলি তা সব সত্যি কথা ?"

মেঘনাদ হাত জোড় ক'রে বললে, "কমই বলেছি ঠাকুর মশাই, সব কি আমি বলতে পারি, তবে যা বলেছি তা আমার নিজের চোখে দেখা, তার একটুও আমার কাছে মিথ্যে নয়।"

"হয়েছে বাবা।" বলে ওঠবার আগে, ট্যাঁক থেকে টাকা দুটো বার ক'রে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে, আবার হাত গুটিয়ে ঘাটে উঠতে লাগলেন।

ঘাটে একটি অসহায় গরিব রোগী থাকত, তার হাতে টাকা দুটি দিয়ে মুক্ত-পুরুষের মত দ্রুত স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়ি চললেন।

৬

পরে শুনেছি।—*

চাটুজ্জে মশাই শুনেই বেরিয়েছিলেন, রাত্রের কোন উপায় নেই। বাড়ি ঢোকবার আগে সে কথাটা বোধ হয় স্মরণ হওয়ায়, মাথাটা সজোরে নেড়ে ব'লে উঠলেন, "তা হোক, ব্রাহ্মণদের নারায়ণ আছেন, ভিক্ষা আছে, উপবাস আছে, না হয় মৃত্যু তো আছে, তা ব'লে উঃ, নারায়ণ রক্ষা করেছেন।"

দালানে পা দিয়েই দেখেন, কাবা বোশেখ-চাঁপার বৈকালী পাঠিয়েছে। বিবিধ ফলমূল মিষ্টান্ন, দালানে ধরে না। ছেলেটি আনন্দে হাসিমুখে খবর দিতে ছুটে আসছে।

"হা ভগবান, আমি পেটের জন্যে কি করছিলুম।" ব'লেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি হকচকিয়ে বাবার কাপড় টেনে বার বার বলতে লাগল,

* চাটুজ্জে মশাইয়ের বড় বউঠাকরুণ সেকেলে মাটির মানুষ। সংসার ভিন্ন হয়ে গেলেও নিত্য খোঁজ-খবর নিতেন, যতটুকু সম্ভব সাহায্যও করতেন। তিনি জেনেছিলেন, সেদিন রাত্রের কোন ব্যবস্থাই নেই। তাই আঁচল ঢাকা দিয়ে এক সরা মুড়ি ও গোটা ছয়েক নারকোল-নাড়ু নিয়ে আসছিলেন। চাটুজ্জে মশাইকে বাড়ির পথে দেখে, পেছিয়ে গা-ঢাকা হয়ে যান। ছোট দেবরের কাছে লজ্জার কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু দুঃখে দুরবস্থায় সাহায্য হিসাবে কিছু দিতে যাবারও মস্ত বড় একটা সঙ্কোচ আছে। তাই তিনি তাঁর পেছনে পেছনে বাড়ি ঢোকেন, এবং অন্তরালেই ছোট-জার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকেন। পরদিন তিনিই কাঁদতে কাঁদতে এই সব কথা বলেন।

"বাবা, তুমি কেঁদো না, দেখ না তুমি, আমাদের কত খাবার!"

ব্রাহ্মণী অন্যত্রে ব্যস্ত ছিলেন। চাটুজ্জে ছেলেকে কোলে ক'রে ঘরে ঢুকতেই, মাথার কাপড় টেনে ব্রাহ্মণী ব'লে উঠলেন, "ওগো, তুমি এ কি করলে, বামন হ'য়ে দেবতা চিনলে না, মাধবকে মেরে ফেললে! সে যে আমাদের দুখ্ খু দেখে আজ তিন বছর দুবেলা দুধ খাইয়ে মণ্টুকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাছা এ-বেলাও যে দুধ পাঠিয়েছে। নারায়ণ আমার পেরমাই নিযে তাকে রক্ষা কর, আমাদের এমন ক'রে মেরো না ঠাকুর" এই ব'লে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

চাটুজ্জে মশাই সহসা এই আঘাতে কাঠ হয়ে গেলেন। অপরাধীর মত জড়িত-কণ্ঠে বললেন, "মাধবের অসুখ, সে বাঁচবে না! কে বললে, না না—" বলতে বলতে ছেলেকে কোল থেকে নাবিয়ে দিযে "আমি আসছি' ব'লেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

* * *

আমি ঘাট থেকে সোজা মাধবের বাড়ি ছুটেছিলুম. পাড়ায় ঢুকতেই দ্বিধায় বুকটা সহসা বিষম দুলে উঠল। সামনের সব জিনিস, ঘর-বাড়ি গাছ-পালা আকাশ-বাতাস সব যেন থমথমে নিষ্প্রভ, ঠিক গেরোন লাগার অবস্থা। দুটি ছেলে ছুটে এসে বললে, "শীগগির আসুন, হরিবিহারীদা আপনাকে এগিয়ে দেখতে বললেন, মাধবকাকা আপনাকে কেবল খুঁজছেন।"

বাড়ির মধ্যে তখন যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আপসানির হাহাকার উঠছে, সে সব আমার কানে যায় নি; আমি যেন মন্ত্রের মত হযে গেলাম, এক দৌড়ে একেবারে উঠানে উপস্থিত।

সেইখানেই তুলসীতলায় শুযে মাধব তখন প্রাণটা নিবেদন করছে।

হরিবিহারী চেঁচিয়ে বললে, "মাধব, তোমার দাদাবাবু এসেছেন।"

তখনও সে ছিল, বোধ হয় আমার অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে চাইলে। মুখখানা তার হাসি-মাখা হয়ে গেল। মুখের কাছে ব'সে বললুম, "নিশ্চিন্ত হও ভাই, ভগবান তোমার সব ভার আমাদের দিলেন, গৌরীর বে আমার—'

মাধব আমার চোখে চোখ রেখে চ'লে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে "সর সর। মাধব, মাধব, যাস নি বাবা, শুনে যা' বলতে বলতে ভিড় ঠেলে ঝড়ের মত চাটুজ্জে মশাই এসে পড়লেন।

মাধবকে দেখতে পেয়ে, "অ্যাঁ! না, শুনতে হবে বাবা" ব'লেই হাটু-গেড়ে ব'সে তার কানে মুখ দিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, "অভাবে স্বভাব নষ্ট হচ্ছিল

বাবা, নারায়ণ হতে দেন নি। আমি সেই ব্রাহ্মণই আছি। বিশ্বাস কর্ বাবা, আমি ও-কাজ হতে দেব না মাধব, প্রাণ থাকতে না। সংসার দেখার ভার আমার, আমি ভিক্ষা ক'রে পালব, যতদিন থাকব, এই তোর দাওয়ায় এসে প'ড়ে থাকব।" সকলের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল মুখে মাথা নেড়ে বললেন, "শুনেছ! বল হরি, হরি বোল! চল—"

* * * *

পাগলের মত হয়ে গেলেও তিনি তাঁর কথা বরাবর রক্ষা ক'রে গেছেন, আমরা কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করতে পারি নি।

তিনি যা আনতেন, গৌরীর মা কিছু রেখে, বাকি সমস্তই গোপনে তার বাড়ি দিয়ে আসত।

শুনলুম, গুপী দত্ত উমেশ উকিলের কাছে বলেছে, "বেটা বেইমান বামুন, শিন্নিও খেলে ভরাও ডোবালে, এই ছ মাসের মধ্যে খুব কম হবে তো বারো-তেরো টাকা খাইয়েছি হে!"

* * * *

ডিপুটিবাবু নির্বাক হয়ে শুনছিলেন। আমার বলা শেষ হ'লে দু-তিন মিনিট মাটির দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে, রুমালখানা বার ক'রে মুখটা মুছলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, লাঠিগাছটি নিয়ে ধীরে ধীরে অন্যমনস্কের মত বেরিয়ে গেলেন, একটি কথাও কইলেন না। আমারও কোন কথা এল না, আস্তে আস্তে উঠে তামাক সাজতে বসলুম।

সহসা ক্ষেত্তোর নাপিতের গলা শুনতে পেয়ে চেয়ে দেখি, ডিপুটি গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে একাগ্র হয়ে শুনছেন। সে গাইছিল—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব-জমিন রইল প'ড়ে,
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

# ধম্মা

১

কাজলা একলাটি একটি মিটমিটে প্রদীপের সামনে ব'সে পাট কাটছিল আর ঢুলছিল। রাত তখন দেড়টা হবে।

জানালায় খুটখুট ক'রে মৃদু শব্দ হওয়ায় মুখ তুলে বললে, "কে?"

"আমি।"

"ইস, কি ভাগ্যি। আজ যে বড় সকাল সকাল?"

"দোর খোল।"

প্রদীপটা উসকে, হাতে ক'রে দোর খুলতে গেল।

বাড়ি ঢুকেই ধম্মা নিজের হাতে দোরটা বন্ধ করলে। উঠানের চার দিক ঘুরে দেখে বললে, "আলোটা উঁচু ক'রে ধর আমড়াগাছটা দেখে নি।"

তার পর নেবুগাছটার ঝোপের মধ্যে হাতের বর্শাটার দু-চার খোঁচা দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কাজলা মুখ টিপে হেসে বললে, "সর্দ্দার সর্দ্দারিও আছে, ভয়ও আছে।"

"ভয় আবার নেই কার তোর নেই?"

কাজলা জোরে মাথা নেড়ে বললে, "না ভয় নেই, ভাবনা আছে।"

পরে হাসিমুখে বললে, "ভীতু লোকের সঙ্গে থাকলে একটু ভয় বইকি।"

ধম্মা তার মাথার কাপড় টেনে, খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললে, "আরে বাস, সর্দ্দারণী বটে। তা তোর আবার ভাবনাটা কি, এই তো পাট কাটতে শিখেছিস দেখছি।"

"না সর্দ্দার, তামাসা রাখ। তোর দুটি পায়ে পাড়ি, ও-কাজ আর করিস নি। কোন দিন কি ঘটবে, জন্মটা মিছে হয়ে যাবে, আমিও জ্যান্তে ম'রে থাকব।"

"আমি কি করি রে কাজলি। আমাকে যে করায়, এখন নেশায় পেয়ে বসেছে। জন্মটা তো সেই দিনই গেছে, যেদিন গদিতে ডেকে নে গে ভাইটেকে ছটা টাকার জন্তে বুকে বাঁশ ড'লে মারলে। উঃ। তখন তো এমন ছিলুম না, কেবল হাত জোড় করেছিলুম, পায়ে ধরেছিলুম। কি ভুলই করেছিলুম, ম'রে ছিলুম রে।"

ধম্মার কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ফুলে উঠল, রক্ত-চক্ষু ঘুরতে লাগল। কুপিত সিংহের প্রতিচ্ছবি!

কাজলা তাড়াতাড়ি তার চোখে-মুখে ভিজে গামছা চেপে ধরলে।

একটু পরে মুখ সরিয়ে নিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "সেই তো খুন চাপল! তার ভাইকে তারই সামনে মেরে তবে মনে হ'ল, 'আমি আছি।' বাঁশ ডলতে কিন্তু হাত সরল না। তার পরেই তো এখানে চ'লে আসি।"

মুহূর্তকাল নীরব থেকে ধম্মা বললে, "এখন গদির টাকা নদীতে লুটি। ছ টাকার তরে ভাই গেছে, তাই টাকার দানছত্তর খুলেছি—ছড়াই"

এই ব'লে গর্বমিশ্রিত আত্মপ্রসাদের একটা বিকট হাসি হেসে উঠল। পরক্ষণেই ব্যথিত সুরে বললে. "কিন্তু ভাই তো ফিরে পেলুম না।"

দীর্ঘশ্বাস আপনিই ব'য়ে গেল।

কাজলা অবসর বুঝে কেবল বললে, "তবে?"

"ভাবি না তা নয় কাজলি, পারি না ভাই। বলেছি তো, নেশা ধ'রে গেছে, রাত এগারোটা হ'লেই ছটফটানি ধরে, ছুটে বেরুই। আর কি জানিস? দলের লোকেই বা কি বলবে। দিনু, দেবা, রতনা না-মন্দ বলবে।"

"তারা বললে তো ব'য়ে গেল, স্বস্তি তো থাকবে।"

ধম্মা হাসলে, বললে, "তুই মেয়েমানুষ, বুঝবি নি। যে পারে, সে নামটাই রেখে যায়।" দুবার বুকটা চাপড়ে"—" সব তো পুড়ে যায় রে, নামটাই তো সব, সেইটাই থাকে: তোর গুরুঠাকুর বলেন, নামের চেয়ে বড় কিছু নেই।"

"সে তো ভগবানের নাম।"

"সবারই তাই রে, সবারই তাই।"

থানার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল। কাজলা ব্যস্ত হয়ে বললে. "ইস, করছি কি! নে, হাত-মুখ ধো, আমি ভাত বেড়ে আনি।"

* ২ *

কাজলার রূপ ছিল, রঙ ছিল না। চোখ দুটি ছিল করুণা-মাখানো, তুলি দিয়ে টানা। কণ্ঠ ছিল শ্রবণ-মধুর, চুল ছিল কমামান্থ। এলানো অবস্থায় নজরে পড়লে ভদ্রলোকেরও ভুল হ'ত, না চেয়ে কেউ চ'লে যেতে পারত না। তার ব্যবহারে আর সেবায় পাড়ার মেয়েরা মুগ্ধ ছিল। সকলেই তাকে ভালবাসত, চাইত।

ধন্মা ছিল ছেয়ালো বলিষ্ঠ-গঠনের শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, বিনম্র। একশো জোয়ানের মাঝ থেকে তাকে সর্দার ব'লে বেছে নেওয়া শক্ত ছিল না।

প্রকৃতিতে পরিচয় পাওয়া যেত না যে, সে জলদস্যু। দিনে মজুরি করে, ঘর ছায়, বেড়া বাঁধে, মাটি কোপায়, কাঠ চেলায়।

কাজলা সামনে ব'সে খাওয়াচ্ছিল। খাওয়া প্রায় শেষ হ'লে ধন্মা বললে, "কই, তুই খাবি নি ?"

"না।"

"কেন ?"

"এমনই।"

"তবু শুনি ?"

"খিদে নেই, আবার কি ?

"আগে বলিস নি কেন ?"

"বললে কি হ'ত ?'

"খেতুম না।"

ইস্, ভারি যে! তুই খাবি নি কেন, তুই তো আর কারুর খোঁজ রাখতে যাস না।"

ধন্মা অবাক হয়ে চেয়ে রইল, "বুঝলুম না।

"আজ গিয়ে দেখি, কাকীমা তিনপোর-বেলায় মায়ে-ঝিয়ে মুড়ি আর কলমিশাক সিদ্ধ খেতে বসেছে। আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'এ বেশ লাগে রে কাজল, আমরা মাঝে মাঝে খাই।'

"বললুম, 'তা তো দেখতে পাচ্ছি, তুমিও যতখানি খেলে, দিদিমণিও তত খেলে।

"কাকীমা বললেন, 'ওর না-খাওয়াই ভাল, যে রকম বাড়ছে, উপোস করাই উচিত। বাড় আছে, বের উপায় নেই। আমার দিন-রাত সমান করলে।'

"মথুরাদিদি পাতে হাত দে মুখ গুঁজে ব'সে রইল। কাকীমা তাড়াতাড়ি পাথরখানি নিয়ে পুকুরে চ'লে গেল। দেখি, তার চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছে।"

কাজলার গলা ধ'রে এসেছিল, চোখ মুছে বললে, "দিদিমণিকে যে

ডেকে এনে কিছু খাওয়াব, কি কিছু দিয়ে আসব, তার উপায় নেই। আমাদের কোনও জিনিস কাকীমা ছুঁতে দেবে না। মথুরাকে মানুষ করেছি,— এ কি সওয়া যায়, না, দেখা যায়?"

কাজল ঢোঁক গিলে চোখ মুছলে।

ধম্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "কাজলা, কাঁদিস নি, মা-কালী ছাড়া মানুষে কিছু করতে পারবে না। কত উপায়ে কত লোকের দায় ঘোচালুম, ওখানে যে কোনও উপায়ই কাজ করে না কাজলি। এমন শক্ত বামুনের মেয়ে আমি কোথাও দেখি নি। সেদিন বললেন, 'ধম্মদাস, আমাদের এই ভিটেটুক বেচে দে বাবা, তোদের মথুরার বিয়েটা দিয়ে জুড়ুই। আর আমি দেখতে পারছি না, লোকের কথাও শুনতে পারছি না।' বললুম 'তারপর জুড়ুবার জায়গাটা থাকবে কোথায় কাকীমা?'

"হাসতে হাসতে বললেন, যাদের মা-গঙ্গার কোলে বাস, তাদের জুড়োবার জায়গার [illegible] নেই রে, তুই আমার জন্যে ভাবিস নি বাবা। কেবল ওই তো আমার পথের বাধা হয়ে রয়েছে।'

"যে ধম্মা সোঁদরবনেও বাস ক'রে আসে, কত বার বাঘের সঙ্গে সামনা-সামনি হয়েছে, গায়ের একটি রোঁয়া খাড়া হয় নি, কাকীমার কথা শুনে সেই ধম্মা শিউরে উঠেছিল। দুনিয়ার মধ্যে ঐ বামনের মেয়েটিকেই ভয় করি ভাই, ইস্পাতের খাড়া ব'লে মনে হয়। ওর সামনে কথা বেরোয় না।"

কাজলার চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল। সে একদৃষ্টে ধম্মার দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল। বললে, "সাচ্চা মেয়েমানুষও [illegible] নেই, দয়া-ধম্মও তেমনই। কোথাকার একটা কুকুর মরমর হয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে পড়েছিল, তাকে রোজ নিজের ভাতের আদ্দেক খাইয়ে আসতেন। গরমের দিন ছিল, পাঁচবার তাকে জলখাওয়াতে যেতেন—এ আমি চোখে দেখেছি।"

ধম্মা চুপ ক'রে কি ভাবছিল, দু-একটা কথা কানে গিয়েছিল মাত্র। বললে, "ভয় তো খাঁটিকেই, গোখরো সাপের বিষ যে! আচ্ছা, এই পুজোটা বাদ—"

"তার মানে?"

"বিন্দুবাসিনীতলার একশো বছরের পুজো, এবার বুঝি প'ড়ে যায়, চণ্ডীমণ্ডপের চালও গেছে। রায় মশায় 'মা মা করছেন আর ছেলের মত কাঁদছেন, ব্রাহ্মণের কোন উপায় নেই। মার হুকুমটা সেরে—"

"তারপর ?

"তারপব দিদিমণির বিয়ের তরে মাব কাছে ভাল জাতের টাকার উপায় চাইব" ব'লে হাসলে।

"এই কথা।"

"হাঁ, দেখে নিস।"

"যে টাকা কাকীমা ছোঁয় না, তা আর আনবি নি ?"

"তাই তো ভাবছি। টাকারও যে জাত আছে, তা জানতুম না। খ' এইবার।' ধন্মা দাওয়ায় আঁচাতে গেল।

খানিক পবে কাজলা এঁটো নিয়ে, পাথব হাতে ক'বে এসে দেখে, ধন্মা আকাশের দিকে চেয়ে ডান হাত উঁচু ক'রে পাথরেব মূর্তিব মত নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে,—আঁচায় নি।

কাজলাকে দেখে সে চমকে কেঁপে উঠল।

"উঃ, ভয় পেয়েছিলুম রে! দেখলি, মনে মনে ভাল হবাব ইচ্ছেয লড়াই লেগেছিল, তাইতেই এই! ভাল হওয়া মানেই না-মবদ হওয়া বে। ছিঃ। কেবল ভয়ের পূজো করতে, বেঁচে ম'বে থাকা

"তাই নাকি! কাকীমা ?"

ধন্মা আব কথা কইলে না, হাত-মুখ ধুয়ে ধীরে ধীবে ঘবে গিয়ে ঢুকল।

১

শিবানী দেবী ছিলেন চাটুজ্জেদের ছোট বউ। আট মাসের মেযে কোলে ক'রে বিধবা হবার পর সনাতন প্রথা অনুসারে দু বেলা সংসাবেব রাঁধা-বাড়া—যার যেমন ফরমাশ, ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনা, খাওয়ানো-ধোয়ানো প্রভৃতি অবশ্যকর্তব্যরূপে তাঁর ওপরেই চাপে, কারণ কাজ-কর্মে থাকলে শোক-তাপ ভুলে থাকতে পারবেন। একাদশীতেও ব্যবস্থা বদলায় না। কাজ-কর্মে থাকলে উপবাস নাকি গায়ে লাগে না। বিধবাদের শুভকামী বিচক্ষণ লোকদের বহু বিবেচনার—ফল—এই সব বিধি-ব্যবস্থার কোনটি হতে তিনি বঞ্চিত হন নি। সে-বাড়ির মেয়ে-পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তিটা কিছু অসাধারণ ব'লে প্রসিদ্ধও ছিল।

বড়ঠাকুরঝির মাথাঘোরা রোগ, সুতরাং সকালে মিছরির শরবত খান। ছোট বউকে তা ঠিক ক'রে রাখতে হয়।

ছোট বউকে আহ্নিক সেরে নিতে দেখে তিনি বললেন, "দেখ ছোট বউ, ইহকাল তো পুড়েইছে, পরকালটা পোড়ানো কেন? তুমি এখন কালাশৌচের সর্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ অদ্বিতীয়) অধিকারী, এখন এক বছর তোমার ওসবে অধিকারই নেই, পাপ আর বাড়িও না।"

শিবানী পূজো পাঠ বন্ধ ক'রে কালাশৌচের বাধামুক্ত হাঁড়ি আর অপোগণ্ড পালনের অধিকারও স্বীকার করলেন, সবই মুখ বুজে।

মুশকিল হ'ল, সকলকে খাইয়ে শেষে নিজের প্রায়ই কিছু থাকে না। সেদিন একগাল মুড়ি, না হয় একটু গুড় আর জল। অনাহারে আনাহারে স্তন-দুগ্ধ শুকিয়ে গেল। মেয়েটা কারও কোল তো পায়ই না, দাওয়ায় প'ড়ে খিদেয় চেঁচায়,—কেউ চেয়েও দেখে না, তোলেও না, কারণ বাপ-খেগো অলুক্ষুণে মেয়ে আপদ। সবাই ধমকায় আর থামাতে বলে। বলে, 'প্রাতঃবাক্যে বাড়িতে আরও তো ছেলে-মেয়ে রয়েছে, কারুর অমন বাক্ষুসে গলা শুনেছ? শুনলে বুক কেঁপে ওঠে গো! আবার কাকে খাবে—' ইত্যাদি।

*　　*　　*　　*

কাজলার আসা-যাওয়া সব বাড়িতেই, এ বাড়িতেও ছিল। নিকট প্রতিবেশী, কান্না কানে যায় আর ছটফট ক'রে ছুটে আসে। ছোট কাকীমার অবস্থা চোখে দেখে সবই বোঝে। ভাবে জ্যান্ত-মানুষ কি ক'রে মুখ বুজে এত সয়? মেয়েটা গেলে ওঁর আর থাকবে কে? ও তো গেল ব'লে।

বুকটা কেমন ক'রে ওঠে,—তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে আনে।

এটা বাড়ির কেউ চায় না, কারুর ভালও লাগে না, কিন্তু কাজলা ধম্মার বউ।

কাজেই ঠাকুরঝি হেসে বলেন, "ভাগ্যিস তুই ছিলি, ও-মেয়ের গায়ে কারুর হাত দেবার জো নেই, ককিয়েই আছে, কিছুতে বাগ মানে না,—বংশ-ছাড়া! মেয়েটাকে দেখা, তাও উনি পারেন না। কে বলবে বল?" ইত্যাদি।

শিবানী শোনে, পাথরের শোনা।

তখনও বাপ-মা বেঁচে। গরিব হ'লেও মানুষ তো! এই সাংঘাতিক

আঘাতের পর মেয়েকে একবার নিয়ে যাবার জন্যে তাঁরা অনেক লেখালেখি, অনুনয়-বিনয় করলেন। এ অবস্থায় অভাগীরা স্বভাবতই বাপ-মা খোঁজে। জগতের আলো তো তার নিবেই গেছে।

জবাব পান—"যাবার কোন দরকার দেখছি না, ছোট বউ ভালই আছেন, তাঁর কোনরূপ চিন্তা-চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই, একটুও অধীর হন নি। মেয়েকে যদি দেখতে ইচ্ছা হয়, এসে দেখে যেতে পারেন।" ইত্যাদি।

তাঁরা যেন মেয়ের নিরাভরণ ঐশ্বর্যটা দেখবার জন্যে লালায়িত হয়ে প্রস্তাবটা করেছিলেন!

দিন যায়, মাস কাটে। বুদ্ধিমানেরা ভগবানকেও ভাবিয়ে তোলেন, ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি উপায় খুঁজে পান না।

শেষে শিবানীর শরীরে বসন্ত দেখা দিলে। এতদিনে 'মার অনুগ্রহ' ব'লে কথাটা বুঝি সার্থক হয়!

কিন্তু শুনতে হ'ল, "সকল রকমে জ্বালালে গা! এখন এ আপদ ফেলি কোথায়। বাপ-মার দরদ যে বড়! নিয়ে যাক না! ছোট-লোক মিন্‌সে, খবরটা পর্যন্ত নেয় না।"

পাশের দু কাঠা জমিতে জঙ্গলের মাঝে দুখানা চালা ছিল। একখানাতে গরু-বাছুর থাকত, একখানায় কেওড়া কাঠের তক্তাপোশ-পাতা ছেলেদের পড়বার ঘর। কেউ এলে সেইখানেই বসে।

অমন ঘরখানা ওঁর কপালেই নাচছিল।

ছোঁয়াচে রোগ,- গরু-বাছুর বাড়ির লক্ষ্মী, মা ভগবতী। পাশের ঘরে রাখতে ভরসা হ'ল না,—দুধ দিচ্ছেন, সবাই খায়।

বড়ঠাকুরঝির আবার মূর্ছাগত বাই, ছোটঠাকুরঝির ওপর-হাত তো কড়ির আনলা,—হাত-পোরা মাদুলি, ও-রুগীর ঘরে তাঁর ঢোকবার জো নেই, মাদুলি মাটি হয়ে যাবে,—নিষেধ আছে। বউয়েরা সব সন্তানসম্ভবা।

এ সবই 'মার অনুগ্রহ'।

শিবানী অনেক দিন পরে আরামের নিশ্বাস ফেলে ছেঁড়া মাদুরে এসে শুলেন। এক কলসী গঙ্গাজল আর একটা কানা-ভাঙা পেতলের ঘটিও পেলেন।

পাড়ার মুখ্‌খু সধবা বিধবারা থাকতে পারলেন না, তাঁরা এসে দেখতে শুনতে লাগলেন।

সব বাহাদুরি।

কাজলা মেয়েটিকে নিজের ঘরে নিয়ে রাখলে।

"এদ্দিন সব ছিলেন কোথায়? এদ্দিন করেছিল কারা? করতে পারেন নি?"

ছোট বউ কিন্তু সেরে উঠলেন।

"বাঁচা কেবল জ্বালাতে! গেলে জ্বালাবে কে?"

* * *

জগতে অনেক ঘটনা ঘটে, যা ভাল হ'লেও ভোগায়।

ছোট বাবু দেবসুন্দর সওদাগরী আপিসে কাজ করতেন। সে আপিসে দশ বছর চাকরি ক'রে ম'লে স্ত্রীকে কিছু মাসোহারা দেওয়ার নিয়ম ছিল।

শিবানীর নামে মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে আসত, অবশ্য শিবানী সে কথা জানতেন না।

কেন, তা ভগবানই জানেন, সে মাসে আপিসের লোক এসে শিবানীর সই নিয়ে টাকা তাঁর হাতেই দিয়ে যায়, আর মাসে মাসে দিয়ে যাবে ব'লে যায়।

স্বামীর টাকা বিধবার যে কি বস্তু, বিশেষ এ অবস্থায় এ ভাবে পাওয়া, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কেবল সেই দিন তাঁর চোখ ফেটে জল গড়াতে পাঁচজনে দেখেছিল। চোখ বন্দ, টাকা কয়টি মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বাধেন। সারাদিন দোরে খিল দে প'ড়ে ছিলেন।

বুঝি দুঃখ উপভোগ!

বৈকালে বড়ঠাকুরঝি দুখানা পুরানো থালা, কয়েকটা ঘটিবাটি এনে দাওয়ায় রেখে ব'লে গেলেন, "এই তোমার ভাগের বাসন কোসন নাও। তুমি যাই কর না, ভাইয়েরা আমার শিবতুল্য, একটা ঘড়াও দিতে বলেছে। মঙ্গলার খোল ভিজছে, এর পর দিয়ে যাব 'খন। যা হোক, ভাল কীর্তি রাখলি ছোটকি!" সবটা কানে এল না, প্রাণে অবশ্য এল।

ছোট বউ নির্বাক। বিধবা হওয়া ছাড়া আবার কি নূতন অপরাধ হ'ল!

ছোট বউ বিবাহিত জীবনের শুভ প্রারম্ভ থেকেই বুঝেছিলেন, সত্যটা বললেই 'সত্য' সম্মান পায় না, সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, বক্তাও রেহাই পায় না। তাই নীরবতা বরণ ক'রে নিয়েছিলেন; তারই দৃঢ়তাটা 'তেজ' আখ্যা পেয়েছিল।

তিনি নীরবেই নির্বাসন নিলেন। উপায় কি? বহু দুশ্চিন্তার মধ্যে তাতে একটুও যেন স্বস্তির স্বাদ ছিল না, এবং এটাও যে মার অনুগ্রহ নয় এমন কথা বলা কঠিন।

তারপর দুঃখ কষ্ট নির্যাতনের মধ্যে তাঁর এক যুগ কেটে গেছে, সহিষ্ণুতা আর দৃঢ়তা মাত্র সম্বলে।

ইতিমধ্যে তিনি সেবায় শুশ্রূষায় অনেকেরই, বিশেষত ইতর সাধারণের মা হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু মথুরা তেরো উত্তীর্ণ হয়, তার বিবাহের চিন্তা সম্প্রতি তাঁকে অহরহ বিঁধতে আরম্ভ করেছে।—"ভগবান লজ্জা রাখ, তোমার মুখ চেয়েই প'ড়ে আছি।"

পরমাত্মীয়েরা প্রচার ক'রে রেখেছেন, "দেবসুন্দর তো উপরি কম পেত না, সে সব টাকা গেল কোথায়? শোন কেন, সব আছে—সব আছে। কোথায় আছে, তাও আমরা জানি। তেজ আর কিসের।"

কাজলার কাকীমার পরিচয় সংক্ষেপত এই।

৩

এ কয় দিন ধম্মা দিন-রাত খাটছে। সকালে তাড়াতাড়ি নারকোল আর মুড়িগুড় খেয়ে গ্রামের পূজা-বাড়িগুলি ঘুরে আসে। যেখানে যা কাজ থাকে সত্বর কিছু কিছু সেরে ও-পাড়ার রায়দের বাড়ি গিয়ে দম নেয়। সেখানকার খাটুনির সব কাজই তার। তাঁরা নিতান্ত গরিব, লোক-বলও নেই। শেষ চৌধুরী-বাড়ি ছোটে, এঁরা জমিদার, পূজাও খুব ঘটার, লোকেরও অভাব নেই। তবু যায়, শরীর আর কিসের জন্য, শক্তিই বা কেন, যদি মায়ের সেবায় না লাগে!

আজ তাঁদের সতেরোটা নারকোল-গাছে উঠে দেড়শো নারকোল পেড়ে, বুক ছ'ড়ে এসেছে।

বাড়ি ফিরেই বললে, "কাজলি, এক কোষ তেল দে দিকি, নারকোল পাড়তে উঠে বুকটা বড় ছ'ড়ে গেছে, জলছে।"

কাজলা তাড়াতাড়ি তেল এনে নিজেই বুকে মালিশ ক'রে দিতে দিতে বললে, "কই, নারকোল-গাছে উঠতে তো কখনও দেখি নি।"

"দরকার পড়লে শক্তটা আর কি, পুরুষ-মানুষ সব পারে।"

"আজ আর কাজে যাওয়া হবে না কিন্তু, নেয়ে খেয়ে ঘুমো।"

"মথুরাদিদির কাপড় চাই না? আজ গেলেই আমার বারো টাকার কাজ পুরো হবে। শরীর আমার ভালই আছে।"

মথুরার কাপড়ের কথায় কাজলা আনন্দে সব ভুলে গেল, বললে, "সে কাপড়ের এমন ছিরি, মথুরা পরলে ঠিক মা-লক্ষ্মীটির মত দেখাবে। জোলা মিন্‌সে কাল নিয়ে আসবে বলেছে।"

"টাকাটা বলাইদার কাছ থেকে তুই এনে রাখিস তবে। কাকীমাকে জানিয়ে যাস, তিনি না সোবে করেন।"

"সে ভয় নেই, কাকীমা ও-ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখে এসেছেন, তুই বলাইদার কাঠের টালে কাঠ চেলাচ্ছিস। আমাকে হেসে বললেন, 'ছেলের আবার এ কি শখ চাপল!'– সব শুনে, জলে তাঁর চোখ টলটল করতে লাগল। বললেন, 'গেল পুজোর কাপড় মথুরাকে আমি পরতে দিই নি, সে ঠাকুর দেখতে পর্যন্ত যায় নি, তাতে কি আমার ছেলেকে কম কষ্ট দিয়েছি, তাই না বাছার এই খাটুনি!'

"কাকীমার চোখ দে টসটস ক'রে জল পড়ল। মুছলেও কমে না। বললেন, 'আমিও তাতে কম কষ্ট পাই নি মা, সেই পর্যন্ত ছেলের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারি না।'"

"আর শোনাস নি, কাজলি" ধম্মা মুখ ফিরিয়ে ঢোক গিললে, "তাঁর দোষ কি, কিন্তু কত বড় ঘা মেরে মানুষ আমাকে এমন বানিয়েছে তা যে ভুলতে পারি না! ছ টাকায় ভাই বেচেই না –" বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল।

"যা হবার ছিল হয়ে গেছে।" এই ব'লেই কাজলার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—"এখন ভাই তো দেখছিস।"

সিংহকে যেন সজোরে খোঁচা দেওয়া হ'ল,—ধম্মার মাথায় আগুন লেগে গেল। সে গর্জে উঠল, "কি বললি! খবরদার! ফের শুনলে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। ভদ্দোরলোকের কথা ভদ্দোরলোকে বুঝবে, সে কি আমার ভদ্দোরলোকের ভাই ছিল।"

সে গর্জন কাকীমার চালায় পৌঁছে প্রতিধ্বনি তুলেছিল, তিনি রাঁধতে রাঁধতে ছুটে এলেন।

"কি রে কাজলি, ছেলেকে কি বলেছিস?'

কাজলা অপরাধির মত জড়সড় হয়ে গিয়েছিল. কথা যে কোথায় গিয়ে কতটা আঘাত করতে পারে, সে অতশত ভাবে নি।

সে কেঁদে ফেললে, "আমি বুঝতে পারি নি কাকামী, জেনে-শুনে আমি কি

ওকে কষ্ট দিতে পারি? ওর তা বিশ্বাস হয়?"

কাকীমার সামনে ধম্মার এ মূর্তি কোনদিন প্রকাশ পায় নি। সে সেইখানেই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে পড়ল,—রাগ, লজ্জা, ক্ষোভ, বেদনা একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে দুধারের পাঁজরা হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সে কাঁদছে।

কাকীমা দ্রুত গিয়ে তার মাথায় পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, "তুইও আমাকে কাঁদাবি ধম্মদাস!—ছি বাবা, ওঠ্, নেয়ে আয়। দেখ্ দিকি চেয়ে, মেয়ে আমার কতটুকু হয়ে গেছে! ও কি বুঝে বলেছে কিছু?"

কাকীমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন।

অভিমান এসে ভাষা যোগালে—"তুমি নাকি আমার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পার না! তবে আর আমি এখানে প'ড়ে আছি কেন? এখানে আমার কে আছে, কি ঐশ্বয্যি আছে কাকীমা?"

এ আবার কি কথা!

সব তাঁর মনে প'ড়ে গেল। বললেন "কিন্তু আমার ঐশ্বয্যি যে তোরা,—তোরা যে আমার ভগবানের দেওয়া সামগ্রী, আমি কার ভরসায় তেরো বছর কাটালুন ধম্মদাস? পাছে কোন্ দিন কি ঘটে—তোর কিছু দেখতে হয়, তোকে খোয়াতে হয়, তাই না তোর ওপর এমনই পাষাণীর মত কঠিন ব্যবহার ক'রে এসেছি! এই ভাবনা এই তেরো বছর ব'য়ে আসছি! রাতে কারুর সাড়া পেলে, কি একটু শব্দ হ'লে বুকটা ধড়াস্ ক'রে ওঠে, সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায়! আমার সব পূজো-আহ্নিকই মিছে রে ধম্মদাস! তোর সুমতি, তোর মঙ্গলই চেয়ে এসেছি। কেবল তোর পয়সাটি ছুঁই নি,—পুণ্যির জন্যে নয় ধম্মদাস। যদি তাতে তোর মনে লাগে—তুই ও-কাজটি ছাড়িস।

"যে মথুরা তোদেরই, কেবল বিইয়েছিলুম আমি, তোর দেওয়া কাপড় তাকে পরতে দিই নি। এত বড় শক্ত সাজা অতি-বড় শত্তুরেও দিতে পারত না। আমি কিন্তু সেই সাজাই তোকে দিয়েছি, আর নিজে তা নিয়েছি—দিনরাত। মেয়েমানুষ, ও ছাড়া আর আমার উপায়ও ছিল না, ভেবেও কিছু পাই নি।"

সকলে নীরব। সহসা—

"আচ্ছা, পায়ের ধুলো দাও তো মা, গঙ্গাস্নান ক'রে আসি। কাজলি! এসেই ভাত চাই, খিদে লেগেছে।"

যেন সে মানুষ নয়।

কাজলার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই দুজনের চোখেই নির্মল হাস্যের উজ্জ্বল রেখাপাত।

ধম্মা গামছাখানা টেনে নিয়ে নাইতে চ'লে গেল।

"তুমি না এলে আজ কি হ'ত কাকীমা!"

"কি আবার হ'ত! ও তেমন ছেলে নয়। ওকে পাগল ক'রে দিয়েছে। ও কি কিছু করে—ভুলে থাকবার তরে সময় কাটায়। কিছু রেখেছে কি,—কারুর দুঃখ-কষ্ট সইতে পারে কি?"

"এখন ছাড়লে যে বাঁচি, আর যে ভাবতে পারি না!"

"ছেড়েছে।"

"আমার তো বিশ্বাস হয় না মা।"

"তুই দেখিস।"

"তোমার কথা মিথ্যে হয় না, তা জানি"

তারপর হাসতে হাসতে বললে, "তুমি আজ কি করলে বল দিকি কাকীমা। রাঁধতে রাঁধতে এঁটো হাতে এসে সব ছুঁয়ে লেপে এক করলে যে! এখন আবার নাইতে হবে, বিধবা মানুষ—"

"কেন, তাতে কি হয়েছে. ছেলেকে ছুঁলে কি দোষ আছে রে পাগলি! যাদের আছে তাদের আছে, আমার নেই, নাইব কেন?"

"তবে আমিও পায়ের ধুলোটা নিই।"

"তোদের এ আবার কি হ'ল?"

কাজলা তাঁর পায়ে মাথা ঠেকালে।

মথুরার হাঁক কানে এল, "চচ্চড়ি যে ছুঁয়ে পুড়ে আগুন ধ'রে গেল।"

শিবাণী ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কথায় কথায় সামান্য কারণে কি যেন একটা ওলট-পালট ঘ'টে গেল। একটা দমকা ঝাপটায় সকলের মনের সব ময়লা মুহূর্তে উড়িয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ স্বচ্ছতা এনে দিলে।

*　　　*　　　*　　　*

পঞ্চমীর পূজো-মাথানো জ্যোৎস্নাটুকু দেখতে দেখতে ডুবে গেল।

এতক্ষণ মথুরার বিবাহের চিন্তা চলছিল। ধম্মা বললে, "কাকীমার কি একখানি গয়নাও আর নেই?"

"তুই আজ নতুন লোক হ'লি! সে বছর মথুরার যখন বিকার হয়, যাতে একচল্লিশ দিন মেয়ে এই যায় এই যায়—মনে নেই? মতিবাবু বলায় ভাশুর যাতে বলেছিলেন, 'টাকা না বার করেন, গয়না তো আছে!' কাকীমার মাকড়ি, বালা, কণ্ঠমালা বেচেই তো মজুমদারকে দেখানো হয়।"

ধম্মদাস উদাসভাবে বললে, "এদ্দিন যদি কাঠ চেলাতুম, রোজ দু টাকার কাজ করতে পারতুম রে। আচ্ছা, ভাবিস নি, মা আছেন।"

"কাকীমাকে দেখে যে ভাবতে হয়, ইস্পাতে যেন ঘুণ ধরতে শুরু হয়েছে।"

ধম্মা অন্যমনস্কভাবে "হু" আচ্ছা" ব'লেই উঠে দাঁড়াল।

"দোরটায় খিল দিয়ে নে।"

"আবার কি?"

"এমনি একটু ঘুরে আসি।"

"তবে কাকীমাকে মিথ্যেবাদী বানাবি?"

"কেন?"

কাকীমা যে আমাকে বললে, ছেড়েছে, তুই দেখিস?"

"বলেছেন নাকি?"

তারপর হেসে বললে "কাকীমা অন্তর্যামী। আজ অন্য কাজ আছে রে, সে সব নয়। রতনা খবর দিলে, একজন আড়কাটি সেধো সেজে চার পাঁচটি মেয়েকে কালীঘাট দেখাবার ছলে বর্ধমান থেকে এনে বালীর খালের মধ্যে নৌকোয় রেখেছে। আজ রাতে মেটেবুরুজের কুলি-ডিপোয় চালান দেবে, মরিসসে না ডেমেরায় পাঠাবে। একটি বউ কোলের ছেলে ফেলে এসেছে, বড় কাঁদছে। দেখে আসি, তাদের যদি উপায় করতে পারি।—"

মুহূর্ত নীরব থেকে উদাসভাবে বললে, "কাকীমা বলেছেন, সত্যি? ঠিক বলেছেন রে। আচ্ছা—। জ্যোৎস্না ডুবেছে, এইবার তারা বেরুবে, আর আমি দাঁড়াব না।"

নিমেষে বেরিয়ে গেল।

এ অবার কি! কাজলা কথা কবার সময় পেলে না; তার অন্তরটা কেবল 'দুর্গা দুর্গা' ক'রে উঠল।

৬

ভবানী চৌধুরী মশাই গ্রামের জমিদার, সেকালের বাবুদের নমুনার শেষ চিহ্নের মতই ছিলেন। দুধের সঙ্গে আফিম জ্বাল দিয়ে সরখানি খেতেন। দু হাতে তিনটে হীরের আংটি, নধর শরীর, বাবরি চুল, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে গ্রামের বাইরে পা বাড়াতেন না। মাত্র পূজায় পঞ্চমীর দিনটি প্রতি বৎসরই নিজে কলকাতায় যেতেন, কারেন্সিতে নোট ভাঙাতে, আর বস্ত্রাদি কিনতে, পূজার বাজার করতে।

এবারও গিয়েছিলেন।

সুখের শরীর, তার ওপর ঘোরাঘুরিটে অত্যধিক হওয়ায় বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যাও হ'ল—এখনও বাজারের অনেক বাকি, সুতরাং আমলাদের উপর সে সব ভার দিয়ে নৌকোয় ব'সে গঙ্গার হাওয়ায় শ্রান্তিমুক্ত হবার তরে একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে জগন্নাথ-ঘাটে চ'লে আসেন। ব'লে আসেন, "আমি নৌকোয় থাকব, তোমরা সত্বর বাজার সেরে চ'লে এস।"

নিজের সঙ্গে ছিল মাত্র টাকা শ ছয়েকের কাপড়, আতর, গোলাপ, বড়বাজারের সের পাঁচেক রাতাবি সন্দেশ আর নোটে-নগদে খুচরায় হাজার দুই টাকা।

ছিরু-খানসামা সঙ্গে এসে নৌকো ভাড়া ক'রে তাতে জিনিসপত্র তুলে দিয়ে, সুজুনি বিছিয়ে, ফুরসিতে এক ছিলিম তাওয়াদার তামাক সেজে দিয়ে, তাঁকে বিশ্রাম করতে ব'লে চ'লে গেল। চৌধুরী মশাই ব'লে দিলেন, "শিগগির আসবি। ফৌজদুরী বালাখানার সের-দশেক তামাক নিতে যেন ভুল না হয়।"

পিরান খুলে, মুখ-হাত-পা ধুয়ে, গা মুছে স্নিগ্ধ হয়ে, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে চৌধুরী মশাই এ-বেলা কাঁচা আফিমই খেতে বাধ্য হলেন। শরীর শ্রান্ত থাকায় একটু বেশিই খেলেন। পরে খান কতক সন্দেশ মুখে দিয়ে জল খেয়ে চক্ষু বুজে আরামে তামাক টানতে টানতে ক্লান্ত শরীরে সহজেই শয্যা নিলেন। নাসিকাধ্বনি শুনে দাঁড়ি-মাঝিরা মুখ-চাওয়া চাওয়ি ক'রে হাসলে। এক জন এসে তাওয়াদার ছিলিমটি তুলে নিয়ে গিয়ে টানতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

*         *         *

রাত তখন বারোটা। পঞ্চমীর পাতলা জ্যোৎস্নাটুকু ডুবে গেছে। অতবড় কলকাতা শহরের সোরগোল সারাদিনের অসীম চাঞ্চল্যের পর এলিয়ে প'ড়ে একটু ফুরসৎ পেয়ে যেন ঝিমুচ্ছে। কেবল আকাশের তারা আর জাহাজের আলোগুলি এই ফাঁকে নিঃশব্দে গঙ্গাবক্ষে নেবে পড়েছে। তাদের আনন্দস্নান আর মৃদু জলকল্লোল নিশীথিনীর শূন্যবক্ষে নিস্তব্ধতার নিকষে একটা নিবিড় সুর একটানা টেনে চলেছে, যাতে মাধুর্যও আছে, আবার যার একান্ততায় গা-ও ছম ছম করে। তার মাঝে বেসুরো শব্দ কানে এলেই চমকে উঠতে হয়।

আড়কাটির কবল থেকে মেয়েগুলিকে মুক্ত ক'রে, রতনার সঙ্গে আর তিনজন সঙ্গীব মারফৎ তাদের রওনা ক'রে দিয়ে ধম্মা বড়গঙ্গার মুখে একটা বয়ায় ছিপখানা বেঁধে আড়কাটির লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। ছিপখানার জলের রঙ, সহজে কারও চোখে পড়ে না। খাটুনি আজ অতিরিক্ত হয়েছে, জোয়ার এলেই ফিরবে, দক্ষিণে হাওয়াও দিয়েছে।

সহসা নিস্তব্ধ রজনীর বুকখানা চিরে বলির জীবের কণ্ঠনিঃসৃত কাতব ধ্বনির মত কোন্ অসহায়ের একটা হৃদয়ভেদী অন্তিম আবেদন দক্ষিণে হাওয়ায় ভর ক'রে ধম্মাব কানে ঢুকে প্রাণের মধ্যে লুটিয়ে প'ড়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ব'লে উঠল "রশি খোল্।'

হুকুমটা যেন ধর্মরাজের কাছ থেকে এল।

"আওয়াজটা দখিন থেকে এল না? উঃ, চার-চারটে দাঁড় খালি! পুষিয়ে নিতে হবে, প্রাণপণ ভাই। এখনই ব্রহ্মহত্যা হয়ে যাবে, গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

"কেন সর্দ্দার? কে সর্দ্দার?"

"গলাটা যেন চৌধুরী মশাইয়ের, আজ পঞ্চমী না? তাঁকে আজ বেরুতেও দেখেছি। ...সর্বনাশ হয়ে যাবে রে! রাজগঞ্জের দল 'ওর' জলেই ফেলে দেয়। নে জোয়ানরা, দু ঘা মেরে নে ভাই।"

ভেটেল পেয়ে ছিপ ক্ষিপ্ত সর্পের মত ছুটল।

তিন রশি তফাত থেকে ধম্মা সঙ্গীদের হুকুম করলে, "দাঁড় তোল্, সড়কি!"

পরেই "খবরদার"—কথাটা এমন বজ্রনির্ঘোষে তার মুখ থেকে বেরুল, বোধ হ'ল, যেন আকাশেব সব তারাগুলো ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল।

"জয় কালী!"

নিমেষে ছিপও নৌকা স্পর্শ করলে। সঙ্গে সঙ্গে একজনের পায়ে সড়কি গিয়ে লাগল।

সে নৌকোর দাঁড়ি-মাঝিরা তখনও ছইয়ের ভিতর ঢুকেছিল। ঘটনাটা এত ক্ষিপ্রগতিতে ঘ'টে গেল যে, সহসা বহু লোক দেখে বা পুলিসের ছিপ ভেবে তারা ভীত-বিমূঢ়ের মত ঝুপঝাপ ক'রে গঙ্গায় লাফ মারলে।

"মারিস নি, যেতে দে।" ব'লেই ধম্মা নৌকোয় উঠে পড়ল।

"ওরে, চৌধুরী মশাই ই তো, হাত পা বাঁধা, শিগগির একখানা—উঃ, বড় সময়ে মা পৌঁছে দেছেন?"

চৌধুরী মশাই অজ্ঞান অবস্থায়

"নৌকোর গলুই ছিপে বেঁধে ঘুরিয়ে নে। সালকে পর্যন্ত এমনই যাক, ফিরিয়ে নে জোয়ান। মা কালী মুখ রক্ষে করেছেন।"

চৌধুরী মশার মাথায় মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে করতে সংজ্ঞা আসে, চোখ চান না।

বলেন, "সব নে বাবা, আরও পাঁচ হাজার বাড়ি পৌঁছেই দেব। ব্রাহ্মণকে প্রাণে মারিস নি বাবা। [illegible]।

বহু আশ্বাস ও অভয় দেবার পর চৌধুরী মশাই চোখ খোলেন। তবুও মাঝে মাঝে আসন্ন অপঘাত আর মৃত্যুদূতের ছায়া চোখ থেকে মোছে না, কেঁপে ওঠেন। এই ভাবে ঘণ্টা খানেক কাটবার পর ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস আসে কতকটা প্রকৃতিস্থ হন।

ঘাটে তাঁর ছেলে শৈলেন লোকজন নিয়ে চিন্তাকুল চিত্তে অপেক্ষা করছিল। নিজের গ্রাম আর আপন জনদের দেখে তাঁর পূর্ব শক্তি অনেকটা ফিরে এল।

* * *

"এই ধর্মদাসের জন্যে আজ—ব'লেই ছেলের গলা জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন। ধর্মদাসকে বললেন, "দরকার আছে, তাই শুধু এত কাপড়ের গাঁটগুলি আর আমার গুড়গুড়িটা নামিয়ে দে বাবা, আর যা সব তোর রইল তুই আমার জীবনদাতা, কাল একবার দেখা করিস বাবা।

"ও কি বলছেন হুজুর, আমি কি এ গাঁয়ের কেউ নই? আপনাকে যে মা-কালী ফিরিয়ে আনতে দিয়েছেন এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না। কাল কি আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারতুম বাবু' যারা কুঁড়েয় প'ড়ে থাকে, খায় কি না-খায়

কেউ খোঁজ রাখে না, আপনারা তাদের বুঝতে পারবেন না। চলুন, পৌছে দিয়ে আসি।"

চৌধুরী মশাই একটিও কথা কইতে পারলেন না, কেবল বললেন, "চল্ বাবা।

যেতে যেতে চৌধুরী মশাই বললেন, "বাবা, তুই আমার প্রাণ দিয়েছিস—জীবনদাতা, তোকে আমার অদেয় কিছু নেই, এ কথাটি মনে রাখিস। তোকে তোর ইচ্ছামত কিছু না দিলে আমি যে কোন কাজে শান্তি পাব না ধমদাস, না পূজায়, না মাকে ডেকে। অন্তর সাড়া দেবে না, মায়ের নামও গলায় বাধবে।"

"কি চাইব? দুঃখ-কষ্ট আমাদের যে কোন সাধই রাখতে দেয় নি হুজুর। আচ্ছা, এখন মার পূজা তো আগেই সারুন গে, তারপর—"

"কবে দেখতে পাব?"

"দেখলেই দেখতে পাবেন হুজুর! ফি-বছরই তো পূজো-বাড়িতে ধম্মার কাজ—পাত ফেলা আর এঁটো-নেওয়া।"

চৌধুরী মশাই লজ্জায় কথা কইতে পারলেন না, শেষে বললেন, "ধর্মদাস, আমাদের অবস্থাই আমাদের অপরাধে অভ্যস্ত ক'রে রেখেছে।

ধম্মা আর শুনলে না। "বড় কষ্ট গেছে, আরাম করুন গে হুজুর।" বলেই দ্রুত চ'লে গেল।

আজ ত্রয়োদশী। চৌধুরী মশাই ধম্মাকে আটকেছেন। তাকে কিছু নিতেই হবে।

অনেক কথা হ'ল। জীবনে কাকীমার চেয়ে বড় কিছু আর আপনার ব'লে গর্ব করবার তার কাছে ছিল না। যারা শক্তি ধরে, তারা শক্তিরই পূজা করে।

"কাকীমা আমার টাকা ছোঁবেন না, তাঁর মেয়ের বিয়ের উপায় নেই—তবু না। মথুরা কিন্তু তেরো পেরুল। এখন মজুরি ক'রে এ কাজ করতে দু বছর লাগে। তা ছাড়া উপায়ও দেখছি না। তা আমি যদি কিছু না নিলে দুঃখিত হন তো, এই অসহায়ার ওই মেয়েটির বিয়েটা দিয়ে দিন। এটা ওই বাঁচাবাঁচির কথা নয় বাবু, সে মা-কালী জানেন, এটা ভিক্ষে করছি হুজুর।"

একটু নীরব থেকে—"কাকীমা না হেসে ছেলের সঙ্গে কথা কইতেন না, এখন স'রে স'রে থাকেন, পাছে তাঁর মলিন মুখ দেখলে আমার লাগে।" বলতে বলতে ধম্মার গলা ভার হয়ে চোখে জল বেরিয়ে এল।

সব শুনে চৌধুরী মশাই কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে ধম্মার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "তাতে তোকে আমার কি দেওয়া হ'ল, তোর লাভ?"

"সব লাভ কি চোখে দেখা যায় হুজুর? এই যে এত খরচ ক'রে মার পূজো করলেন, আপনার লাভটা কি দেখাতে পারেন হুজুর?—সেই আর কি।"

চৌধুরী মশাই মনে মনে লজ্জিত হলেন, বললেন, "তাই হবে ধর্মদাস।"

"কিন্তু সব ভার আপনাকে নিয়ে এ কাজটি ক'রে দিতে হবে, মেয়েটি যাতে সুখে থাকে। তা হ'লেই আমি লাখ টাকা পাব।"

"আচ্ছা, তাই হবে বাবা। আর এই অঘ্রাণেই যাতে দিতে পারি, তার চেষ্টাও পাব।"

ধম্মা তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় হ'ল।

চৌধুরী মশাইয়ের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল, তিনি উদাস ভাবে বিমর্ষ মুখে ভাবতে লাগলেন, 'জীবনে অনেক কাজই করেছি, তার মধ্যে এমন কাজ একটিও নেই। তাই তো, মেয়েটি যাতে সুখে থাকে, সে কি আমার হাত!' ভাবতে লাগলেন।

* * *

সতেরোই অঘ্রাণ মথুরার বিবাহ হয়ে গেছে। দেখে সকলেই অবাক— পাত্র চৌধুরী মশাইয়ের একমাত্র পুত্র শৈলেন্দ্র।

জমিদার মশাইকে সকলে ধন্য ধন্য করছে। কেবল বড়ঠাকুরঝি বলছেন, "আমার ভাইঝি কুমু থাকতে কি না—" ইত্যাদি। "তা আমাদের বাড়িতেও বর মানাত না—মোটে একটি পাস! ভায়েরা আমার—হুঁ"। বলি নি সেজো বউ, টাকার ছালার ওপর ব'সে আছে। কি চাপা মেয়ে বাবা। কবে মরব কেবল জানি না লো!"

সেজো ভাজঠাকরুণ 'পাসের' কথায় জ্ব'লে যান, বলেন, "ছাইপাঁশ বুদ্ধির চাপেই সব গেলেন, কোথাও যেতে জানেন, না, কথা কইতে জানেন! মেয়েটার যেমন অদেষ্ট। শেষ একটা বাইস্ম্যান জুটবে!"

ভাশুর দুদিন আগে থেকে বাড়ি আসেন নি।

"লাটসাহেবের মেমের নাকি কি কাজ পড়েছে, যা আর কারুর সাধ্যি নেই করে। চাকরি তো আর ছেড়ে দিতে পারেন না। লাট্‌নীর আবার আর কারুর কাজ পছন্দ হয় না।"—ইত্যাদি বড়ঠাকুরঝির উক্তি।

*                    *                    *

ধন্মা একদিন হাসতে হাসতে বললে, "মা-গঙ্গার কোলে জ্বালা জুড়োবার জায়গা খোঁজবার জন্যে আর তাড়াতাড়ি করবে না তো কাকীমা ?"

"র'স্ বাবা। মথুরার একটি ছেলে দেখে যাব না রে ?"

"তা বই কি কাকীমা।" ব'লেই কাজলা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

# মূল্যদান

১

সদর-বাজারে আমরা বিশ ঘর বাঙালী। সবাই চাক্‌রে, তার মধ্যে তরুণ আর যুবা চোদ্দ-পনরোটি।

বিদেশে দুর্গোৎসব করতে হবে, উৎসাহের অবধি নেই। রোজই মীটিং, নানা প্রস্তাব পাস হচ্ছে।

একজন বললেন, "এটা কেবল পূজাই নয়, উৎসব। তার ব্যবস্থা কি?"

কথাটা সাগ্রহে গৃহীত হয়ে গেল। স্থির হ'ল, নবমীতে নাট্যাভিনয় হবে। সেটা করতে হবে নিজেদেরই।

নৃত্যবাবু ছিলেন আমাদের মধ্যে অভিনয়-বিশারদ, স্থানস্থলে প্লে করেছেন। স্টেজ বাঁধা থেকে—সাজানো, স্ট্রোক পেন্টিং, অর্থাৎ ডিপার্টমেণ্টের সব দিকেই ওস্তাদ। পুস্তক নির্বাচন তিনিই করলেন, 'মেঘনাদ-বধ'। নিজে মেঘনাদ।

এই কয়টি লোকের মধ্যে পূজা সামলানো আর রিহার্সেল চালানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। ব্যবস্থামত কাজ এগোয় না। কারণ, ঝোঁকটা শেষে বেশি দাঁড়িয়ে গেল অভিনয়ের ওপর পূজার ব্যবস্থার লোকাভাব।

ম্যানেজার তড়িৎবাবু এক-একবার এসে বিদ্যুৎ হেনে যান সগর্জনে। চ'টে একদম বারুদ। "এই রইল আপনাদের পূজো। পাঁঠাগুলো স্বরাজ পেয়ে জঙ্গলে উধাও, যা ছুটতে পারেন ধ'রে ধ'রে খাবেন। ভেন্‌-ঘরে কেউ নেই, এরই মধ্যে তিন মণ ঘিয়ের তিরিশ সের পাচার, চুলোয় যাকগে।" ইত্যাদি।

তাঁর সময় কম, বয়সও কম। তাই চিত্রাঙ্গদার পার্ট দেওয়া হয়েছে, পাঁচ মিনিট কেঁদেই খালাস।

"পাঁচ মিনিটের জন্যে আগে থেকে গোঁফ ফেলে কি মুখ্যুমিই করেছি! বাইরে কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই, না হ'লে আজই এলাহাবাদ— অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ি।

একজন বললেন, "প্রয়াগে বেমানান হবে না হে।"

বিপিনবাবু বললেন, "বুঝছ না, তড়িৎবাবুর ওটি ধুয়ার ছলনে কান্নার

রিহার্সেল। সময়াভাবে অ্যাটেণ্ড্ করতে পারবেন না, তাই সেরে রাখছেন। দেখে নিও, ওঁর কান্নাতেই দুশো ক্ল্যাপ প'ড়ে যাবে।"

"আমি seriously বলছি, ভিয়েন-ঘরে কেউ না থাকলে ঐ ভেন্‌কর বেটাই সব সাবাড় করবে।"

সবাই নিজের নিজের সাজ-গোজ নিয়ে ব্যস্ত। নীলু প্রমীলা—সিল্কের রুমাল আর সিল্কের মোজার জন্যে শহর তোলপাড় ক'রে বেড়াচ্ছে।

সত্যই চিন্তার কথা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ফাই-ফরমাশ খাটছে—তারাই এখন ভরসা, আর পুরোহিতদ্বয়। নৃত্যবাবু স্টেজ নিয়ে পড়েছেন।

রিহার্সেল-রুমে লোক ধরে না, পূজার প্রাঙ্গণ খালি। ম্যানেজার কেবল ছুটোছুটি করছেন আর চটছেন,—"এই নাকে খৎ, একবার বিসর্জনটি দিতে পারলে বাচি।"

শরৎবাবু বললেন, "দোহাই তড়িৎবাবু, রাণী সাজবেন, অমন সুন্দর মুখখানা, চ'টে চ'টে বিগড়ে ফেলবেন না।"

বিপিনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "না হে, উনি বেমতলবে কিছু করেন না। রাবণের সামনে তো ওঁর রোষমিশ্রিত কান্না নিয়েই প্রবেশ। দুয়ের সংমিশ্রণ তোফা হবে, সেই মুখই তো preferable। দেখে নিও, নবমাটা হিজ, I mean শিজ ডে (day) হয়ে দাঁড়াবে।'

সুশৃঙ্খলে দু দিক বজায় হওয়ার পথ পাচ্ছি না। অন্তত দুটি অভিজ্ঞ কাজের লোক দরকার। এই দুর্ভাবনা নিয়ে শয্যাত্যাগান্তে, সকলকে ডেকে পূজা-প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে দেখি, নৃত্যবাবু স্টেজে wings fit করছেন।

তড়িৎবাবু বলছেন, "আজ সবে পঞ্চমী, ও-কাজটা নবমী কাটলে করবেন। এখনই ডানা (wings) বসাবেন না। যে ব্যবস্থা দেখছি, ও-সুবিধে পেলে, মা এক দণ্ড দাঁড়াবেন না, এসেই উড়বেন, আমার ম্যানেজারি যাবে। কি ঝকমারিই করেছি! এ দেশে এখন জয়ন্তীর ডাল পাট কোথা, আবার বেশ্যার দোরের মাটি! কি বিদ্‌কুটে ব্যবস্থা মশাই। সবই কি আমাকে করতে হবে? এ জানলে -'

২

দেবেনবাবু সকালে এসেই প্রতিমা সজ্জায় লেগে গেছেন। ছেলে-মেয়েরও গাদি লেগে গেছে। এদিকে বাবু, চাকর, মজুর, দর্শক অনেকেই উপস্থিত।

তার মধ্যে একটি নগ্নপদ, দিব্যদর্শন গৈরিকধারী বলিষ্ঠ যুবা তড়িৎবাবুর কথা একাগ্রে শুনছিলেন আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তড়িৎবাবু তাঁর দিকে চেয়েই থেমেছিলেন, তাই আমাদের দৃষ্টিও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নীরদবাবু শ্বাসের ক্রিয়া করেন, আপিসও বন্ধ থাকে না। Rule of three-ও চলে, শ্বাস regulate-ও চলে। এক মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করেন, বেশি হাওয়া না বেরিয়ে যায়। সুমন্ত্রকে সজং রাখাই তাঁর সর্বক্ষণের কসরৎ। সাধু-সন্ত এলে তিনিই এগিয়ে যান যেহেতু ঝুটো-সাচ্চার সমঝদার তিনি। তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে, এ পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন, তাঁর পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত কেউই টেকেন নি। তাঁর অর্থপূর্ণ নিঃশব্দ হাসি, নির্বিকারদেরও বহির্দ্বার দেখিয়েছে।

এগিয়ে গেলেন।—"সাধুজীর কোথা হতে আগমন ?"

তিনি সহাস সুমধুর কণ্ঠে বললেন, "আমি সাধু নই ঘুরে বেড়াই তাই ছোপানো [illegible]—[illegible], ধোপার কড়ি জুটেবেই অভাব। গোদাবরী কুম্ভ ঘুরে গত রাত্রে এখানে এসে পৌঁছেছি। মণ্ডপে আলো জ্বলছিল, মায়ের কাছেই প'ড়ে ছিলুম।"

সুবিধা না [illegible] নীরদবাবু বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেন। কিছু বলতেই হবে। "সাধু নন, কুম্ভের শখ ?"

"কাজের মধ্যে যখন ঘোরা, গেলুমই বা ?"

'কেন, নিজের কাজ কিছু কি নেই ? [illegible] আছে। শুধু শুধু ঘোরাই বা কেন ?'

"সে যে অনেক কথা। আর তা শুনেই বা আপনার লাভ কি হবে ? যাদের ইহকালই নিজের নয়, তাদের পরকাল আছে কি ?"

তড়িৎবাবু বললেন, "মাপ করুন নীরদবাবু, যখন পূজা-ক্ষেত্রে এসে পড়েছেন, উনি আমাদের অতিথি, নিশ্চয়ই কাল থেকে অভুক্ত।—কথাবার্তা পরে চলে চলবে, আগে স্নানাহার করান। (সাধুর প্রতি) অন্ততঃ পূজার কদিন আপনাকে আমাদের অতিথি হয়ে থাকতে হবে।"

তিনি সহাস্যে বললেন, "কিন্তু কাজ দেবেন।"

তাঁকে বাসায় নিয়ে যাওয়া গেল। সকলেই সঙ্গ নিলেন—ধীরপদে, অর্থাৎ নীরদবাবুর চালে, যেহেতু তিনি কিছু বলবেনই এবং সেটা শোনবার মত কিছু হবেই।

অপাঙ্গে হাসি টেনে বললেনও, "সাধু কাজ চান ?"

একজন বললেন, "কেন, তাতে ক্ষতি কি ?"

"আপনাদের আর ক্ষতি কি ? ওঁর কথাই ভাবছি। শ্বাসের চাষ নেই, বেকার ঘোরা।" ইত্যাদি।

আহারান্তে সাধু-সমেত আড্ডায় জমায়েৎ। তিনি মিষ্টভাষী ও মিশুক, অল্পক্ষণেব মধ্যে আপনার হয়ে গেলেন।

নীরদবাবু এগিয়ে ব'সে বললেন, "যখন সাধু নন বলছেন, তখন নাম-ধাম বিষয়-কর্ম ব'লতে আপনার আপত্তি থাকতে পারে না।"

"কিছু না। তবে আমার মত লোকেব নামটা - পরিচয়ের মধ্যেই নয়, যে নাম ইচ্ছা দিতে পারেন, আমি নিজেকে ভশভিক্ষুই বলি। উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় ; নিবাস বিষ্ণুপুর, কাজ-কর্মের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো, সে কথা পূর্বেই বলেছি। লেখাপডা সেকেণ্ড ইযার পর্যন্ত, পরীক্ষার অপেক্ষা সয় নি।"

"কেন ?"

"মনে হ'ল, লেখাপড়া তো চাকরির জন্যে। পরাধীন মানে দাস। আবার চেষ্টা ক'বে পাস-করা দাস হওয়ার চেয়ে—হরি-দাস হওয়াই ভাল। পাগলামি কত রকমের থাকে তো !"

"সেটা স্বীকার করেন ?"

"আমি না বললে, আপনি বললেন তো ?"

নীরদবাবু সুবিধা না পেয়ে বললেন, "হরি-দাস হয়ে করছেন কি ?"

"দেখাবার মত তো কিছু দেখতে পাই নে।"

তড়িৎবাবু ত্বরিত-গতিতে ঘরে ঢুকেই শুরু করলেন, "মথুরা হালুয়াই বালুসাই যা বানিয়েছে, বাঘে চিবুতে পারবে না। প্রত্যেকের পাতে গেলাসের পাশেই এক-একটি হামানদিস্তের ব্যবস্থা না করলে রক্তারক্তি। একেবারে Shell Factory-র মাল, মেঘনাদ-বধ দেখবার লোক থাকবে না। পুলিসে টের পাবার আগে সেগুলি পুঁতে ফেলাই যুক্তি, নচেৎ ম্যানেজারের 'বেলে'র যোগাড় করুন—তাঁকে না জেলে পূজো দেখতে হয়। এদিকে স্বভাবের একটা তাগিদ মেটাতে ঈশ্বরীপ্রসাদের বাগানে গিয়ে নজরে পড়ল, নিমগাছে আমাদেরই একটা নতুন কলসী ঝুলছে—সর্বাঙ্গে ঘিয়ের বসুধারা। উদিকে চিনির অমন দেড়মুণি থলে ভেনঘরে চুপসে থেবড়ে রয়েছে। যাভা পর্যন্ত দৌড় করাবে দেখছি। এখনও কোথায় কি, বোধনেই এই

বিভ্রাট! দয়া ক'রে ইস্তফা নিন, আপনারা মেঘনাদ বধ করুন বা পূজা বন্ধ করুন—যথা অভিরুচি।"

ঝড়ের বেগে এতগুলি কথা কওয়ায়, নীরদবাবু নিশ্চয়ই ভীত হচ্ছিলেন। আমরা না হাসতে পারি, না নিজেদের কাজের সমর্থন করতে পারি। রামচন্দ্রের only hope দক্ষিণ ও বাম হস্ত, তখনও অচল, তাঁদের পার্ট মুখস্থ হয় নি; দেবেনবাবু মিত্র বিভীষণ, শরৎবাবু দুর্দিনের ভাগ্যলব্ধ হনুমান,—স্মৃতি-শক্তি উভয়েরই সমান। তাঁদের প্রাণ প'ড়ে রয়েছে পকেটে—পার্টের পুঁথিতে।

এখন উপায়? সকলেই বললেন, "তাই তো!" একজন বললেন, "মথুরা বেটাকে মেরে তাড়াও।"

দেশভিক্ষু হাসিমুখে বললেন, "মার আর বধ না থাকলে বিজয়া হবে কি ক'রে? যাক এঁরা বিজয়ার আয়োজন করুন, আপনি চলুন তো তড়িৎবাবু, ভেনুঘরের ভাবটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসবেন। তার পর ও-দিকটে আপনাদের না দেখলেও চলবে।"

নীরদবাবু চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, গলা বাড়িয়েই—"কিন্তু—"

তড়িৎবাবু বাধা দিয়ে করজোড়ে বললেন, "নীরদবাবু, ক্ষমা করুন। এ আপৎকালে আর—'কিন্তু' কি 'কেন' ঝাড়বেন না। চারটে দিন দয়া করুন।"

"না, ওতে ওঁর "

"কোনও ক্ষতি হবে না, আপনি, নিশ্চিন্ত থাকুন।"

তিনি দেশভিক্ষুকে নিয়ে চ'লে গেলেন। আমরা স্বস্তি বোধ করলুম।

নীরদবাবু চটেন না, এইটি তাঁর সাধনালব্ধ মহৎ গুণ। চটলে দেহমধ্যস্থ জীবাণু সকল জখম হয়, তাতে শরীরের ক্ষতি তো হয়ই, আসল ক্ষতি—যোগচ্যুতি ঘটে।

বললেন, "সাধুজীর বুলি দুরস্ত বেশ। বলছিলেন না, 'সকল জিনিসেরই মূল্য আছে, উচিত মূল্য দিয়ে পেতে হয়, তা না তো ঠকতে হয়,—কিছু পেতে হ'লে তার ওজনেরও মূল্য দিতে শেখাই বোধ হয় বর্তমানের শ্রেষ্ঠ সাধনা।' কথা বেশ, কিন্তু কাজের বেলায় তো দেখছি লাড্ডু!"

একজন বললেন, "সেটিও মূল্য দিয়ে পেতে হয়, সেই মূল্য দিতেই গেলেন।"

নীরদবাবু একটু অশব্দ হাসি হানলেন। তার পর রিহার্সেল চলল।

আজ মহাষ্টমী, সকলে উপবাসী। সন্ধি-পূজা ছিল বৈকালে। তাও নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেছে,—অবশ্য পুরোহিতদ্বয় আর দেশভিক্ষুর দক্ষতায়।

সন্ধ্যারতির পর প্রসাদের পারণ শুরু হ'ল।

নীরদবাবু বললেন, "সাধুজী উচিত মূল্য দিয়ে কি ওৎরালেন তা দেখা যাক "

কথাটা সকলেই অনুমোদন করলেন। দেশভিক্ষু নিজেই সকলকে দিতে লাগলেন। লুচি, আলুর দম, কচুরি, অমৃতি, বোঁদে, পান্তুয়া, বালুসাই, সন্দেশ, রসগোল্লা—সবই উৎকৃষ্ট এবং এ দেশে দুর্লভ।

সকলেই প্রবল পারণ করলেন। তড়িৎবাবু ভাঁড়ারের ভবিষ্যৎ ভেবে বিচলিত হতে লাগলেন।

সাধু নীরদবাবুকে বললেন, "মিষ্টান্ন সাত্ত্বিক আহার, দ্বিধা করবেন না। তিনি পান্তুয়াটা প্রচুর ওড়ালেন। বললেন, "আপনি দেখছি যথেষ্ট একাগ্রতা এদিকে দিয়ে ফেলেছেন। এইটে যদি—'

"উচিত মূল্য না দিলে ইষ্টলাভ হয় কি? আপনারও ভাল লাগত না।'

"ইষ্টই বটে!" ব'লে নীরদবাবু পান্তুয়া মুখে পুরলেন।

তড়িৎবাবু বললেন, "ওঁর অপরাধে পান্তুযাকে আর নির্বংশ করা কেন?'

বিপিনবাবু বিষয়ী লোক, তিনি প্রত্যেক জিনিসটি মুখে দেন আর ভাবেন "এঁকে ছাড়া হবে না,—এইখানেই দোকান করতে হবে। এ জিনিস পড়তে পাবে না। রেলের ফিরিঙ্গী এস্তোক কেল্‌নার কোম্পানি নিয়ে যাবে। টাকা আমার—দশ আনা ছ আনা।"

আহারান্তে আড্ডা জমল। দেশভিক্ষুর ভাঁড়ার মিষ্টান্নে আর ঘৃতপক্কে পূর্ণ। তিনি ভাঁড়ারে চাবি দিলেন। তাঁকেও টেনে আনা হ'ল। তাঁর প্রতি সকলের আজ শ্রদ্ধা সমধিক।

"আপনি খাবেন না?"

"আমি আজ খাই না।"

ওষ্ঠরুদ্ধ উপহাসের হাসির সঙ্গে নীরদবাবু আরম্ভ করলেন, "ও কষ্টটা মিছে আর পাওয়া কেন? আপনাকে গেরুয়া আর পরতে দিচ্ছি না কিন্তু। স্বামী ভূতানন্দ থাকলে—"

"বড় সৌভাগ্য যে তিনি নেই, তা হ'লে ভাঁড়ারে কোনও জিনিসের কণামাত্র থাকত না।"

"এই যে জানেন দেখছি। অত বড় যোগী আর—"

শরৎবাবু দেশভিক্ষুকে বললেন, "উনি যে তাঁর নাত্যানন্দ, শিষ্যের শিষ্য। স্বামীটে—অবশ্য ওঁর পত্নীর।"

নীরদবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "গুরুদেবকে তিনি সাত মাসেই 'নাল' তুলিয়েছিলেন—ক্রিয়ার শেষ। হঠযোগীর পরম প্রাপ্তি।"

"'নাল' তোলাটা কি?"

নীরদ আশ্চর্য হলেন. "নামও শোনেন নি? তবে আর ঘুরছেন কেন?—লাটিমও তো ঘোরে।"

দেশভিক্ষু হাসিমুখে বললেন, "লাটিমকে কেউ ঘোরায়, আমাকেও গ্রহে ঘোরায়। পরাধীনের বন্ধনমুক্তিই বোধ হয় চরম প্রাপ্তি. তার পর নির্বাণ-মুক্তির কথা [illegible] জানা চলে। মুক্তির আস্বাদ যে জানি না নীরদবাবু,—আস্বাদ পেলে না চেষ্টা এগুবে?"

নীরদবাবু যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন। ভিক্ষু বললেন, "আমার বাজে কথায় কান দেবেন না। আপনার 'নাল তোলা' আসে?"

নীরদবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "আমার? গুরুদেবই হিমসিম খেয়ে যান। দশ মিনিট দম বন্ধ ক'রে কঠিন প্রক্রিয়ার দ্বারা সফল হন, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, টসটস ক'রে ঘাম পড়ে। আধ ঘণ্টা সামলাতে যায়—শুয়ে পড়েন। কাজটি তো সাধারণ নয়--দুর্লভ, ভারতের বিশিষ্ট [illegible] সম্প্রদায় মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু পাবে কজন?"

"নিজে দেখে থাকেন তো বলতে আপত্তি আছে কি?"

"পরম গোপনীয় বটে। তবে সকলের সাধ্য যখন নয়, তখন আভাস দিতে পারি।"

গুরুদেবের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে, বোধ হয় অনুমতি নিয়ে বললেন, "দু হাঁটু গেড়ে দু পায়ের গোড়ালির ওপর এই ভাবে (প্রদর্শন) ব'সে, শ্বাস রোধ ক'রে আগ্রীব মেরুদণ্ড erect (খাড়া) রেখে, সুষুম্না-পথে বায়ু-সঞ্চালন করতঃ, চক্ষু স্থির ক'রে, ধীরে সমস্ত নাড়ীর ঊর্ধ্বগতি করতে হবে। ক্রমে তারা একত্রে হয়ে নাভি থেকে বক্ষ পর্যন্ত একটি নল আকারে এক ইঞ্চি স্ফীত হয়ে সুস্পষ্ট দেখা দেবে, আর দু ধারের কুক্ষিতে একদম খাল প'ড়ে গিয়ে পেট

বেয়ালার আকার ধারণ করবে। এই যাঁরা পারেন, সমাধি তাঁদের মুঠোর মধ্যে। বহু জন্মে ও ভাগ্যে এই চরম লাভটি ঘটে।"

ভিক্ষু অবাক হয়ে শুনছিলেন। সহসা উত্তরীয়খানা ফেলে, হাঁটু গেড়ে ব'সে বললেন, "এই রকম কি ?"

যেই বলা, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নীরদবাবুর বর্ণনার প্রতিচ্ছবি। দুই কক্ষ বিলীন, নাভি হতে বক্ষার্ধ পর্যন্ত দেড় ইঞ্চি প্রশস্ত, আর দেড় ইঞ্চি উপরে ( above surface ) স্ফীতি।

হাসি-মুখে নীরদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কি ?"

সে নীরদবাবু আর নেই। "কথা কবেন না, এখন কথা কবেন না"— ব'লেই প্রণাম। নীরবে অবস্থান।

মিনিট দুই পরে তিনি সে ভাব সম্বরণ করলেন। যেমন মানুষ তেমনই— না ছিল কসরৎ, না চোখ লাল, না ঘর্ম। স্বাভাবিক ও সহজ।

নীরদবাবুর এই পরাজয়ে সকলেই খুশি। নীরবে চোখ-চাওয়া-চাওয়ি। আশ্চর্যও সকলেই।

তিনি উত্তরীয়খানা নিয়ে উঠলেন। "রাত হয়েছে, সকালেই নবমী পূজা, সব ঠিক রাখা চাই। আপনাদের রিহার্সেল চলুক, খাটা চাই, মূল্য না দিলে মনের মত মাল মিলবে না।" ব'লে হাসলেন। "আচ্ছা, আপনারা জ্যান্ত কিছু খুঁজে পেলেন না বুঝি ? মৃতকে মারবার অভিনয় কেন ? একটা লোক কতবার মরবে ?" ব'লে হাসতে হাসতে উঠে গেলেন।

কারুর মুখ থেকে কথা বেরুল না। নীরদবাবুর কথা ফুটল, "অসাধারণ যোগী ! আপনারা কেউ চিনতে পারেন নি।"

নীরদবাবু চোচাপটে চিত হয়ে পড়ায়, তড়িৎবাবুই সবার চেয়ে খুশি হয়েছিলেন। বললেন, "যাক, একজন পারলেই হ'ল, আমরা মারফতে মারব। আমার চেনাটা অন্য রকম। আমাদের অবস্থা দেখে মা তাঁর পূজার ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নিয়েছেন।"

হরকিষণবাবু স্থানীয় অবস্থাপন্ন লোক, নর্মদাকূলে পঞ্চাশ বিঘে বাগান আছে। বললেন, "ওঁকে রাখতে হবে, আমার বাগানে ওঁর ইচ্ছামত আশ্রম বানিয়ে দেব, ছাড়া হবে না।"

কথাটা বিপিনবাবুর ভাল লাগল না। তাঁর মাথায় তখন 'পান্তুয়া' ফুট কাটছে,—initial expenditure-এর হিসাব চলছে।

৪

নৃত্যবাবু ড্রেসের (dress-এর) জন্য সাত দেশ চ'ষে বেড়াচ্ছিলেন, পাঁচটা রয়েল ড্রেস চাই।

সবেগে আড্ডায় প্রবেশ ক'রে বললেন, "এই বুঝি আপনাদের রিহার্সেল হচ্ছে? জানেন, কাল এমন সময়ে ব্যাপারটা কি?"

দোয়ারীবাবু প্রবীণ লোক; বললেন, "সেই ভেবেই তো এঁদের হাত-পা আসছে না।"

"না, তামাসার কথা নয়। নীরদবাবু তো একটি 'হাপোরমালী'—হাপুরে কসরতের জড়ভরত! বাজে কথার বৈশম্পায়ন, শত পৃষ্ঠাকে অষ্টাদশ পর্ব করতে মজবুত। এদিকে চেড়াদের চুল মিলছে না।"

দেবেনবাবু মাথা চুলকে ধারে ধারে বললেন, "কেউ তো চেনে না, কথাবার্তাও নেই,—বাড়ির এঁদের স্টেজের পেছন দে এনে বসিয়ে দিলে, আর কোলে—পেঁচা, টিকটিক, পোটা, গুবরে থাকলে, এই রিয়ালিজ্‌মের (realism) দিনে মানাবেও ভাল—নেত্তোবাবুর দুর্ভাবনাও যাবে। তাঁরাও তাতে গর্বানন্দ পাবেন।"

কে একজন hear hear বললেন। সকলে হেসে ফেললেন।

"ঠাট্টা নয় দেবেনবাবু, যাকে করতে হয় সেই জানে! রাজবাড়িতে রয়েল ড্রেসের জন্য এই পাঁচবার যাওয়া হ'ল। নাপিত বাড়ি নেই, কোথায় গেছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না,—তোষাখানার চাবি নাকি বংশাবলীক্রমে নাপিতের charge-এ (জেম্মায়) থাকা নিয়ম। আবার ভোর না হতেই ছুটতে হবে।

"কোন্ দিক সামলাব? এলাহাবাদে আজ টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যাওয়া উচিত ছিল। সকালেই সেকেণ্ড ক্লাস বার্থের রিটার্ন ফেয়ার পাঠাতে হবে, তা না তো হেমেন্দ্রবাবুকে পাওয়া যাবে না। গাইবে কে? সেরেফ রাবড়ি, রসগোল্লা আর আঙুর খান, তাই অমন মিঠে গলা রাখতে পেরেছেন; একাধারে প্রমীলার আওয়াজও পাবেন, শূর্পণখার আওয়াজও পাবেন,—চালাকি নয়।"

"হনুমানের গান নেই বুঝি? একটা ঢুকিয়ে দিন না, শোনা হয়ে যাক। খরচটি তো কম নয়, ভাগ্যে আর জুটবে কি না কে জানে!"

"এখন আসুনই আগে, তাঁদের পাওয়া সহজ নয়। তাঁর টাকাটা সময়ে পৌঁছলে হয়। উঃ, তা না তো—"

নৃত্যবাবু আর বলতে পারলেন না। চোখে সরষে ফুল দেখলেন।

"এলাহাবাদে কি করেন?"

"কেল্‌নারের কেরানী।"

"বাপ্‌! বার্থ রিজার্ভ! আমাদের বড়বাবুর যে ইণ্টার পর্যন্ত দৌড়!"

"গানটা একবার শুনবেন। আপনি যে একটিও কথা কচ্ছেন না নগেনবাবু?"

"আর যতক্ষণই বা আছেন, তাই আপনার কথাই শুনছি। কা'ল রাত পোয়ালে তো আর শুনতে পাব না।"

হাসি প'ড়ে গেল।

দেশভিক্ষুর চেষ্টা ও নিষ্ঠায় নবমী পূজা, কাঙালী ভোজন প্রভৃতি নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল। হাসি-মুখে কি পরিশ্রমই করতে পারেন।

রাতের বাবু-ভোজ সহস্তেই করালেন। বললেন, 'অভিনয় আছে, আজ একটু হাতে রেখে।"

কে একজন বললেন, "নৃত্যবাবুকে কিন্তু সাধ মিটিয়ে দশ ভোর খেয়ে নিতে দিন। উনি মেঘনাদ। আহা—"

লোকে লোকারণ্য। তড়িৎবাবু তিনটে আংটি প'রে বিজলী হেনে ফিরছেন—মেয়েদের না কোন অসুবিধা হয়।

যারা মেয়ে সাজবে, তারা ঘন ঘন পান খাচ্ছে, আর পাউডার মাখছে। সিগারেট জ্বলছে নিবছে যেন আলেয়ার মত।

হেমেন্দ্রবাবু এসে গেছেন এবং সেরেফ এক ডজন রসোগোল্লা খেয়েছেন, ভোজন করেন নি, গাইতে হবে।

কি কোলাহল! গ্রীন-রুমে সাজে সাজো রব। নৃত্যবাবু বলছেন "ও কি করা হচ্ছে? আগাগোড়া তো শাড়ি শেমিজ থাকবে- সর্বাঙ্গে পাউডার লাগানো কেন?

সকলের ঘরণীই এসেছেন। চিকের মধ্যে ঘন ঘন পানের চালান চলেছে।

শরৎবাবু হনুমান। তিনি বেঁকে বসেছেন,—ভাল বয়েল ড্রেসটা তাঁর চাই, আর তাঁকে মহাবীর ব'লে সম্বোধন করতে হবে। এই কণ্ডিশনে (condition) তিনি হিউমিলিয়েশন হজম করতে পারেন, নচেৎ এই নারী-মণ্ডলীর সামনে—

তখন সকলে সব-তাতেই রাজি। প্রভু রঘুনাথকে সাবধান ক'রে দেওয়া হ'ল—শ্লিপ না হয়। আমি প্রম্‌ট করব—আমাকেও।

হারমোনিয়ামের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ উঠতেই—সব নিস্তব্ধ। ফুট-লাইটের পরেই টেব্‌ল হারমোনিয়াম টিপছেন—হেমেন্দ্রবাবু। রোগা এবং লম্বা। ভায়লেট্‌ রঙের সিল্কের লম্বা পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম। লম্বগ্রীব, লম্বা লহরদার চুল, লম্বা—ঈষৎ-চড়ানো মুখের উপর লম্বা নাক, একদম প্রলম্বাসুর। পিচ্‌ কলারের রুমাল—ঊর্ধ্বপুচ্ছে মাথায় জড়ানো। সিল্কের মোজার ওপর আনকোরা পাম-শু। পরনে কোঁচানো জরি-পেড়ে ধুতি,—কন্দর্প ও কিন্নরের সঙ্কর। অর্থাৎ যা হ'লে ঠিকটি হয় এবং পরবর্তীদের প্রাণে পৌঁছে যায় ও কাজে আসে।

হীরের (?) আংটি-পরা লম্বা আঙুল,—হারমোনিয়ামের পর্দা স্পর্শ ক'রে যেন চুমকি বসিয়ে চলেছে। সহসা—

"কে রচিবে মধুচক্র" শুরু হইতেই ক্ল্যাপ। টুঁটি—অন্ধেও দেখতে পায়-এমনই উবোলা। সে ন'ড়ে-চড়ে কণ্ঠের পর্দা ঠিক করতে লাগল।

গান শুনে সকলেই মুগ্ধ।—এন্‌কোর্‌।

অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল। আমি ডানা-(wing)-ঢাকা বেকার প্রম্‌টার। কেই বা কান দেয়! শাল্মলী তরুবরকে—কলমী তরুবর; দাশরথিকে—দাশুরায়; রঘুজ অজ অঙ্গজকে—বঘুজ ভুজ পঙ্কজ, চলল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালুম।

বাড়ির মনোরথ পূর্ণ করবার জন্যে নীরদবাবুকেও চার লাইনের চিত্ররথ সাজাতে হয়েছিল। কথাগুলো নিঃশব্দে তাঁর মুখের মধ্যে জব্দ আর স্তব্ধ হয়ে রইল—বেশি বাতাস না বেরিয়ে যায়।

শরৎবাবু হনুমান, বাড়িতে বরাবর ব'লে এসেছিলেন—মহাবীর। প্রমীলাকে দেখে স্তব্ধ-বিস্ময়ে বেজায় হাঁ ক'রে খট্টাসের মত চাইতেই, চিকের মধ্যে নারী-কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, "আঃ পোঃ—ও যে বেটাছেলে! কেউ ব'লে দিক না গা।"

কলহাস্য। একজন জিজ্ঞাসা করলে, "কর্তা কি সেজেছেন লা?"

"মহাবীর।"

শুনে সকলেই হাসি-ঢাকা চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করেন।

এমন সময় উত্তেজনার মুখে বেসামালে শরৎবাবু নিজমুখেই বামাল বার

ক'রে ফেললেন, "হনুমান নাম মম, রঘুদাস আমি।"

আমি তাড়াতাড়ি 'মহাবীর মহাবীর' ব'লে চেঁচালুম। Too late। চিকের ভিতরকার অবস্থা অবর্ণনীয়। শরৎগৃহিণী ছেলেকে কাঁদিয়ে উঠে গেলেন।

আমরা ভীত। তারপর আর শরৎবাবুর অ্যাক্‌টিং (acting) জমে নি। জমেছিল নাকি বাড়িতে।

তড়িৎবাবু চিত্রাঙ্গদা, কান্নায় ফার্স্ট প্রাইজ নিলেন। সকল মেয়েই চোখ মুছেছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু সাত গানে মাত ক'রে আর অশ্রুপাত করিয়ে জয়মাল্য পেলেন। শেষে দেশভিক্ষুর অনুরোধে ড্রপের বাইরে এসে, ভৈরবীতে যখন ধরলেন—

"কবে আসিবি গো মা পুনঃ ভবনে
এ প্রাণ জুড়াব কবে পুনঃ মুখ-দরশনে।"

তখন বাঙালীর প্রাণ অন্তরের এই সত্যিকার প্রার্থনায় সহজেই চোখের জলে যোগ দিয়েছিল।

নৃত্যবাবু গ্রীন-রুমে তালা লাগালেন। হেমেন্দ্রবাবুর ট্রেন আটটায়, তিনি বিজয়ীর মত ivory-handle চোব-স্টিক ঘোরাতে ঘোরাতে সকলের সকৃতজ্ঞ সমাদর আদায় ক'রে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

৫

দশমীর প্রভাবটা, সকালেই সকলকে পেয়ে ব'সে অবসাদ আর অবসন্নতা এনে দিলে। অভিনয়-সমালোচনার উত্তেজনা কারও এল না। সকলেই বাসায় চ'লে গেলেন। কেবল দেশভিক্ষু তড়িৎবাবুকে টেনে রাখলেন।

বেলা তিনটের পর সকলে একত্র হয়ে এসে দেখি, বাসন, ল্যাম্প, মায় শামিয়ানা, যথাস্থানে সব ফেরত গেছে। পুরোহিতের পাওনা, ট্রেন-ভাড়া, চাকর-মজুরের পাওনা, বকশিশ, ফর্দ ক'রে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা এক সপ্তাহে মিটত, দেশভিক্ষু তড়িৎবাবুকে তাঁর পনরো-আনা দায়মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। তাঁর দুর্ভাবনার এতটুকু কারণ রাখেন নি, তাঁকে একদম স্বচ্ছন্দ ক'রে দিয়েছেন।

বরণ শেষ হ'লে বেলা চারটের পরই প্রতিমা নিয়ে, ব্যাণ্ডসহ সমারোহে রওনা হওয়া গেল। নর্মদা প্রায় পাঁচ মাইল। শরৎবাবুকে কেবল পাওয়া গেল না।

ঘাটে নৌকা প্রস্তুতই ছিল। সন্ধ্যার পর নিরঞ্জন শেষ ক'রে শহরের পথে ফেরা গেল। দেশভিক্ষুর সে হাসিমুখ, সে উৎসাহ যেন নিবে গেল। তিনি উদাসভাবে পথের একপাশ ধ'রে চললেন।

দেবেনবাবু চোখে হাসির আভাস নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "মাটির মায়ের তরে আপনার যে বড় এ ভাব?'

তিনি কাতর নয়নে বললেন, "মাটির মা-ই-তো সত্যিকারের মা দেবেনবাবু। রক্তমাংসের মা হ'লে 'অমৃতস্য পুত্রা' হতুম কি ক'রে? দেশ চিরদিনই মাটির, তিনি সন্তানদের বুকে ক'রে লালনপালন করেন, সব উপদ্রবই সহ্য করেন, ক্ষমা করেন। তাঁর বুকে থেকেও চিনতে পারি না। যাঁরা চিনেছিলেন— তাঁরা তাঁর মূর্তি গ'ড়ে পূজা করেছিলেন—ওই তো মায়ের সত্যিকারের প্রতীক। পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়। এ ভুল যে দিন ভাঙবে, সে দিন বিসর্জন আর দেব না—অর্জনের দিন আসবে। আজও বিসর্জনই দিচ্ছি।

একটি গভীর নিশ্বাস পড়ল, একটু ম্লান হাসি দেখা দিল।

*    *    *    *

শহরের মধ্যেই এসে পড়া হয়েছিল। সহসা অনেকেই ব'লে উঠল, "নিকটে কোথায় আগুন লেগেছে—কি হল্‌কা উঠছে!"

দেশভিক্ষু কথা না ক'য়ে ছুটলেন। আমরাও দ্রুত চললুম।

গিয়ে দেখি, জৈনপাড়ায় ভীষণ আগুনের খেলা। দশমীর উৎসব এ দেশেও আছে, ছেলেরা বাজি পুড়িয়ে এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে।

জৈনীরা পরেশনাথের সেবক,—বড় বড় ধনী। পরেশনাথের রথ বার করা তাঁদের পরম সৌভাগ্য ও সম্মানের কথা। লক্ষ টাকার কমে সে কাজ সম্পন্ন হয় না।

তাঁরা সেই রথ বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত। বাড়ির ওপরকার বারান্দায় একটি পাঁচ বছরের ছেলে 'মা মা' ব'লে চীৎকার করছে। তার খোঁজ-খবর কেউ নেয় নি, সে বেড়া-আগুনের মধ্যে। বাড়ির নীচে চারিদিকের খোলার চালগুলি দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। তার মা ছুটে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

ওপরে ওঠবার উপায় নেই। সকলেই বিমূঢ়। চেয়ে দেখি, দেশভিক্ষু একখানা কম্বল হাতে তার পাশে উপস্থিত। কাপড় আর মাথার উত্তরীয় জ্বলছে। নিমেষে ছেলেটিকে কম্বলে জড়িয়ে "লেও" ব'লেই ছুঁড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ।

বোধ হয় ব'লে গিয়েছিলেন,—কয়েকজন 'পাশী' জোয়ান প্রস্তুতই ছিল, তারা ধ'রে নিলে।

সে অবস্থায় তাঁর পায়ের দৃঢ়তা ছিল না, নিজে নীচে না প'ড়ে জ্বলন্ত খোলার চালের কিনারায় এসে পড়লেন,—লেলিহান চিতার মধ্যে। তার পরই নীচে।

ছুটে গিয়ে তাঁকে সরিয়ে তফাতে আনতে পারি না—সব জ্বলছে। তাঁর মুখ থেকে বেরুল "মাটি" (যা ছিল তাঁর মায়ের পরশ)।

আঁজলা আঁজলা মাটি দিয়ে নিবিয়ে উত্তাপের বাইরে আনা গেল।

"এ কি করলেন?"

"পাবার মূল্য যে দিতে হয়।"—ব'লেই চোখ বুজলেন। সুমিষ্ট হাসিতে সারা মুখখানি আলো হয়ে রইল। আর সব নিবে গেল।

# লক্ষ্মীছাড়া

সারাদিন গেছে—সন্ধ্যা হয়, জল ভিন্ন ভোলার আর কিছু জোটে নি!

মানুষের কাছে চাইতে তার আর সাহস নেই; ভিখিরীর কাছে, সতীর্থের কাছে অসঙ্কোচে হাত পাতে। না পায়, কষ্ট পায় না।

আজ ভিখিরীও মেলে নি। খড়দার বাবুদের বাড়ি শ্রাদ্ধ বোধ হয়, সেইখানে সব গেছে।

ভোলা ধীরে ধীরে চলেছে।

হাজার লোক খেয়ে গেছে। উচ্ছিষ্ট বুকে ক'রে কলাপাত আর ক্ষীরের খুরি সামনের খানায় স্তূপাকার। কুকুরেরা কাড়াকাড়ি ক'রে খাচ্ছে।

আমি আর কে, আমিও আছি রে ভাই।

ভোলা নেবে পড়ল। পেটের হুকুম।

দেখে বাবুরা হেসে ব'লে যায়, "পাগল।"

ছেলে-মেয়েরা খেলছিল। পাগল শুনে, দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে মজা দেখতে লাগল।

একটা কুকুর হাতটা কামড়ে রক্তপাত ক'রে দিলে।

ভোলা হেসে বললে, "মরব না ভাই, মরব না। জগতের দুঃখ-কষ্ট মারধোর ফুরিয়ে গেল নাকি? তা ভেবো না।"

পাতা কুড়িয়ে কুকুরকে ও দেয়, খা খা।

তিন চার বছরের মেয়েটি ছুটে এসে বললে, "আহা বড্ড লেগেছে, বাছা রে! তুমি কাঁদছ না? লক্ষ্মী ছেলে। লুচি খাবে?"

এই ব'লে তার হাতের আধখানা লুচি ছুঁড়ে দিলে। জ্ঞান হয় নি কিনা!

"একটু সন্দেশ খাও।"—আধখানা খেয়ে অর্ধেক দিলে।

কুকুরের মুখ বাঁচিয়ে ভোলা মুখে পুরলে।

"কে মা তুমি অন্নপূর্ণা? কোলে করতে যে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। দু বছরে সন্দেশের স্বাদ ভুলি নি তো, ঠিক তাই আছে।"

না ভোলাটাই সাজা।

বাবুদের সব জুড়ি-গাড়ি এসেছিল। ঘোড়ারা দানা খাচ্ছে।

তাদের মুখ থেকে যা ছটকে পড়ছিল, তাই খুঁটেই ভর-পেট।

আজ কি সুপ্রভাত!

*   *   *   *

পরাণের সঙ্গে দেখা। কামারহাটির কল তিন দিন বন্ধ, সে বাড়ি যাচ্ছে। বললে, "এ কি, পাখা-টানা কাজ কি হ'ল? যাস নি?"

"সে কাজ আর নেই।"

"তাই এমন মূর্তি! খোঁড়া মানুষ, তবে আর কোন্ কাজ করবি? তা ছাড়লি কেন?"

"একজন তিন-চারটি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এসে সাহেবের কাছে বড় কাঁদতে লাগল, খেতে পায় না। ছেলেদের মা ম'রে গেছে—

"সাহেব বললে, 'খালি হ'লে এসো, এখন খালি নেই।'

"বড়বাবু দাঁড়াতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে।"

পরাণ বললে, "বড়বাবুদের ওইটেই তো বড় কাজ।"

"সে দিন তাদের খাওয়া হয়নি। ছোট ছেলেটা খিদেয় খাবি খাচ্ছে, নেতিয়ে পড়েছে।

"আমার কাছে ভাই তিন গণ্ডা বই ছিল না। তাই দিয়ে বললুম, 'ওদের কিছু কিনে খাওয়াও। কাল কাজ খালি হবে, তুমি এসো।'"

"অমন চাকরিটে তাকে দিয়ে দিলি?

"সে মুখ যদি দেখতিস! আমার আর কে আছে?

"হ্যাঁ পরাণ ভাই, লক্ষ্মী আমার কথা কয়? কেমন আছে সে?

"তার নাম আর মুখে আনিস নি। বেইমান ছুঁড়ী কিনা ছিরু সদ্দারকে—"

"না ভাই, গাল দিস নি। কলে আমার পা গেল, তার দোষ কি?"

ভোলার বুকটা ফুলে উঠে নাক দে খানিকটে গরম হাওয়া বেরিয়ে গেল।

"কোনও কথা কয় না?"

"ছাই কয়। সেদিন বলছিল বটে, ভোলা থাকলে কি আমার অমন পাঁটিটে চুরি যায়! সারারাত সে এই দাওয়াটিতে প'ড়ে থাকত।'"

"বলেছে?

"ভারি বলেছে!"

"তুই বুঝতে পারিস নি পরাণ ভাই। অত বড় কথা বলেছে, আবার কি বলবে? ভুলতে কি পারে?"

"যা যা, ভোলা কুকুর কিনা—তার পাটী চৌকি দিত! নেমকহারাম!"

"গাল দিস নি ভাই, ওর মধ্যে কত বড় কথা রয়েছে। লক্ষ্মী জানে, আমি ঘুমুতুম না। বাস্, তা হ'লেই হ'ল।"

"উঃ, ভারী হ'ল! স্বর্গে বাতি হ'ল?"

"সত্যিই হ'ল ভাই। ওই কথাটিই আমার বুক আলো ক'রে থাকবে, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

পরাণ অবাক হয়ে বিরক্তিমিশ্রিত দুঃখে তার দিকে চেয়ে রইল।

"তার চোখ দেখেছিস তো? আমি চারদিকে চেয়ে দেখি—সে চোখ আর দেখতে পাই না, কোথাও নেই।"

"ভোলা, থাম্। পা গেছে, মাথাটা আর খোয়াস নি।'

"তুই ভাল ক'রে দেখিস নি পরাণ ভাই। লোকে বলে হরিণের চোখ, হরিণের চোখ;—সে দিন তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হরিণের চোখ দেখলুম। ছোঃ, কিছু না। কিছু না, মাইরি বলছি।"

"যে দরদ বুঝলে না, সে তো অন্ধ, তার আবার চোখ কি?"

"বোঝে, বোঝে, খুব বোঝে। তা না তো অমন কথাটা কয়! উঃ! তুই কাকে ভালবাসিস না পরাণ ভাই।"

"বাসতে চাই নে, চললুম। তোর খাওয়া হয়েছে?"

"আজ আর কিছু দরকার হবে না - ভরপুর।"

'তবে চললুম।"

"আমার দুখ্খু-কষ্ট তাকে যেন জানাস নি ভাই, তাকে বড় বাজবে।"

"উঃ, ম'রে যাবে সে!"

পরাণ চ'লে গেল।

ভোলা অন্যমনস্ক হয়ে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে, শুষ্ক হাসি হেসে আপনা-আপনি বললে, "পরাণ ভাই কিছু বোঝে না।"

আকাশের বুকটার ভেতর কত পাখি কত দিকে উধাও ছুটেছে। সকলে কি সবগুলোকে দেখতে পায়! গোটাকতক কাক, চিল শকুনই চোখে পড়ে।

* * * *

বিকেলবেলাটা।

বীরেন-উকিলের বাড়ির সামনের মাঠে ছেলেমেয়েরা খেলছিল

ভোলা তাই দেখছিল। বোধ হয়, লক্ষ্মীর চোখ খুঁজছিল খাওয়া হয় নি।

ঊর্মিলা ন-বছরের মেয়ে। ছোট ভাইটিকে কোলে ক'রে খেলছিল।

সহসা তাদের চোখের আলো নিবে গেল, হাসি-খুশি থেমে গেল।

ভাইটির গলায় হার ছিল, দেখতে পাচ্ছে না।

মাঠময় খোঁজা চলল। সন্ধ্যা হয়ে আসে।

"সে যে নতুন হার, অনেক টাকার। বাবা আমাকে আস্ত রাখবে না।"—ঊর্মিলা কেঁদে উঠল।

"কি হয়েছে দিদি?"

"মন্টুর গলার হার কোথায় প'ড়ে গেছে, পাচ্ছি না, খুঁজে দাও না গা।"

"দেখছি দিদি।"

বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল।

বীরেন-উকিল মকদ্দমা হেরে, মন-মরা মেজাজে বাড়ি ঢুকতেই এই সংবাদ। অগ্নিমূর্তিতে ধুলো-পায়েই ছুটে আসছিলেন।

"ঐ যে দিদি, তোমার পায়ের কাছে—' ব'লেই ভোলা হারছড়াটি কুড়িয়ে ঊর্মিলার হাতে দিলে।

"তুমি আমাকে বাঁচালে, তা না তো—"

বীরেনবাবু বীরদর্পে এসেই ভোলাকে কিল আর চাপড়।

সে প'ড়ে গেল।

"এই যে হার বাবা! আহা, মেরো না বাবা, মেরো না। ওই তো খুঁজে দিলে।"

"খুঁজে দিলে! বদমাইস, চোর। আমি বুঝি না, দিন-রাত ওই কাজ করছি।'

বুকে তিন লাথি।

"ওগো, মেরো না গো, ও খোঁড়া মানুষ।"—ঊর্মিলা কেঁদে উঠল।

"কাল এ তল্লাটে দেখতে পাই তো পুলিসে দেব। জানিস, আমি কে?"

মেয়ের হাত ধ'রে হ্যাঁচকা মেরে বললেন, "চল্ বাড়ি।"

সবাই চ'লে গেল। অনাহার আর ভীম-প্রহার নিয়ে প'ড়ে রইল ভোলা—অজ্ঞান।

কুকুর এসে শুঁকে গেল। 'আহা আহা' করলে কেবল বাতাস। আর 'মরি মরি' ক'রে অশ্বত্থগাছের শুকনো পাতাগুলো তার চারদিকে ছুটে এসে জড় হ'ল।

সর্বাঙ্গে বেদনা নিয়ে কখন জ্ঞান এল কেউ জানে না। ভোলা প'ড়েই রইল। জ্বর!

নিস্পন্দ প'ড়ে থাকতে দেখে অতি প্রত্যূষে বীরেনবাবু শঙ্কিতমনে, দুর্গানাম স্মরণ করতে করতে এলেন।

বেঁচে আছে দেখে বীরের মত শাসাতে শাসাতে ফিরলেন, নিশ্চিন্ত হয়ে।

* * * *

খোরাক না পেলে কেউ বাঁচে না, জ্বরও না। দু'দিন শুকিয়ে সে স'রে গেল।

"এ কি! রোদে প'ড়ে যে!"—ফিরতি বেলায পরাণ বললে।

"বড় মার খেয়েছি পরাণ ভাই, ভারি বেদনা।"

"কে মারলে?"

"আরে ভাই খোদা মারলে সবাই মারে। সে যাক, লক্ষ্মী ভাল আছে তো? কিছু বললে? উঃ, নিশ্বেস টানতে লাগে!"

"তোর এই হাল করেছে, ভাল থাকবে বইকি!"

"কেন? কি পরাণ ভাই, কি হয়েছে তার? আমার তো সে কিছু করে নি! ভগবান জানেন, আমি তার ভালই চাই।"

"লক্ষ্মী ছিমন্ত স্যাকরার দোকানে একজোড়া অনন্ত দেখে এসে ছিরুর কাছে সেই রকম অনন্ত চায়, পূজোর সময় দিতেই হবে। ছিরুর আর দেরি সইল না, দশ দিন পরেই ঠিক সেই রকম অনন্ত এনে দেয়।"

"এনে দেয়?

"লক্ষ্মীর সোবে হয়, এত শিগগির দুশো টাকার জিনিস দিলে কি ক'রে, এ বোধ হয় সোনার নয়। সে চুপিচুপি ছিমন্ত স্যাকরার দোকানে যাচাই করাতে গিযে ধরা পড়ে।

"ছিমন্তর দোকানে ঝাঁপ কেটে ওই অনন্ত চুরি হয়েছে, সে পুলিসে 'লিখিয়ে এসেছিল।

"লক্ষ্মীর দোষ কি, সে কোথায়?"

"লক্ষ্মীকে ছেড়ে রেখেছে, কি হবে কে জানে? ছিরু হাজতে, এই শুক্রবার

মামলা। ছিমন্ত বীরেন-উকিলকে ধরেছে, মস্ত উকিল, ভারি কড়া লোক। বলেছে, তিন বছর ঠুকবে।"

"লক্ষ্মী কি করেছে পরাণ ভাই, তার তো কোনও দোষ নেই।"

"কেঁদে কেঁদে মরছে, আর কি করবে? প্যাচে না পড়লে তো সত্যি কথা বেরোয় না, এখন বলে, 'ভোলাও চ'লে গেল, আপনার বলতে সে-ই আমার ছিল। তার চেয়ে আর আমার ভাল চাইত কে, তাকে কিছু বলতে হ'ত? তাকে কি আমি যেতে বলেছিলুম! আমার কপাল।'

"এ ছাড়া আর বলবে কি—বলবার মুখ রেখেছে!

"বলে, 'কোথায় যে গেল, একবারটি দেখাও দেয় না, কেমন আছে খবরও পাই না। আমি কি সাধ ক'রে এমন করেছিলুম! এ কথা সেও বুঝল না!'"

ভোলা চোখ মুছে বললে, "বলে? দেখছিস পরাণ ভাই। আমি জানি, তা সে কি করবে। এই বয়সে একলাটি বড় চিন্তেয় পড়েছে, যে চোখ শুধু হাসবে, সেই চোখে জল!"

ভোলা একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে, চোখে জল বেরিয়ে এল।

উদাসভাবে বললে, "তার জন্যে ভোলা কি না করতে পারত।"

"বেশ তো, এইবার তুই যা না।"

"হুঁ, যাব। দেখ্ পরাণ ভাই, ভালবাসার নাগাল নেই। ভাবতুম, আমার চেয়ে লক্ষ্মীকে কেউ ভালবাসতে পারে না। সে দেমাক ছিরু ভেঙে দেছে। সে-ই ওকে ভাল রাখবে, ভাল রাখতে পারবে।"

"এখন তিন বছর তো ঘানি ঘোরাক।"

"গায় লাগবে না পরাণ ভাই, তার গায় লাগবে না। ঘানি তো বাইরে ঘুরবে, লক্ষ্মী যার মনে ঘুরবে, তার গায়ে লাগবে না। আমার তো কতদিন না খেয়েই, শুধু মার খেয়ে, গাল খেয়ে, তাড়া খেয়ে কাটে! তাতে কি?"

"তবে যাবি নি?"

"হুঁ, যাব বইকি। কি বার? শুক্কুরবার?

"হ্যাঁ, শুক্কুরবার মকদ্দমা। এই মওকা, বুঝলি?"

"আচ্ছা, পরাণ ভাই, তোর কথা ভুলব না।"

পরাণ চ'লে গেল।

আকাশে অসংখ্য তারা—সারারাত নীচের পানে চেয়ে আছে। কে

কাকে দেখবার জন্যে রাত জাগছে, কার মন কোথায় প'ড়ে আছে, কাকে খুঁজছে, পাশাপাশি থেকেও কেউ কারুর কথা জানে না—কারুর মন বোঝে না।

কোনটা জলতে জলতে ছুটে সোঁ ক'রে নেবে আসে, নিজেকে খাক ক'রে ফেলে। কেন? তা কে বুঝবে! বোধ হয় যাকে চায়, পায় না।—আসে তো!

যাব রে লক্ষ্মী, যাব।

ভোলা গাছতলায় শুয়ে পড়ল,—বসতে পারলে না। উত্তেজনায় বুকটা দপদপ করতে লাগল।

চোখ বুজে আপন মনে ব'লে গেল, "হ্যাঁ, ছিরু তাকে ভাল না বাসলে কি এত বড় কাজ করতে পারে—যে-সে ভালবাসা নয়, উঁহু।"

ধাক্কার মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাকে উপুড় ক'রে দিলে।

একবার চিত একবার উপুড়,—দিন রাত কেটে গেল।

রাস্তা দিয়ে কত লোক এল গেল, কেউ খোঁজও নিলে না।

কেউ বললে, "যত পাপ কি এই গাঁয়েই এসে জোটে!"

সঙ্গী বললে, "এত গুড় আর পাবে কোথা!"

একজন ব'লে গেল "মরবে নাকি! রোগ ছড়াতে আবার কে এল? কামশনাররা কি ঘুমুচ্ছেন?"

"তাঁদের আর কাজটা কি?"

সন্ধ্যা হয়ে আসে, ভোলার পেটে কিছু পড়েনি।

সে মাঝে মাঝে চাইছিল, যদি কোন ভিক্ষুক নজরে পড়ে, কিন্তু কেউ কিছু দেয় না।

* * * *

"কে রে ভাই? আমার অট্টালিকাটাই পছন্দ হ'ল? তা থাক্ থাক্, মস্ত দালান! মাঝে মাঝে এ বাড়িতেও থাক,—এমন অনেক আছে।"

ভোলা চেয়ে দেখে, আপনার জন এসেছে।

লাঠি, পেতলের একটা কানা-ভাঙা ঘটি আর ঝোলা ঘাসের ওপর ফেললে,—একটি ঢ্যাঙা রোগা, মলিন, এক-বস্ত্র লোক। বড় বড় অর্ধ-পাকা চুল-দাড়ি,—আপন মনে গুন গুন করতে করতে উবু হয়ে বসছে।

"এবার রেখেছ বেশ ভাল
সন্ধ্যে হ'লে নিবাও বাতি—
সকাল হ'লে প্রদীপ জ্বালো।

এতক্ষণে ভোলা তার পরমাত্মীয় পেলে। অসঙ্কোচে মৃদুকণ্ঠে বললে, "বাবাজী, খিদে তেষ্টায় ম'রে গেলুম, উঠতে পারছি না। দু দিন পেট কিছু পায় নি, একটু জল যদি খাওয়াও—"

"সে কি! শুধু জল? অতিথি—নারায়ণ—"

ঝোল থেকে দু মুঠো ভিক্ষের চাল ভোলার হাতে দিয়ে বললে, "নারায়ণ লক্ষ্মী তো তোমারই, এবার ঘরে এলেন না, সে তাঁর মরজি। এ পথে লক্ষ্মী ভাই, মাথায় ঠেকিয়ে সেবা কর,—জল আনি।"

ভোলা উঠে বসেছিল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ যে নিজের একতারা,—বে-সুর বলে কি!

বুকটা ঠেলে উঠে মুখটা ফাঁক ক'রে দিলে।

চাল চিবিয়ে এক পেট জল খেয়ে—"আঃ!"

"নাও, পা লম্বা ক'রে শুয়ে পড। বিছানা বালিশ খুঁজতে হবে না লোহার সিন্দুক আগলাতে হবে না, কালকের চিন্তাও নেই। বেশ মেজেছ হরি, রাজা রাজা!"

* * * *

"সকাল হয়েছে। কোন্ রাস্তা ধরবে?"

"বুকে বড় ব্যথা বন্ধু।"

"সেটা তো থাকবেই, তা না তো কি নিয়ে থাকি! ওই তো পুঁজি। ও বইতে যে ওর সুখ রে ভাই।"

"আচ্ছা, তবে দুটি রেস্তো রাখ।"

থলি ঝেড়ে দিয়ে চলে গেল।

উঠতে যে পারছি না। নাঃ, যেমন ক'রে হোক যেতেই হবে।

পরাণ ভাই ঠিক বলেছে, মওকা!

লক্ষ্মী বলে—ভোলা নেই, আমাকে আর কে দেখবে!' উঃ, যাব রে লক্ষ্মী যাব!

অন্যমনস্ক হয়ে ভোলা ভাবতে লাগল, পাটাই কি মানুষের সব!

পা গেল আর সব গেল!

হ্যাঁ, গেল বইকি, রোজগারের যন্তর যে! রোজগার না থাকলে আর রইল কি?

একটা নিশ্বাস পড়ল।

ভোলা বড় কষ্টে পথ চলেছে।

ভাবছে, মনটার চেহারা নেই—কেউ দেখতে পায় না। থাকলেই বা কি হ'ত?

ভোলা একটু হাসলে, ছিঃ, ছক্ক আমার সে দেমাক আর রাখে নি।

সে আর চলতে পারছিল না। পথের ধারে পলাশগাছটা ঠেস দিয়ে জিরুতে লাগল।

আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-ভাঙা পৃথিবীর পরিত্যক্ত জীব। সে-চোখে জগতের কোন জিনিসই আর আগ্রহ জাগায় না। সে বুজতেই চায়।

কতক্ষণ কেটে গেছে।

* * *

"ভোলা না?"

সে চেয়ে বললে, "হ্যাঁ, পিসী।

"ওমা, এ কি চেহারা হয়ে গেছে! এতদিন কোথায় ছিলি—তোকে সবাই খুঁজছে। ছিক তো ঘানি টানতে চলল, পারবে না! মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া, হুঁ! সব শুনেছিস তো, আজ যে মকদ্দমা, ফিরতে আর হবে না। ক্ষ্যামতা নেই, সাধ আছে! চুরি ক'রে সাধ মেটানো! ধম্মে আর নেই! এখন ছুঁড়ী 'ভোলা ভোলা' ক'রে মরছে। একবার [illegible] না হবে তো তখন বলিস—"

ভোলা তাড়াতাড়ি বললে "যাব পিসী।"

"হুঁ, যা। আমি হাট থেকে আসি।"

পিসী চলে গেল।

বুকের বেদনায় আর পথশ্রমে ভোলা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এখনও পাঁচ-পো পথ।

তার চটকা ভাঙল।

হুঁ, যাব বইকি। লক্ষ্মী, যাচ্ছি ভাই, ভাবিস নি।

ভোলা চলল। মন চুপ ক'রে রইল না পিসী বললে, ক্ষ্যামতা নেই সাধ আছে! পিসী বোঝে না।

সাধ আছে তো! আবার কি চাই? সাধ থাকে কেন? থাকবে না?

হুঁ, সাধের জোর যে কত, সেটা কেউ ভাবে না। এই সাধের ধাক্কা খেয়েই তো বাদলে-পোকার পালক বেরিয়ে আসে। আলোর জন্যে সে ছটফট্ করে, ছুটে গিয়ে তাকে পায়, তার পর মরে। পায় তো! না পেয়ে তো মরে না, সাধ তো মেটে!

মরে তো সবাই, মরতে তো হবেই, পেয়ে ম'লেই হ'ল। আবার কি চাই?

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ব্যথা-বোধ কি চিন্তা, মনে আর ছিল না, ভোলা যন্ত্রের মত চলেছে।

যেন গরুর গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়েছে, হাতের লাগাম খ'সে পড়েছে, গরু তা জানে না, জানবার দরকার কি! সে আপনার পা বাড়িয়ে চলেছে।

* * *

বারাকপুরের কাছারির এজলাস-ঘরে আর তার বারাণ্ডায় আজ লোক ধরে না।

বেলা তিনটের পর বীরেন-উকিল শামলা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসি-মুখে বেরিয়ে, ফতের স্ফূর্তিতে আলপাকার পাল তুলে দ্রুত বার্-লাইব্রেরিতে যাবার সময়, যেন জনান্তিকে জানিয়ে গেলেন, বেটা দাগী-চোর, ঠেলেছি ও ঝেড়ে।

পরক্ষণেই লক্ষ্মী এজলাস-ঘরে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

"ও-সব মিছে কথা গো—মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, ও কিছু জানে না, মিছে কথা বলছে তোমরা ও কি করছ ওগো একে, ওগো, এ কি করলে গো—"

ভোলা হাত-কড়ি প'রে বেরিয়ে এল।

লক্ষ্মী মূর্ছা গেছে।

# কালী ঘরামী

১

পূর্বে জাহানাবাদ, রায়না প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চাষবাসের অবসরকালে সদ্‌গোপ, আগুরী, বাগদী প্রভৃতি লোকেরা কলিকাতার নিকটবর্তী ও গঙ্গার তীরবর্তী গ্রামগুলিতে মজুরির জন্য আসিত এবং গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের আশ্রয়ে তাহাদের বহির্বাটিতে থাকিয়া, কেহ ঘরামীর কাজ, কেহ মুটের কাজ, কেহ রেড়ির কলে কাজ করিয়া অর্থোপার্জন করিত। যে ভদ্রপরিবারের আশ্রয়ে থাকিত, তাহারা এক প্রকার সেই পরিবারভুক্তই হইয়া যাইত। তাহাদের পুত্রাদিরাও আসিয়া সেই পরিবারেরই আশ্রয় পাইত। গৃহকর্তাকে বাবা গৃহকর্ত্রীকে মা, কাহাকেও খুড়োমা, কাহাকেও বউঠাকরুণ, কাহাকেও জ্যাঠা-মশাই, কাহাকেও খুড়ো মশাই, কাহাকেও দাদা-মশাই প্রভৃতি সম্বোধনে তাহারা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পরস্পর স্নেহ ও প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়া গৃহস্বামীর সুখ দুঃখের সমভাগী হইয়া পড়িত। কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিত্য সন্ধ্যার পর গিন্নীমার নিকট উপার্জনের পয়সাগুলি রাখিয়া দিত; দেশে ফিরিবার সময় তিনি সেগুলি তাহাদের বুঝাইয়া দিতেন।

কায হইতে অবসর পাইলেই তাহারা আশ্রয়দাতার গো-সেবা, জল তোলা, তামাক সাজা, বাহবাটি পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কায আপন ইচ্ছাতেই করিত; এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া গল্পাদি শুনিয়া ও করিয়া আনন্দ পাইত। বিপদ-আপদে বা ক্রিয়াকর্মের সময় গৃহকর্তাকে কখনও লোকাভাব বোধ করিতে হইত না। তাহারা থাকায় গ্রামে মুটে-মজুরের তো অভাব ছিলই না, তদ্ব্যতীত কাহারও গরু-বাছুর মরিলে বা অন্য কোন আবশ্যক হইলে, কাহাকেও চিন্তায় বা বিপদে পড়িতে হইত না। ফল কথা, তাহারা সমগ্র গ্রামেরই পরিজনমধ্যে পরিগণিত হইত।

এখনও কাহারও কাহারও পুত্র-পৌত্রাদি সেইভাবেই আসে বটে, কিন্তু পূর্বের সেই প্রীতি ও স্নেহ সম্পর্ক আর নাই; এখন আশ্রয়দাতারা বড়বাবু, ছোটবাবু হইয়াছেন এবং আশ্রিতেরা ছোটলোক, ঘরামী প্রভৃতি হইয়াছে। আশ্রয়দাতারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া উপকার করিতেছেন ভাবেন এবং তৎপরিবর্তে বাড়ির কাজগুলা প্রাপ্য হিসাবে জবরদস্তিতে চোখ রাঙাইয়া আদায় করেন বা করিতে

ইচ্ছা করেন, কাজেই তাহারাও এখন ক্রমশ দল বাঁধিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র বাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; বিপদ-আপদে বা আবশ্যক পড়িলে অনেক হাটাহাঁটির পর তাদের সাড়া পাওয়া যায় এবং পয়সা না ফেলিলে কোন কাজই পাওয়া যায় না।

সীতারাম ঘরামী তাহার পুত্র কালীকে একবার সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বর গ্রামে আনিয়াছিল। কালীর বয়ঃক্রম তখন ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। সেই বয়সেই সে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটির সকলের স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল: বাধ্যতা, বিনয় ও কর্তব্যনিষ্ঠায় মাত্র তিন মাস অবস্থিতিকাল মধ্যে, সে সকলেরই ভালবাসার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল।

সে আজ সাত বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে সীতারাম কালীকে আর সঙ্গে আনে নাই, একাই আসিত, তজ্জন্য প্রতিবারেই বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের বাটির সকলেই ক্ষুণ্ণ হইতেন; গ্রামের অন্যান্য লোকেও কালীর সংবাদ লইত। সীতারামের বয়স হওয়ায় এবং শরীর সুস্থ না থাকায়, এবার সে কালীকে পাঠাইয়াছে। কালী এখন কুড়ি বৎসরের যুবা, চক্ষু দুইটি শান্ত ধীর, বদনে যেন বিনয়ের ও দাস্যের একটা সুন্দর আভাস বর্তমান।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় কালী যখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে আসিয়া, কর্তা ও গৃহিণীর পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া, এক পার্শ্বে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল, তখন "এস বাবা এস, এতদিন কি আমাদের ভুলে থাকতে হয় বাবা?" বলিয়া গৃহকর্ত্রী তাহার মস্তকে স্নেহ-হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বোধ হইল যেন, তাঁহারা বহুদিনের পর তাঁহাদের হারাপুত্র ঘরে পাইলেন। বাড়ির সকলের আনন্দ দেখে কে, প্রতিবাসিরাও আসিয়া সে আনন্দে যোগ দিল। তাহার পর "সীতারাম কেন এল না, সে কেমন আছে, মা কেমন আছে, ভায়েরা কেমন আছে, ধান কেমন হয়েছে, আমাদের জন্যে কি আনলে? প্রভৃতি প্রশ্নের আর সীমা রহিল না। গৃহকর্ত্রী সকলকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ও-সব এর পর হবে এখন, বাছার মুখ শুকিয়ে গেছে, অগ্রে খাওয়া-দাওয়া হোক। কালী, পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আগে কিছু খা বাবা।" কালী ধীরভাবে বলিল, "মা, আগে আমি গঙ্গাস্নানটা ক'রে আসি, আমার দেরি হবে না।"

তাহার পর কালী বহির্বাটিতে সীতারামের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া সত্বর তাহা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিল এবং আপনার পিতলের ঘটি ও ছোট

বড় দুইখানি কাটারি, তেল রাখিবার বাঁশের চোঙা, একখানি কাঁথা, একখানি মোটা চাদর ও একখানি আট হাতি কাপড় এবং একখানি ছেঁড়া রামায়ণ গুছাইয়া রাখিল। কিছু সোনামুগের দাল ও পাটালি গুড় আনিয়াছিল, তাহা গিন্নীমাকে দিয়া এবং গেঁজেতে যে দশ আনা পয়সা ছিল তাহা তাঁহার কাছে রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গেল।

মা সেই সোনামুগের দাল ও পাটালি গুড় বহুমূল্য বস্তুর ন্যায়, মহাসমাদরে কালীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন।

## ২

দুই তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে, এখন কালী তাহার কাজ-কর্ম বুঝিয়া লইয়াছে এবং একটা নিত্য-কর্মের পদ্ধতিও ঠিক করিয়াছে। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ভগবানের নাম করে, তাহার পর বহির্বাটির মার্জনা করে, পরে গোয়াল-ঘর পরিষ্কার করিয়া গরু-বাছুরগুলিকে জাব দিয়া এবং কর্তার জন্য এক ছিলিম তামাক সাজিয়া রাখিয়া, দা খানি লইয়া ঘরামীর কাজে যায়। বেলা বারোটার সময় ফিরিয়া আসিয়া গিন্নীমার নিকট গঙ্গাজলের ঘড়া চাহিয়া লইয়া স্নানে যায়। স্নানান্তে স্বয়ং এক ঘটি গঙ্গাজল ও একখানি কলাপাতা কাটিয়া লইয়া, কোন এক ব্রাহ্মণবাড়িতে প্রসাদ পাইয়া আসে। [illegible] তাহার গুণে ও শিষ্টতায় এমন মুগ্ধ ছিল যে, মাসের মধ্যে প্রত্যেক দিনই এক এক বাড়িতে তাহাকে প্রসাদ পাইতে হইত। কর্তা কিন্তু চারিটি বারের বার তাহাকে কোথাও যাইতে দিতেন না, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন।

দুইটা বাজিলে কালী আবার কাজে যাইত এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিত। পরে, প্রদীপ জ্বালিয়া বিচালি কাটিতে বসিত এবং গরুর জাব দিয়া সংসারের আবশ্যকমত জল তুলিয়া দিত। তাহার পর কর্তার নিকট বসিয়া তাঁহার তামাক সাজিত ও তাঁহার নিকট গল্পাদি শুনিত। পৌরাণিক গল্পাদি শুনিবার জন্য সে উন্মুখ হইয়া থাকিত। সকলের আহার হইলে সে গিন্নীমার সহিত গল্প করিতে করিতে প্রসাদ পাইত। পরে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সেই জীর্ণ রামায়ণখানি পড়িত ও চোখের জল মুছিত। বারোটা বাজিলেই শয়ন করিত।

৩

শ্রাবণ মাস, আকাশে মেঘ আর ধরে না, বৃষ্টিরও বিরাম নাই। বৃক্ষ ও গুল্মলতাদির প্রাবল্যে এবং তাহাদের জলভারাক্রান্ত শাখা ও পত্রের অবনত-প্রসারে, ক্ষুদ্র গ্রামখানি যেন ঢাকা পড়িবার মত হইয়াছে। উপরে মেঘগর্জন এবং নিম্নে ভেকের আনন্দ-ধ্বনি, যেন বর্ষার বিজয় ঘোষণা করিতেছে। নিদাঘ-নিপীড়িত পুষ্করিণীর ও পথপার্শ্বস্থ চিরাবদ্ধ পয়ঃপ্রণালীগুলির মলিন জলাবশিষ্ট, আজ তাহাদের সমগ্র মলিনতা ও দুর্গন্ধ ধুইয়া, পুষ্প-পরিশোভিত যৌবন-শোভা কূল ছাপাইয়া লোক-নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছে।

ভট্টাচার্যপাড়ার রাস্তাটি পল্লীর মধ্যস্থল দিয়া যাওয়ায়, গ্রাম্য বধূদেরও সেই পথটি ব্যবহার করিতে হয়। বর্ষার জল-নিকাশের অন্য উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, তখনকার মাতব্বর পল্লীপতিরা ঐ পথের মধ্যস্থলে নালা কাটিয়া, উভয় পার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীর যোগসাধনটাই সুবিধাজনক ভাবিয়াছিলেন। অবশ্য, এটা ভাবেন নাই যে, স্ত্রীলোকদের পক্ষে, বৃদ্ধের পক্ষে, অশক্তের পক্ষে অথবা ঐ হেঁয়ালিটি যিনি অপরিজ্ঞাত তাঁহার পক্ষে উহা বিপদজনক। যাহা হউক, ঐ ব্যবস্থাই আজ দশ-বারো বৎসর গ্রামের বুকের উপর স্থির-প্রতিষ্ঠ থাকিয়া, পল্লীপতিদের অটলত্ব ও স্থিরপ্রজ্ঞত্ব প্রমান করিতেছিল। উহা কত লোকের কত ক্লেশের ও ক্ষতির, এমন কি কত অনিষ্টের কারণ, তাহা বহু ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইলেও, তাহাদের জড়ত্ব বিনাশের কারণ হইতে পারে নাই।

চব্বিশ ঘণ্টাই বৃষ্টি চলিয়াছে, আজ আর সূর্যের মুখ দেখা যায় নাই। পথেও লোক-চলাচল কম। কেবল রায়েদের নব বধূটি বৈকালে এক কলস জল লইয়া ভট্টাচার্যপাড়ার পথ দিয়া গৃহমুখে চলিয়াছেন, এবং কালীও তাঁহার প্রায় একরশি পশ্চাতে একখানি কাটারি হাতে করিয়া আপন মনে কাজে চলিয়াছে।

হঠাৎ একটা শব্দ হওয়ায় এবং পরক্ষণেই কাতরকণ্ঠে কেহ "মাগো" বলায় কালীর চমক ভাঙিল। সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, আমাদের সেই পরিচিত খানাটিতে, অর্থাৎ গ্রামের মুরুব্বীদিগের সেই কীর্তিকুণ্ডটিতে, একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া গিয়াছেন এবং বাম পদটিতে বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। তিনি দুই হাতে বাঁ পা টি টিপিয়া ধরিয়া সেই বেদনা সহ্য করিতেছেন।

কালীর অনেক অনুনয়ে, তরুণী লজ্জা ত্যাগ করিয়া কথা কহিলেন ; কালী বুঝিল, তিনি কাঁদিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁ পাটায় বড্ড বেশি লেগেছে, উঠতে পারবেন না ?" বধূটি বলিলেন, "বড্ড কনকন করছে, বোধ হয় আস্তে আস্তে চলতে পারি, কিন্তু খানার ভেতর থেকে উপরে উঠতে পারব কি না জানি না।" কালী বড়ই কাতর হইয়া বলিল, "মা, আমি আপনার ছেলে, আমার হাত দুটোয় ভর দিয়ে উঠুন।" তরুণীর তাহা ভিন্ন অন্য উপায়ও ছিল না ; একটু ইতস্ততের পর তাঁহাকে তাহাই করিতে হইল।

কালী বলিল, "এইবার ধীরে ধীরে বাড়ি যান।" বধূটিকে জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কালী আবার বলিল, "চলতে পারবেন না কি ?" তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, "কলসী ভেঙে ফেলেছি, আমার যে আজ অদৃষ্টে কি আছে !" শুনিয়া কালীর প্রাণটা বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাঁহার আসন্ন ভবিষ্যৎটা বুঝিয়া লইতে কালীর আর বিলম্ব হইল না, সে বলিল "মা, কাপড়খানায় কাদা লেগেছে, ধীরে ধীরে ধুয়ে ফেলুন—আমি এখুনি আসছি ব'লে।"

কালী কুমারবাড়ি হইতে একটি কলসী লইয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া আনিয়া অবিলম্বেই উপস্থিত হইল এবং তরুণীকে বলিল, "মা, এইবার আপনি চলুন, আমি আপনাদের দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে কলসীটি আপনার কাছে দেব।" বধূটি বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন এবং অস্পষ্টভাবে বলিলেন, "এর পয়সা কি ক'রে দেব ?" কালী বুঝিতে পারিয়া বলিল, "মা, আমি ঘরামীর কাজ করি, আমাদের কি পয়সা লাগে, আমি কলসীটা অমনি এনেছি, আপনি ওর তরে ভাববেন না, আর ছেলের কাছে মার কি কোন দাবি নেই ?" তরুণীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন উপায়ই ছিল না, তিনি একবার কালীর দিকে নীরবে চাহিলেন মাত্র, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বধূটির অবস্থা বুঝিয়া কালীর চক্ষুও অসিক্ত ছিল না।

রায় মহাশয়দের বাড়ির সন্নিকটবর্তী হইয়া, কালী কলসীটি নামাইয়া দিয়া, তরুণীকে প্রণাম করিয়া বড়ই অন্যমনস্কভাবে কাজে চলিয়া গেল। বধূটি কৃতজ্ঞনেত্রে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে মনে মনে ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া অতি কষ্টে কলসীটি কক্ষে তুলিয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৪

আজ কাজ হইতে ফিরিবার সময় কালী এক বোঝা লম্বা লম্বা বাঁচা কঞ্চি মাথায় করিয়া ফিরিল। সন্ধ্যার পর কর্তাকে তামাক দিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প বা ধর্মকথাদি শুনিবার সময়, ছোট কাটারিখানির সাহায্যে সেই কঞ্চিগুলিকে চারখান করিয়া চিরিয়া চাঁচিয়া রাখিল। আহারাদির পর রামায়ণ পাঠ শেষ করিয়া ঝুড়ি বুনিতে বসিল। সেদিন দুই ঘণ্টায় তিনটি ঝুড়ি বুনিয়া শয়ন করিল। পরদিন হইতে কালী যখনই একটু অবকাশ পাইত, ঝুড়ি বুনিত। তাহার নিত্য-কর্মের তালিকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্রমে প্রত্যহ ছয়টি করিয়া ঝুড়ি বুনিতে আরম্ভ করিল।

দক্ষিণেশ্বর হইতে বাজারহাট প্রায় দেড় ক্রোশ পথ। কালী সপ্তাহে একদিন করিয়া বাজারহাটে গিয়া টাকায় বারোটি করিয়া ঝুড়ি বেচিয়া আসিত। প্রথম দিনের ঝুড়ি বিক্রয়ের পয়সা গিন্নীমার কাছে দিবার সময় কালী বলিল, "মা, এ পয়সার জন্যে একটা আলাদা হাঁড়ি ক'রো, এ আমার মজুরির পয়সা নয়,—ঝুড়ি বেচা পয়সা।" গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, আমি যে হাঁড়িতে পয়সা রাখি, তা তুই কি ক'রে জানলি কালী?"

সত্য সত্যই কর্ত্রীঠাকুরাণীর সিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হাঁড়ি থাকিত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের টাকা-পয়সা থাকিত। তিনি স্বয়ং পয়সা গনিতে জানিতেন না, কাহারও কিছু আবশ্যক হইলে হাঁড়ি বাহির করিয়া দিতেন, এবং তাহা হইতে লইতে বলিতেন।

গিন্নীমা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ টাকা বুঝি বে'র জন্যে জমাচ্ছিস? তা বেশ, আমি কিন্তু এতে হাত দিতে দেব না।"

"হাঁ মা, তুমি ওতে আমাকে হাত দিতে দিও না।"—বলিয়া কালী হাসিতে হাসিতে বাহিরে গেল। কালীর বিবাহের ইচ্ছাটা গিন্নীমার নিকট খুবই একটা আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি করিল এবং সে ঢেউ অচিরেই বাটীর প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পাড়ায় ছড়াইয়া পড়িল।

কালীর খাটুনি দিন দিন বাড়িবাই চলিল; সে রাত্রে দুইটার সময় শয়ন করে, আবার পাঁচটার সময় উঠিয়া নিয়মিত কর্মে ব্যাপৃত হয়। বাড়ির বউ-ঝিরা কালীকে তামাসা করিয়া বলে, "দিনরাত খাটুনিতে শরীর থাকবে কেন কালী? শরীর ভাল থাকলে তো বে'।" কালী হাসিয়া বলিত,

"আমাকে ভগবান লোহার শরীর দিয়েছেন, আপনারা আমার জন্যে ভাববেন না।"

যুবতী-মহলে যখন প্রাণের কথা হইত, তখন কালীকে উদ্দেশ করিয়া তাহারা বলিত, "যারা বে'র জন্যে এতটা পরিশ্রম করে, তাদের পরিবারই যথার্থ যত্নের জিনিস হয়, তারাই পরিবারের মূল্য বোঝে।"

কালী আর সে বৎসর বাড়ি গেল না, কর্তাকে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিল এবং পত্র লিখাইয়া দিল যে, এ বৎসর কাজ কর্মের খুবই ভিড় এ সময় যাইলে বড়ই ক্ষতি হইবে। কর্তা বা গৃহিণী কেহই তাহাতে আপত্তি করিলেন না কারণ সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, কালী দক্ষিণেশ্বরেই থাকে এবং তাহারা তাহাকে সর্বদা নিকটে পান। গিন্নীমা কেবল একবার কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "হাঁরে কালী, বে না হতেই যে বাপ মার উপর টান কমালি, বে হ'লে কি করবি রে?" কালী বলিল, "এখানেও কি আমার বাপ মা নেই?" কর্তা গৃহিণীকে বলিলেন, "এবার কি উত্তর দেবে?" গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্যি বলতে কি কালীর ওপর পেটের ছেলের চেয়েও যেন বেশি টান পড়েছে ওটা পরের মুখ বলছিলাম, কিন্তু ও না থাকায় আমরা সবাই দুঃখিত হয়েছি।' কর্তা বলিলেন, একেই বলে ডাইনী।

পূজার সময় বাড়ির অন্যান্য সকলের মত কালীরও নূতন কাপড় চাদর আসিল। বিজয়ার দিন কালী যখন সকলকে প্রণাম করিল, অন্যান্য আশীর্বাদের সহিত গিন্নীমা আশীর্বাদ করিলেন, "বউটি যেন সুন্দর হয়।"

যাহা হউক, কালীর পরিশ্রম কিন্তু দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। সে এখন সামান্য ফুরসৎ পাইলেই ঝুড়ি বোনে, গিন্নীমার কাছে বসিয়া গল্প করিতে করিতেও ঝুড়ি বোনে। কোন কোন জ্যোৎস্না রাতে এমন হইয়াছে যে, ঝুড়ি বুনিতে বুনিতে প্রভাত হইয়া গিয়াছে। সে এখন প্রতি মাসে গড়পড়তা কুড়ি টাকার ঝুড়ি বিক্রয় করে।

কবে যে শীতকাল শেষ হইয়া বসন্তকাল আসিয়াছে, কবে যে আম্রমুকুলের সৌরভে ক্ষুদ্র গ্রামখানি ভরিয়া উঠিয়াছে এবং মধুপগুঞ্জনে ও কুহুরবে চারিদিক মুখরিত হইয়াছে, কালী তাহা লক্ষ্যই করে নাই। সে গত শ্রাবণের যে দিনটিতে ঝুড়ি বোনা আরম্ভ করিয়াছিল, আজিও সেই দিনটিই,—এতগুলি দিনকে ঢাকিয়া ফেলিয়া তাহার চিত্তপটে ও চক্ষের সমক্ষে যেন একটিমাত্র অখণ্ড দিন রচনা করিয়া রাখিয়াছে।

৫

গৃহিণী। শনিবার, চতুর্দশী, ভরসন্ধ্যে বেলা,—ছি ছি, এমন কাজও করে? সৎকার করতে পাঠাবার কি আর লোক ছিল না? তারপর কোন্ হিসেবে তাকে শ্মশানে একলা ছেড়ে এলে?

কর্তা। তুমি কেবল আমার ওপরেই রাগ করছ। সে আমাকে কোন মতেই সেখানে থাকতে দিলে না। তা ছাড়া, বুঝে দেখ না, ও-রকম বিপদের চেয়ে বড় বিপদও আর নেই, ও-কাজটার চেয়ে বড় কাজও আর নেই। কেউ না কেউ তো যেতই।

গৃহিণী। যে যেত সে যেত, বড় কাজে বড়দেরই তো যাওয়া উচিত ছিল।

কর্তা। ভাগ্যে থাকলে তো যাবে? কালীর জন্যে তুমি অত ভাবছ কেন, এতে তার ভালই হবে। তোমরা মেয়েমানুষ ভয়েই মর।

গৃহিণী। যারা যায় নি, তারাও কি সব মেয়েমানুষ নাকি?

কর্তা। মেয়েমানুষের জন্যে মাপ আছে, পুরুষদের জন্যে সেটুকুও নেই।

গৃহিণী। যাও, তুমি একবার তার খোঁজ নিয়ে এস।

এই সময়ে কালী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্তা বলিলেন, "এঃ নাও তোমার কালীকে; কেবল ভেবে মরতেই জান।" পরে কালীকে বলিলেন, "বাবা, তোমার হয়ে বাড়ি সুদ্ধ, আমার ওপর পড়েছে।"

কালী আসিতেই সব মিটিয়া গেল। গত রাত্রে তাহার কিছু খাওয়া হয় নাই, গিন্নি তাহাকে আগে কিছু জল খাওয়াইলেন ও এতক্ষণ পরে এইবার নগেনের জন্য ও তাহার বাপ মার জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কালী তাড়াতাড়ি গরুকে জাব দিয়া কাজে চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মা ঝুড়ির হাঁড়িটেতে ক টাকা হয়েছে, আজ একবার বাবাকে দিয়ে গুনিয়ে রাখবেন তো।" মার আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তখনই বহির্বাটীতে গিয়া কর্তাকে বলিয়া আসিলেন, "আজ সকাল সকাল নেয়ে-খেয়ে নাও। কালীর বে'র কত টাকা জমল সেটা একবার গুনে দেখতে হবে।" কর্তা হাসিয়া বলিলেন, "সকাল সকাল নিতে হবে বইকি, কাজটা তো ছোটখাটো নয়, পুরো এক বেলা নেবে।"

কর্তার আহারান্তে গৃহিণী টাকার হাঁড়িটি আনিয়া হাজির করিলেন।

কর্তা বলিলেন, "তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হোক না, আমিও তামাকটা খেয়ে নিই।"

গৃহিণী। তা কি হয়, তা হ'লে আর বেলা থাকবে না।

কর্তা হাসিতে হাসিতে টাকা গনিতে বসিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পয়সা ও রেজকি বদল করিয়া টাকা গাঁথিয়া রাখিতেন; সুতরাং সহজেই গণনা শেষ হইল। তিনি বলিলেন, পাঁচ শো বাইশ টাকা হয়েছে, আর এই বারো আনা খুচরো পয়সা আছে।" গৃহিণী অবাক হইয়া বলিলেন, "তামাসা ক'রে কাজ নেই, ভাল ক'রে গোন, দু-দু বছরের রোজগার দশ মিনিটের মধ্যে গোনা যায় কিনা!"

কর্তা। তুলে রাখ, ঠিক হয়েছে।

গৃহিণী। ভুল টুল হয় নি তো? ক কুড়ি হ'ল?

কর্তা। একবার বউমাকে দেখিয়ে নিও না, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন এখন। যা হোক কালীর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। নিজের মজুরি ছাড়া পরের হাত খেটে পাঁচ শো বাইশ টাকা রোজগার বড় সহজ কথা নয়। বাজে কথায় সময় নষ্ট না ক'রে সবাই যদি এই রকম করে, তা হ'লে আর দুঃখ থাকে না। দেশের দারিদ্র্যদোষ যায়! কিন্তু একটা কোন উদ্দেশ্য বা সঙ্কল্প না থাকলে, লোকে এমন ক'রে খাটতেও পারে না।

গৃহিণী। বিয়ের চেয়ে আর মানুষের বড় উদ্দেশ্য আছে নাকি? তোমাদের তো আর খেটে বে করতে হয় নি, তাই জান না।

কর্তা। তোমার খাটুনিটে অতিরিক্ত হয়েছিল বুঝি?

গৃহিণী। যাক ও কথা এখন। বলছিলুম কি, অতটা টাকা সবই তো আর বিয়েতে খরচ হবে না, দুশো টাকা রেখে, বাকি টাকাটার এইখান থেকেই দু-একখানা গয়না গড়াতে দিলে হয় না? চণ্ডে স্যাকরা নেউগীদের বউয়ের কি কণ্ঠমালাই গড়েছে! ওদের দেশে কি আর তেমনটি পাবে?

কর্তা। এ দেশের গয়না ওদের দেশে চলবে না তো।

গৃহিণী। কেন?

কর্তা। ওদের দেশে তাকে যে ঠাকুরের সাজ বলে। যাও, এখন খাও গে, ও সব কথা কালী এলে ব'লো মনে থাকবে তো—পাঁচ শো বাইশ টাকা।

গৃহিণী "বউমা, শুনে রেখো গো" বলিয়া টাকাগুলি আবার তুলিয়া রাখিলেন। কর্তা বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

৬

কালী সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিলে, গিন্নীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে কালী, অত টাকায় দুটো বে হয়।"

কালী। কত টাকা মা?

গিন্নীমা। ঐ যে কত বললে, বল না বউমা! হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁচ শো বাইশ টাকা। তা বাপু, আমার একটা কথা রাখতে হবে।

কালী। দুটো বিয়ে করতে হবে নাকি মা?

বউমা অন্তরাল হইতে বলিয়া দিলেন, তাহা শুনিয়া গিন্নীমা বলিলেন, "সে তো বেশ হবে, এক বউ দেশে থাকবে, আর এক বউ এখানে থাকবে। না বাবা, সে বড় জ্বালা, সে কাজ নেই। আমি বলছিলুম কি, অত টাক সব তো আব বে'তে লাগবে না। আমাব ইচ্ছে, এখান থেকে দু একখানা ভাল গয়না গড়িয়ে দিই।"

কালী। মা, সে যখন বে হবে, আমি তখন টাকা এনে দেব, আ' নাদেব যেমন ইচ্ছে গড়িয়ে দেবেন। সে টাকা দেশে বাবা তুলে রেখেছেন, কেবল আমি রাজি হই নি ব'লেই আজও বে দেন নি। সে টাকা আমাকে রোজগার করতে হবে কেন মা?

গিন্নীমা। তবে এ টাকা কিসেব?

কালী। ও টাকা আমাব নয় মা, ও একটা মানত আছে তাবই জন্যে।

গিন্নীমা। বলিস কি বে কালী, আমরা আজ দু বছব ধ'বে আশা ক'রে রয়েছি, আজ এ কি কথা বলিস! আব এই দু বছব না খেয়ে না ঘুমিয়ে যে অস্থিচর্মসার হ'লি, সে কি এরই জন্যে! এমন জানলে কি আমি তোকে শরীর পাত করতে দিতুম! কেবল, বউ আসবে ব'লে কিছু বলি নি।

কালী। আচ্ছা মা বউ এলেই তো হ'ল। ঐ টাকাটা দিয়ে ব' না, আনলে কি বউ আনাটা মঞ্জুর হবে না?

ইত্যাদি কথাবার্তার পর কালী বহির্বাটীতে কর্তাবাবার কাছে গেল। অন্তঃপুরিকারা কিন্তু বড়ই উৎসাহভঙ্গ হইলেন।

৭

যদুবাবু সেকালের ওভারসিয়ার। তিনি নিত্যই সন্ধ্যার পর বাঁড়ুজ্জে মশায়ের নিকট বেড়াইতে আসেন। উভয়ে বাল্যবন্ধু; নিত্য দু-এক ঘণ্টা একত্রে না কাটাইলে, উভয়েই কষ্ট বোধ করেন। তিনিও কালীকে বিশেষ ভালবাসেন।

যদুবাবু আসিবার পূর্বেই কালী গিয়া কর্তাবাবার তামাক সাজিতে বসিল। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় সেই মাত্র গিরিশ ঘোষের বাড়ি হইতে ফিরিয়াছেন, অনেক কষ্টে তাহাদের কিছু আহারাদি করাইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আহা, ছেলেটা যেন উবে গেল, একমাত্র পুত্র, খুবই লেগেছে, লাগবারই কথা।"

কালী। বাবা, আমাদেরই লেগেছে, তা বাপ-মার লাগবে তাতে আর আশ্চয্যি কি! ও-কথা আর মনে আসতে দেবেন না, সংসারে কোন দিনই ও কষ্টের শেষ নেই।

কর্তা। আজ ওই কথা ভেবে ভেবে, আর যেখানে যাই ওই কথা ক'য়ে ক'য়ে, মনটা যেন অবসন্ন হয়ে রয়েছে। যদু এলে বাঁচি, দু-একটা অন্য কথা হয়।

কালী। আপনি অভয় দেন তো আমি একটা কথা বলি বাবা।

কর্তা। কি এমন কথা কালী যে, অভয় দিতে হবে! আমি অন্য কথাই তো খুঁজছি, তুমি স্বচ্ছন্দে বল বাবা।

কালী একটু ইতস্তত করিয়া অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল, আপনাদের না ব'লে একটা কাজ করেছি, তার জন্যে মাপ করতে হবে বাবা। আগে আমি সবটা ব'লে হালকা হই, তারপর আপনি অনুমতি করবেন।

কর্তা। আমার কাছে বলতে অত ভীত হচ্ছ কেন কালী, তুমি তো কোন মন্দ কাজ করবার ছেলে নও বাবা।

কালী। বাবা, কথাটা আমার উপযুক্ত নয় ব'লেই কুণ্ঠিত হচ্ছি।

কর্তা। দেখ বাবা কালী, ভগবানের রাজ্যে মানুষ কি আর ছোট-বড় আছে,—এই মানুষই রাজা হয়, এই মানুষই বিদ্বান হয় এই মানুষই ইচ্ছায় সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়। তুমি আবার উপযুক্ত নও কিসে?

কালী। দেখুন বাবা, ভটচায্যি-পাড়ার রাস্তার মাঝখানে ঐ যে জল-নিকাশের একটা বড় নালি আছে, তার জন্যে সব সময়েই লোককে বড় কষ্ট পেতে হয়, বিশেষ রাত-ভিতে আর বর্ষাকালে—

কর্তা। উঃ, সে কথা আর ব'লো না, কত ছেলে-মেয়ে যে ওতে প'ড়ে হাত-পা ভেঙেছে, কত বুড়ো বুড়ী জখম হয়েছে, তার আর ঠিক নেই। ও কথা কতবার তুলেছি, কিন্তু কেউ কান দেয় না, কাজেই ওটা যেন গ্রামের কলঙ্কের মত র'য়েই গেল।

কালী। তাই আজ দু বছর থেকে ভগবান ইচ্ছে দিয়েছেন যে, ওর ওপরে একটা পোল হয়; সেইজন্যেই বাপা ঝুড়ি বুনতুম। তা ঐ টাকায় হতে পারে না কি?

বাঁডুজ্জে মশাশয় সস্নেহনয়নে কালীর মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, কালী, এ তোমার নিজের গ্রাম নয়, এর সঙ্গে দু দিনের সম্পর্ক, তা ছাড়া পাঁচ শো বাইশ টাকাও তোমার পক্ষে অল্প টাকা নয়। যদি একান্তই ওই টাকায় সাধারণের উপকার হয় এমন কোন কাজ করতে চাও তো সেটা নিজের গ্রামেই করা ভাল নয় কি? সেখানেও তো অনেক অভাব আছে।

কালী। নিজের আর পরের ব'লে তো আমার একবারও মনে হয় নি বাবা। নয় সবই নিজের, না হয় কোনটাই নিজের নয়—সবই ভগবানের, আমি চাকর বই তো না। আপনিই তো কতবার এ কথা বলেছেন তাঁর হুকুম না এলে এ ইচ্ছে এল কি ক'রে? আমার তো বাবা বারবার মনে হয়, এর আগাগোড়াই তিনি, আমার সম্পর্কই নেই।

কর্তা। আমার বলবার মানে এই যে, এ গ্রামে তো ধনী মাতব্বরেরা আছেন, একদিন না একদিন তাঁদের নিদ্রা ভাঙত। তোমার এ কষ্টের টাকাটা—। যাক, তোমার এ শুভ সঙ্কল্পে আমি আর বাধা দিতে চাই না, কিন্তু ভগবানের হুকুমটা কি ক'রে এল কালী?

কালী তখন দুই বৎসর পূর্বের সেই শ্রাবণ মাসের বৈকালে ভট্টাচার্য-পাড়ার পথিমধ্যস্থ সেই নালার মধ্যে রায় মহাশয়ের বউমার পতন, তজ্জনিত আঘাত ও যন্ত্রণা এবং কলস ভগ্ন হওয়ার তিরস্কার ও গঞ্জনার ভয়ে তাঁহার সকাতর অসহায় অবস্থাটি সংক্ষেপে বর্ণন করিল। কালী আরও বলিল, "সে সময় পথ জনশূন্য, তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে কাজে যাবার সময়, তাঁর যুগপৎ

পতন ও আঘাত এবং ভয় ও যাতনা-জড়িত 'মাগো' শব্দ, আমার মনে হতে লাগল আর প্রাণটা কেমন করতে লাগল,—আমি কেঁদে ফেললুম; মনে হ'ল, এর কি আর উপায় হয় না? প্রাণের ভেতর কে যেন বললে, হবে না কেন? করলেই হয়! সেই আমার ভগবানের হুকুম। তখনি ঝুড়ি বুনে বেচবার মনস্থ করলুম, আর সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ফেরবার সময় এক বোঝা কঞ্চি কেটে আনলুম! তারপর সবই তো জানেন।"

বর্ষার ধারা-সিক্ত বৃক্ষকে যেমন সামান্য নাড়া দিলে ঝরঝর করিয়া জল পড়ে, কালীর কথা শুনিয়া ও তাহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া, বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া সেইরূপ ঝরঝর করিয়া জল পড়িল। পরিপূর্ণ হৃদয়াবেগে তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, কালীর মস্তকে কম্পিত হস্তটি রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমার আশীর্বাদের কোন মূল্যই নেই। ভগবান তোমাকে কৃপা করুন।"

কালী তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "বাবা, এখন এ কাজটি আপনাকে করিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তার মধ্যে আমার নাম বা আমার কথার গন্ধও থাকবে না। বর্ষা এসে পড়বে, খুব শীগগিরই যাতে হয়, তা করতে হবে বাবা।"

কর্তা। কার টাকা, কে করছে—লোকে জিজ্ঞাসা করলে কি বলব?

কালী। আর যা ইচ্ছে হয় বলবেন, কেবল আমার উল্লেখ না হয়। তবে একটা কথা থাকবে—পোল যখন তোয়ের হবে, আমিও তাতে যেন একজন মজুর হয়ে কাজ করতে পাই।

কর্তা। যদুকে তো লুকুতে পারব না, সে আমার বাল্যবন্ধু; সে তা হলে বড়ই ক্ষুণ্ণ হবে। তা ছাড়া এ কাজে আগাগোড়াই তার সাহায্য নিতে হবে।

কালী। তাঁকে যদি বলতেই হয়, স্বীকার করিয়ে নেবেন, তিনি যেন আর কারও কাছে আমার নাম না করেন।

উভয়ের কথা শেষ না হইতেই—যদুবাবু যেমন নিত্য আসেন, তেমনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কালী তামাক সাজিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

তামাক খাইতে খাইতে এ-কথা ও-কথার পর বাঁড়ুজ্জে মহাশয় যদুবাবুর নিকট উক্ত নালার কথা উত্থাপন করিলেন ও তাহার উপর প্রথম শ্রেণীর মাল-মসলা দিয়া একটি পোল নির্মাণ করিতে আন্দাজ কত টাকা পড়িতে পারে এবং ন্যূনাধিক কতদিনে যদুবাবু তাহা করাইয়া দিতে পারেন, ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন।

যদু। বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? এ গ্রামের জড়বিগ্রহবৎ বাক্‌বিজ্ঞেরা থাকতে কস্মিনকালেও যা হবে না, সে কথায় সময় নষ্ট করা কেন? নিজে কোমর বাঁধতে পার তো কাগজ-কলম দাও, এখনি সব ঠিকঠাক ক'রে ব'লে দিচ্ছি। ওসব তো আমার চোখের সামনে রয়েছে; ওর মাপ-জোকও মুখস্থ রয়েছে, টাকা খরচ করতে কেউ রাজি হয় তো নিজে গিয়ে দু-তিন দিনের মধ্যে মজুরী নিয়ে, বিশ দিনের মধ্যে পোল তোয়ের করিয়ে দিতে পারি। নিজের ক্ষমতা নেই, কিন্তু জিনিসটে এত দরকারী যে, যদি কোন হৃদয়বান লোক রাজি হয় তো ওর সব খাটুনির ভার নিতে রাজি আছি। কিন্তু আজ দশ-বারো বছরের মধ্যে তো একটিও তেমন লোক দেখলুম না। কথাটা যেখানে পেড়েছি, সেইখানে হতাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে। একজন লক্ষপতি—নামটা আর করব না—বলেছিলেন, 'যদুবাবুর যে খুব দয়ার শরীর দেখছি; যদি এতই কষ্ট হয়েছে তো নিজেই ক'রে দিন না।' তাই বলছি, ও-প্রসঙ্গে ফল কি?

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় তখন ধীরে ধীরে যদুবাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং কালীর অনুরোধটি জানাইয়া সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকিতে বলিলেন।

যদুবাবু কিছুক্ষণ নির্বাক-বিস্ময়ে থাকিয়া বলিলেন, "বল কি? উঃ মানুষে ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে—কেবল হৃদয়টা থাকা চাই। টাকা থাকলেই বড় হয় না।" একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "কথাটা সত্যি তো?"

বাঁড়ুজ্জে। বল তো টাকাটা তোমার হাতে এনে দিই।

যদু। কাগজ-কলম দাও।

সেই রাত্রেই যদুবাবু একটা নক্‌শা এবং মাল-মসলা ও টাকার হিসাব ঠিক করিয়া দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিলেন এবং নিজে সকল ভার লইলেন।

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় রাত্রে আহারে বসিলে গৃহিণী মুখ ভার করিয়া দুঃখ ও তিরস্কার-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আমার কথা তখন তোমার তো ভাল লাগে নি, এখন তার ফলটা হাতে হাতে দেখতে পেলে?"

কর্তা। কিসের কথা?

গৃহিণী। আমার মাথার কথা, আর কিসের কথা! কালীকে ও-কাজে পাঠিয়ে এখন তাঁর মতলব-টতলব কি হয়ে গেল দেখ দিকি! ছেলেমানুষকে কখনও শ্মশানে-টসানে পাঠাতে আছে, তার আর সংসার-ধর্মে মন থাকতে পারে কি? কত শক্ত সমর্থ লোকই বিবাগী হয়ে যায়!

কর্তা। ওঃ, সেই কথাটা। তুমি পাগল হ'লে দেখছি!

গৃহিণী। তা তোমাদের হাওয়া পেলে পাগল হওয়াটা আশ্চয্যি নয়। ছেলেটা পাগল না হ'লে আর পাঁচশো বাইশ টাকা মানত করেছি বলে! আবার কে কোন্ রাজ্যিতে শুনেছে?

কর্তা সহাস্যে বলিলেন, "কালীর বে হ'লেই তো হ'ল। বেশ কথা, ও থেকে টাকা নিয়ে তোমাদের যেমন ইচ্ছে দুখানা গয়না গড়াতে দাও।"

গৃহিণী। ওরে দুষ্টু ছেলে! আমাকে কেমন বোকা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়ে তোমার কাছে বুঝি পেটের কথা খুলেছে! তাই তো বলি, পুরুষমানুষ আবার বে করতে চায় না।

কর্তা। রামঃ, সেটা কেবল মেয়েমানুষেই চায় না।

অন্তঃপুর এতক্ষণ যেন শব্দ ও শ্বাস রোধ করিয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কর্তার কথায় আশ্বাসের ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

৮

মাতব্বরেরা বিনা প্রতিবাদে পোলটা হইতে দেন নাই। প্রথম আপত্তি—তাঁহাদের মতামত, পরামর্শ ও সম্মতি লওয়া হয় নাই, দ্বিতীয় আপত্তি—প্রথম শ্রেণীর মাল-মসলা ভিন্ন ওরূপ একটা জলনিকাশের পথ হইতেই পারে না, তৃতীয় আপত্তি—স্থায়ীভাবে ওই স্থানে জলনিকাশের পথ রাখিলে ভাবি-কালে গ্রামের কোন অনিষ্ট আছে কি না এবং চতুর্থ আপত্তি—যে করিয়া দিতেছে, তাহার কোন দাবি-দাওয়া ও স্বার্থ আছে কি না, ইত্যাদি। যাহা হউক, যদুবাবু বিচক্ষণতার সহিত সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া কার্যটি সুচারুরূপে সমাধা করিয়া দিলেন, এবং মজুরদের মধ্যে কালীও একজন মজুর থাকায় কোথাও কোনরূপ খেলো কাজে বা খেলো জিনিস চালাইবার সুযোগও হইতে পায় নাই। পঁচাশী বৎসর গত হইলেও সেই তৃণাদপি সুনীচ কাঙালের হৃদ্‌পিঞ্জরে গঠিত পথিক দরদ-প্রয়াসী পোলটি আজিও অক্ষুণ্ণ-ভাবে থাকিয়া আপনার কর্তব্য পালন করিতেছে।

# দাদার দুরভিসন্ধি

নিরঞ্জন ঘোষালের বাড়ি বেলঘরে। তিনি গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করতেন। অঙ্ক-বিদ্যায় তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল।—শুভঙ্কর ঘোষাল বললেই সকলে তাঁকে বুঝে নিত, তাঁর কাছে বুদ্ধি নিতে আসত। পণ্ডিতি ক'রে আর বুদ্ধি বিতরণ ক'রে সংসার চলত মন্দ নয়।

দুটি ছেলে—জগৎ আর শশীকে ইংরেজী পড়িয়ে আর তার সঙ্গে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি মিশিয়ে মানুষ ক'রে তোলবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল। জগৎ ম্যাট্রিক পাস করলে বটে, কিন্তু হিসেবে আর বুদ্ধিতে বাপের প্রিয় হতে না পেরে একটি চাকরি যোগাড় ক'রে আগ্রায় চ'লে গেল।

ঘোষাল মশাই বলতেন, "জগৎ কেবল একটা নিরীহ জেণ্টেলম্যান হয়ে গেল, তাতে সংসার কি সমাজের কোন উপকারই হয় না, আর দশজনের মত বাজে জিনিস হয়ে রইল।"

* * *

শশী দিন-দিন শশিকলার মত বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে উৎপাত-অশান্তিও বাড়তে লাগল। পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল শশীর দলই দখল ক'রে রইল। ঘোষাল মশাইকে কেউ কিছু জানালে, তিনি বলতেন, "ভুলে গেলে চলবে কেন গো, ও-বয়সে সব ছেলেই ও-রকম ক'রে থাকে। ওটা চিরকেলে নিয়ম, ওতে বুদ্ধি খেলে কত! ও না থাকলে বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর হতেন না। যে-সব ছেলের বুদ্ধি খেলে না, তারাই বাড়ি থেকে নড়ে না। ওটা দরকার, ওতে বাধা দিতে নেই। আচ্ছা, আমি বারণ ক'রে দেব, কিন্তু দেখে নিও, ও শুনবে না।"

ক্রমে ওই চিরকেলে নিয়মে বুদ্ধি খেলাতে খেলাতে শশী কৈশোরে পৌঁছে গিয়েছে, ইস্কুলেও ফার্থ ক্লাসে উঠেছে। শশী যে ক্লাসে ঢোকে, তা থেকে নড়তে চায় না। বিধু মাস্টারের খুব প্রিয়, তিনি পড়া দেন, পড়া নেন না। সর্বদা তাকে এ-কাজে ও-কাজে ইস্কুলের বাইরেই থাকতে দেন, কারণ সে ক্লাসে থাকলে অন্য ছেলেগুলির কিছু হবে না, এই তাঁর ধারণা। অথচ তাকে প্রমোশনও দেন, বলেন, "ও বুদ্ধির জোরে 'মেক অপ' ক'রে নেবে।"

তাঁর উদ্দেশ্য, সত্বর তাকে ডগায় ঠেলে দিয়ে ইস্কুলের বার ক'রে দেওয়া, নচেৎ নবাগত ছেলেদের কিছু হবে না। বাড়িতে বাপ তাকে গণিত শেখান, বলেন, 'গণিত যার জানা আছে, তার কাছে আর সব তো জলবৎ—বুদ্ধি বাড়াতে এমন বিদ্যে আর নেই।" শশীর লেখাপড়াও জলবৎ হয়ে চলল।'

ঘোষাল মশাই শশীকে নাবালক রেখেই ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেলেন, অবশ্য শশীকে তাঁর বুদ্ধিটুকু যথাসম্ভব দিয়ে, এবং বড় ছেলে জগৎ যে মানুষ হয় নি—এই দুঃখ নিয়ে।

জগৎ সপরিবারে আগ্রা থেকে এসে পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করলে। শশীর ইচ্ছা ছিল, পঞ্চাশের বেশি খরচ না করা হয়। জগৎ তা পারলে না, আড়াই শো প'ড়ে গেল।

গ্রামের সকলে বললে, "জগৎ করবে বইকি, তার সময় ভাল মানসম্ভ্রম বজায় রেখেই করেছে।"

পশুপতিবাবু জ্ঞাতি খুড়ো, তিনি বললেন, "তা করুক না, তবে শশী নাবালক, তার শেয়ার থেকে না গেলেই হ'ল।"

শশী বল পেয়ে বললে, শর্মা পঁচিশের বেশি এক পয়সা দেবেন না।"

পশুপতিবাবু বললেন, "তা পার তো বলব বাপের বেটা, তিনি বাজে খরচের বিপক্ষে চিরদিনই ছিলেন। একদিন ভাগ-বাঁটরা হবেই, তোমাদের এক অন্ন জগতের রোজগার ব'লে আলাদা কিছু থাকতে পারে না। যা-ইচ্ছে খরচ সে করতে পারে না। অর্ধেকে তোমার পুরো দাবি রয়েছে। আমি ন্যায্য কথাই কব।'

শশী মনে মনে দৃঢ় হয়ে রইল।

আগ্রায় ফেরবার আগে জগৎ শশীকে বললে, "একটু খেটে কোন প্রকারে ম্যাট্রিকটা পাস ক'রে ফেল ভাই। তা হ'লেই আমি সাহেবকে ধ'রে তোমাকে একটা কাজে বসিয়ে দিতে পারব।" জগৎ চ'লে গেল।

শশী একটু মুচকে হেসে মনে মনে বললে, "হুঁঃ, আমি খেটে এন্ট্রেন্স পাস করি, আর উনি কর্তামি ক'রে বাহাদুরিটা নিন! এত মুখ্খু শশী নয়। খাটব আমি, পাস করব আমি, আর নাম কিনবেন উনি; যদিও করতুম, এই খতম।'

২

পিতার মৃত্যুর পর সংসার দেখবার ভার নিলে শশী, আর বড় ভাই জগৎ আগ্রা থেকে মাসিক পঁচিশ টাকা পাঠাতে লাগল। তখন গ্রামে পঁচিশ টাকায় দু তিনটি লোকের ভালই নির্বাহ হ'ত।

কিন্তু জ্ঞাতি পশুপতি খুড়ো বললেন, "তুমি যে-রকম বুদ্ধিমান হিসিবী ছেলে, ওই পঁচিশ টাকাতেই ডাল-ভাত খেয়ে কাটাতে পারবে, আমাদের সাধ্য কিন্তু ছিল না। জগৎও যদি ওই রকম সমঝে চলে, তা হ'লে আর ভাবনা কি, যথেষ্ট টাকা হুড়হুড় করে জ'মে যাবে। আমরা তো জানি, ওসব আপিসে পাওনা-গণ্ডা বেশ আছে। তা ছাড়া পশ্চিমে সবই সস্তা গণ্ডা। সেখানে ক টাকাই বা সংসার-খরচ লাগে। কাশী গিয়ে তো দেখে এসেছি। তবে জগতের ঠিক ঠিক আয়টা তোমার জানা থাকলে তোমার মনটায় বল থাকে। সে আর কি ক'রে জানবে ?"

শশী বললে, আমিও শুভঙ্কর ঘোষালের ছেলে, দেখুন না, এক চালে সব বার ক'রে নিচ্ছি।"

খুড়ো সস্নেহে বললেন, "তোমার ওপর ভালবাসা আর বিশ্বাস আছে ব'লেই সব কথা কই—তুমি পারবে। তবে বাবুরা স্ত্রীটিকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে বাড়ির কথা ভুলে যান তখন অনাবশ্যক চাকর-দাসী পোলাও-কালিয়া ঘি-দুধ-রাবড়ি না হলে চলে না। তাই এক-একটি কুপো ব'নে যেতে দেরিও হয় না। দয়া ক'রে দেশে আসেন কেবল মেয়ের বিয়ে দিতে। মনে ক'রো না সেরেফ জল-হাওয়ার গুণে অমন শরীব হয়। বাংলা দেশে জল-হাওয়ার অভাব নেই, বরং অতিরিক্তই আছে। য ক, খ্যাটের আর বিলাসিতার খরচ কি এখান থেকে ধরা যায় ? এ তো তোমার বাড়ির গাছের ঝিঙে-ভাতে খেয়ে থাকা নয়! ভরসা কেবল হিঁদুর ছেলের ধর্মজ্ঞান, ছোট ভাইকে কি আর পথে বসাবে ?"—

শশী বাধা দিয়ে বললে, "বাবা বলে গেছেন, 'খবরদার, বিষয়-কর্মের মধ্যে ধর্মচিন্তা যেন স্পর্শ না করে—অতবড় মুখ্‌খুমি আর নেই। ওটা স্ত্রী-আচার ব'লে জেনে রেখো। গজ-হিসেবে যাঁরা টিকি রাখেন, আদালতে ধর্মসাক্ষী ক'রে কিছু বলবার সময় মতলবের আর সুবিধের কথাই তাঁরা কন। ধর্ম স্বর্গে নিয়ে যেতে

পারে, মর্ত্যে কিন্তু ডোবায়। ওটা নির্বোধের জন্যে।' আমার জন্যে দাদার ধর্মভাব আসবে ভাবেন ?"

খুড়ো হুঁকো রেখে উঠতে উঠতে বললেন, "যাক, আমি নিশ্চিন্ত হলুম। ঘোষালদা তোমাকে কিছু ব'লে যেতে বাকি রাখেন নি দেখছি ; ওই সঙ্গে আমারও কর্তব্য কমিয়ে দিয়ে গেছেন। তার কাছে যে মানুষ হয়েছে, তার আর মার নেই।"

শশী দাদাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে খরচ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলে। শেষ বললে, "কোন ব্যাঙ্কে কত জমা আছে এবং কোন্ কোম্পানীতে কত টাকার জীবন-বীমা করা হয়েছে,—আমাদের দুজনেরই সব জেনে রাখা উচিত। কারণ, কে কখন আছে বা নেই তার স্থিরতা নেই - বাবা এ কথা সর্বদাই বলতেন। আরও বিশেষ ক'রে বলতেন, স্ত্রীবুদ্ধিতে চললে পুরুষ পৌরুষ খোয়ায়, অধঃপতিত হয়।"—ইত্যাদি।

* * * *

শশীর যে কথা সেই কাজ। সে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করলে। কারণ, দরকারী যা-কিছু তা শেখা হয়ে গিয়েছে। বাপ তাকে হিসেবে পাকা ক'রে দিয়ে গিয়েছেন, সুদ-কষা পর্যন্ত। ইংরেজী যা শেখা হয়েছে, তাতে চাকরি আটকায় না : চিঠিপত্র সাহেবরাই লেখে—বাবুদের কপি করা কাজ।

বিধু মাস্টার সানন্দেই তার সব কথা সমর্থন করলেন। বললেন, "যাদের নষ্ট করবার টাকা আছে তারা চিরদিনই পড়ুক না কেন, তা না তো আমাদের চাকরি থাকবে কেন ? তোমার সঙ্গে তো সে কথা নয়, তুমি আমাদের নমস্য ঘোষাল মশাইয়ের ছেলে। যা শিখেছ, ও' গেরস্থের ছেলের জন্য যথেষ্ট। ওর ওপর গেলেই—কবিতা লেখা আর কাগজে জেঠামি করা বাড়ে বই তো না। তোমাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে আমি পাপ বাড়াতে পারব না। লেখাপড়া যদি জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে হয়, আর ঘোষাল মশাইয়ের বুদ্ধির যদি এক কাঁচ্চাও পেয়ে থাক তো কোনও মাড়োয়ারী বাচ্চাও তোমাকে ঠকাতে পারবে না - এ আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। আর যদি রোজগারের কথা তোল, পশুপতিবাবুর কাছে শুনেছি, জগৎ বেশ দু টা কামাচ্ছে। তোমার চার দিকে চটকলের কুলি আর কন্যাদায়গ্রস্ত কেরানী, সেই টাকা আনিয়ে মোটা সুদে ছাড়লে একটা হৌসের মুচ্ছুদ্দির মোটা রোজগার ঘরে ব'সেই করতে পারবে।

হিসেব যখন হাসিল করেছ, তোমার আবার ভাবনা কি, টাকা লাফিয়ে বাড়বে। বুদ্ধির 'টেস্ট্' টাকা রোজগারে।"

বিধু মাস্টার প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন। ইস্কুলটা যেতে বসেছিল, তাঁর দুশ্চিন্তা গেল।

পাঁচজনকে হাতে রাখা চাই। শশী বার-বাড়িতে অপেরার রিহার্সেল বসিয়ে দিলে। নানা পক্ষী এক বৃক্ষে এসে জুটল। গ্রাম সরগরম। শশী বাঁয়া তবলা বাজায়। বন্ধুরা বলে, হাত বড় মিঠে। পথে বেরিয়ে বলে, "কন্ধকাটা -'লেই ভাল ছিল, মাথা-নাড়ার চোটে তিন হাতের ভেতর কারুর ঘেঁষবার জো নেই। আবার ও-চেহারায় পার্ট দিয়ে যে এড়ানো যাবে তার উপায়ও নেই।"

মূলোজোড়ে অভিনয় ক'রে এসে শশীকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। কোনও ওষুধেই তা বাগ মানলে না। শেষ রক্তমাংস সব গুড়িয়ে পেট-জোড়া পিলেতে দ'ড়াল। পেট আর কান দুটিই লোকের নজরে পড়ে।

পশুপতি খুড়ো এসে পরামর্শ দিলেন, আগ্রায় জগতের কাছে গেলে এক সপ্তাহে সেরে যাবে, আর শশীর যা-যা জানবার আছে তাও সহজে আদায় হয়ে যাবে, কাজ গুছিয়ে আসতে পারবে।

শুনে শশীর আগ্রা যাবার উৎসাহ বাড়ল। সেই দিনই অবস্থা জানিয়ে জগৎকে পত্র দেওয়া হ'ল। টেলিগ্রাফে টাকা এল। মা, 'ছোটলোকের মেয়ে' সম্বন্ধে অর্থাৎ বড় বধূ সম্বন্ধে বার বার সাবধান ক'রে দিয়ে সাশ্রুনয়নে "এস বাবা" ব'লে শশীকে বিদায় দিলেন।

জগৎ স্টেশন থেকে শশীকে নিয়ে বাসায় পৌছতেই, বড় বউ ছুটে গিয়ে শশীর চেহারা দেখেই কেঁদে ফেললেন।—"এর আগে আমাদের খবর দাও নি কেন ঠাকুরপো?" স্বামীকে বললেন, "আজই সাহেব ডাক্তারকে এনে দেখানো চাই, সাণ্ডেল মশাইও সঙ্গে থাকবেন।"

শশীর চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, পথ্য, রীতিমত চলতে লাগল। ব্যবস্থা সবই প্রথম শ্রেণীর। বড় বউ গৃহকর্ম ত্যাগ ক'রে দিনরাত শশীর সেবাতেই রইলেন। রন্ধনাদির জন্য একজন ঠাকুরকে রাখা হ'ল।

ঔষধে পথ্যে আর সর্বোপরি বড় বউয়ের আন্তরিক সেবা-যত্নে শশী দেড় মাসের মধ্যে সেরে উঠল। এখন চলল শুধু পথ্যের পালা। দিনে-রাতে ছটা ডিম, এক পাউণ্ড লোফ, পাঁচ পো মাংস, এক আউন্স পোর্ট, দুটো লেবু, একটা বেদানা

ইত্যাদি। যেমন যেমন ক্ষুধা বাড়বে, সেই মত পথ্যও বাড়বে।—বড় বউয়ের ইচ্ছা ও আগ্রহ জগৎ ক্ষুণ্ণ করলে না।

শশীর স্বাস্থ্য ও চেহারার দিন দিন উন্নতি দেখে বড় বউয়ের আনন্দ ধরে না। জগতের মুখে কিন্তু দিন দিন চিন্তার চিহ্ন ধরা পড়তে লাগল। বড় বউ আর থাকতে না পেরে একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনলেন, 'সব মিটিয়েও এখনও তিন শো'র ওপর দেনা, তার ওপর নিত্য বাড়তি খরচ তো দু টাকার কম নয়। ভাবছি, আমার সত্তর টাকায় কোন্ দিক সামলাব?"

বড় বউ বললেন, "ও কথা মুখে আনতে নেই, ঠাকুরপোকে যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের। তুমি ভেবো না, আমার খান দুই গহনা কালই বেচে চিন্তামুক্ত হও। শশী ঠাকুরপো লেখাপড়া শিখেছে, হিসেবে সিদ্ধহস্ত, সে শিগ্‌গিরই রোজগারে লাগবে। সংসারের জন্যে তার চিন্তা কম নয়। ... আমাকে আয়-ব্যয়ের কথা সব জিজ্ঞাসা করে। বলে দাদা ব্যাঙ্কে কত রাখতে পেরেছেন, খোঁজ নও দিকি। বাড়াবাড়ি খরচ সব কমানো চাই।

বলে না কি?"—ব'লে জগৎ একটু হাসলে।

বড় বউ বললেন "তবে ছোকরা-বয়স কিনা, ... একটু আছে ... থাক, তুমি ও নিয়ে ভেবো না, যা বললুম তা কালই করা চাই। এই মাসটা বাদে ঠাকুরকে আর রাখব না, ঠাকুরপোরও সেই মত। আমার নরেশকে ইস্কুলে দিয়ে আসা আর নিয়ে আসার জন্যে আর লোকের দরকার নেই, তাই ভান্টা চাকরটাকে তো জবাব দেওয়াই হয়েছে। একা ছকনই সংসারের সব কাজ করতে পারবে।"

জগৎ বললে, "ভাল কথা, ভান্টার হিসেব যে চুকিয়ে দেওয়া হয় নি। সে আজ সকালে এসেছিল।'

"ওর জন্যে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে হিসেব করিয়ে কালই তার পাওনা চুকিয়ে দেব। হিসেবের কাজ ঠাকুরপোর মুখে মুখে।'

'তবে তাই ক'রো, গরিবকে ফেরাফিরি না করা হয়।'

শশী আগ্রায় পৌঁছে পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ্য করছিল, তার তা কেবল অসুখ সারাতে আসা নয়। সে দেখছিল, সাহেব ডাক্তার, ডাক্তার সান্ন্যাল, পেটেন্ট ফুড্, ঔষধ, পথ্য—ফ্রুট্-যুস্, ডিম, সুপ ইত্যাদি। আবার ঠাকুর, চাকর, দাসী, ভাইপো নরেশকে বাড়িতে পড়াবার মাস্টার। সবই তো অনাবশ্যক

খরচ দেখছি! কই, আমাকে তো বাড়িতে পড়াবার জন্যে কোন দিন মাস্টার দরকার হয় নি, তাতে কি লেখাপড়া আটকেছে, না, কম হয়েছে? এত বাড়াবাড়িতে আর টাকা থাকবে কি? ওই সঙ্গে আমাকেও যে ডোবানো হচ্ছে, এক অন্নের টাকা যে! আমার জন্যে যেটা খরচ করা হচ্ছে, সেটা তো ওঁর শেয়ার থেকে যাবে, উনি ওর কর্তব্য করছেন। আমি চাইনি, বলতেও যাই নি। সেরে উঠে আমি সব কাজ ফেলে ন্যায্য খরচের লিস্ট বানাব, তা হ'লেই বাড়তিটা বেরিয়ে আসবে। সেই ধ'রে গোড়া থেকে বোঝাপড়া। হিসেবের কড়ি, বাবা বলতেন, বাঘে হজম করতে পারে না। তার ওপর লাটসাহেবের কথা চলে না। সেরে উঠি আগে।

৭

শশী আর এখন সে শশী নেই, চেহারা ফিরে গিয়েছে। বেলঘরের ফতুয়া দোলাই আর চটি চাকররা পেয়েছে। দাদার পরিচিত দোকানে তার দরাজ অর্ডার চলছে, কামিজ, কোট, চেস্টারফিল্ড, শু—সবই ফার্স্ট ক্লাস দাদার কর্তব্যে কেউ না খুঁত ধরতে পারে! মনেও বেশ স্ফূর্তি দেখা দিয়েছে। আগ্রার বেঙ্গলী থিয়েটার ক্লাবে যায় আসে। পথ্য পূর্ববৎই আছে, কেবল লোফের পরিবর্তে দুধ-রুটি চলছে। বড় বউ দুখানা ক'রে বাড়িয়ে সেটা দু ডজনের উপর তুলে দিয়েছেন। আহারের সময় নিজে কাছে ব'সে গল্প করেন আর শশীর স্বাস্থ্যের ও শরীরের উন্নতি দেখে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেন, 'শাশুড়ী দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।'

আজ শশীর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এলে তিনি বললেন, একটা কাজ ক'রে দেবে ভাই? ওঁর সময়ও হয় না আর হিসেবের কাজে বিরক্তও হন, বলেন, সারাদিন ওই ক'রে এসে আর ভাল লাগে না।"

শশী বললে, "কি, বলই না, কাজটা কি? হিসেবের কাজ কি সকলের আসে! বাবা অ বুঝেছিলেন, তাই তাঁর নামটা বজায় থাকবে ব'লে আমাকে হিসেবে পাকা ক'রে গিয়েছেন। ওটা আমার শখের কাজ, ওই তো খুঁজি। তা না পেয়েই তো ওই আনাড়ী ছোঁড়াদের ক্লাবে গিয়ে বসি। সব একদম বালি-পাউডার-ছাতু, ওরা আবার প্লে করবে! দু-হপ্তা চেষ্টা ক'রে

কেউ জটায়ুর পার্ট করতে পারলে না! দেখিয়ে দিয়ে মুশকিলে পড়েছি, এখন আমাকেই ধ'রে বসেছে। আমারই ভুল, কথায় কথায় একদিন ব'লে ফেলি, 'তরণীসেন-বধে' তরণীর কাটামুণ্ড সাজতে হয়। কাটামুণ্ড 'রাম রাম' বলতে স্টেজের উপর গড়িয়ে বেড়ায়, অডিয়েন্স্ শুম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই ট্র্যাজিক ব্যাপার সইতে না পেরে সব উঠে যায়। তাকে বলে প্লে, ভারি কসরতের কাজ। জটায়ু সাজাও সোজা নয় বউদি। শুধু ডানায় আর ঠোঁটে তিরিশ সের বইতে হয়, ইস্পাতের 'সেট্' কিনা—"

"না ঠাকুরপো, ও তিরিশ সের বোঝা বওয়া হবে না ভাই, কত ভাগ্যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি! ও আর কেউ করুক।"

"কেউ পারলে তো! আমরা কলকেতা-ঘেঁষা ছেলে, একটা কিছু দেখিয়ে দিবে যাব না? ঠোঁট তোয়ের করতে দিয়েছি ইস্পাতের, কেন জান? রাবণকে যখন শূন্যপথে তেড়ে তেড়ে আক্রমণ করব—করতালি বাজাব ওই ঠোঁটেই। তবে না লোক তাক মেরে যাবে। নাম করবে না, তবে আর প্লে কি?"

বড় বউ দেখলেন, হিসেবের গয়া হয়ে যায়। বললেন, "তবে তো দেখতেই হবে ভাই।"

"আলবৎ, তুমি দেখবে না! আমি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, খান্তিবটে দেখো একবার।"

"এখানে কিছুই দেখতে শুনতে পাই না। ভাগ্যে যদি এমন সুযোগ এল, এই সময় পোড়ারমুখো ভাণ্টার মাইনের হিসাবের জন্যে মনে এতটুকু স্বস্তি নেই। সকাল-বিকেল এসে দাঁড়ালে কি কিছু ভাল লাগে?"

শশী হেসে বললে, "কি বিপদ, ও আবার একটা কাজ নাকি? শশী শর্মা শুনেছে কি হয়ে গেছে। তামাক টানতে টানতে সেরে রাখছি সকালেই বেটার নাকের ওপর ধ'রে দিও।"

"আঃ, বাচালে ঠাকুরপো ছক্কন তামাক দেক, আমি কাগজ পেন্সিল বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"এই হিসেবের জন্যে কাগজ পেন্সিল চাই নাকি! কত পাঁজাকালি, পুকুর-কালি খালি-হাতে করলুম, পেন্সিল ছুঁলুম না।—ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব সারলুম, আর এই ইতু-পূজোতে ঢাকের ব্যবস্থা! দেখলে বাবার আত্মা যে স্বর্গে ছি-ছি ক'রে উঠবে।"

শুনে বড় বউ অপরাধীর মত এতটুকু হয়ে গেলেন, বললেন, "আমি কি ক'রে

জানব ঠাকুরপো, উনি যে ধোপার হিসেবটাও কাগজ-পেন্সিল না নিয়ে করতে পারেন না, দেখেছি কিনা। —তাই"

হাসিমুখে শশী সোজা হয়ে বললে, "সে কথা বাবাও জানতেন, তাই না আমাকে তাঁর সব বিদ্যেটুকু দিয়ে দেহ ত্যাগ করতে—। 'নিশ্চিন্তে বলতে পারি না বোধ হয়, বাঁশকালিটে বলতে বলতে তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ও বিদ্যেটা তিনি ভিন্ন বাংলায় আর কারও জানা ছিল না। কি করি, তাঁর ছেলে হয়ে পারব না, তাই বুদ্ধির জোরে—। যাক, সে কথা। এমন আমাকে কেবল ব'লে দাও—ভাণ্ট.র মাইনে ছিল কত, সে ক'দিনের পাবে, গর-হাজরি প্রভৃতি আছে কি না, বাস্।"

বড় বউ এক টুকরো কাগজে সব টুকে রেখেছিলেন, উঠে গিয়ে এনে শশীর হাতে দিলেন।

শশী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "তোমাদের না লিখে বুঝি কোনও কাজ হয় না!" পরে শিস্ দিতে দিতে, যেন 'শণ্ট' করে বাইরে চলে গেল।

বড় বউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

২

ছক্কন তামাক সেজে নিয়ে এল! শশী চেয়ারে ঠেস দিয়ে হিন্দীতে প্রশ্ন করলে, "তাওয়া দিয়েছিস তো হায়?"

ছক্কন "হাঁ হুজুর" বলে সটকার নলটি শশীবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাজ করতে গেল।

চক্ষু বুজে সটকায় মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে শশীর মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডল সহসা আরামের হাসিতে মেঘলা-রাতের জ্যোৎস্নার মত আভা দিলে, এই এক হিসেবেই বউঠাকরুণকে দাদার বিদ্যেটার বহর বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

আত্মপ্রসাদ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে টানটাও দ্রুত দাঁড়িয়ে গেল। টানের প্রথম ঝোঁকটা মিটিয়ে, "বেটার বেশ মিষ্টি হাত তো—সেজেছে খাসা! টানতে টানতেই কাজটা সেরে রাখা যাক।"

বউঠাকরুণের লেখা কাগজখানা হাতেই ছিল।—"সেকেলে সংসারের মেয়ে সবিস্তার সব লিখে রেখেছেন;—কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক, সে জ্ঞান নেই!

প'ড়েই দেখা যাক।"

"আজ মাসের ১৯শে, বেস্পতিবার সন্ধ্যে পৌনে ছয়টার সময় ভাণ্টাকে ব'লে দেওয়া হ'ল, কাল থেকে তাকে আর দরকার নেই। এর মধ্যে তার তিন বেলা কামাই আছে। একদিন সওয়া-দশটা বেলায় এসেওছিল। তা হোক, বেচারাকে যখন ছাড়িয়েই দেওয়া হল, সে সব আর ধ'রে কাজ নেই, কতই বা পাবে! পায় তো মাসে স-পাঁচ টাকা আর সাত আনা জলপানি।

বড় বউ নিজের মন্তব্যসহ ওই সব লিখে রেখেছিলেন। স্বামী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতেন না। কিন্তু ভাণ্টার ভাগ্যে হিসেবের ভারটা অভাবনীয়ভাবে পড়ল পাকা লোকের হাতে।

পাঠান্তে শশী নিজে নিজেই বললে "তা তো বটেই! কামাইগুলা আর ধ'রে কাজ কি। এই ক'রেই দুজনে মিলে আমার সর্বনাশটা ক'রে আসছেন। কতক যাচ্ছে হিসেব জানেন না ব'লে, আন্দাজে রাউণ্ড সম্ দিয়ে সারেন—বাহবা নেন, অথচ তার আধা-আধি শশীর মুণ্ডে। তার বেলা তো দয়া নেই, যত দয়া ভাণ্টার গরহাজিরার দাম দেবার বেলা। তা আর হতে দিচ্ছেন না শম্মা, তা যতই মেওয়া আর কালিয়া পোলাও খাওয়াও। হিসেবের কড়ি কড়ার গণ্ডায় ক'ষে ধ'রে দেব। এবার আর মুখ্‌খুর হাতে হিসেব পড়ে নি!"

সটকার নলটা তুলে নিয়ে শশী টানের দ্বিতীয়াঙ্ক শুরু করলে। "বাঃ, বেটার হাত কি মিষ্ট,—বাঁয়া-তবলা শেখে না কেন। অনায়াসে আতাহুসেন হ'তে পারত। যাক, নিশ্চিন্ত হয়ে শোয়াই ভাল।"

কাগজখানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে "আঃ, সব মাটি করে । মেয়েমানুষের কাজ কিনা, আসল কথাটাই যে নেই,—মাস কোথায়?—৩০ কি ৩১ কি ২৮শে মাস, জানা চাই তো। তা থাকলে তো হয়েই গিয়েছিল। থাক্, সকালেই হবে, দু মিনিটের মামলা।"

রোগমুক্তির পর বল বাড়ায় স্ফূর্তিও বাড়ে। শশী চেস্টারফিল্ড চড়িয়ে মর্নিংওয়াকে বেরোয়, আধ মাইলের আদেশটাকে তিন মাইলে প্রোমোশন দিয়েছে। ভাইপো নরেশও আজ দুদিন তার সঙ্গ নিয়েছে।

"এসেই চা খেতে খেতে পাপ মিটিয়ে দেওয়া যাবে, মাসটা জানা চাই তো।" উভয়ে বেরিয়ে পড়ল। কথা কইতে কইতে তাজমহলে হাজির।

নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কাদের বাড়ি কাকা?"

"আ মুখ্‌খু, বাড়ি কি রে? বাড়ির কি চুড়ো থাকে?—মন্দির রে, মন্দির

দেখিস নি? এই দিকেই তো হিঁদুর যত দেবতার স্থান। বোধ হয় শাক্যসিংহের বাড়ি। এইখান থেকে নমস্কার কর্।" নিজেও করলে।

ফিরে এসে দেখে, ভাণ্টা হাজির। বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমার কি রাত পোয়াতে তর সয় নেহি? একটু বইসো। চা খাকে দিচ্ছি। হাঁ, কি মাস মনমে হ্যায়, বলতে পারতা? তা হ'লে দাঁড়কে দাঁড়কে সেরে দেতা।"

"ফেরবুয়ারি হুজুর।"

শুনে শশী আপনা-আপনি উচ্চারণ করলে, "February has 28 days।"

নরেশ নিজের বই গুছিয়ে নিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছিল। শুনতে পেয়ে বালক বললে, "না কাকা, twentynine। এ-বছরটা leap year যে।"

"ওঃ, Leap year, আচ্ছা—no fear।"

ছক্কন চা এনে দিলে। তাকে তামাক দিতে বলা হ'ল, তেইয়া দেকে কালকো মতন সাজনা।"

চায়ে চুমুক দিয়ে, "হুঁ, ফিগারগুলো মাথায় গুছিয়ে নিই" বলে কাগজখান বার ক'রে—

( ১ ) উনত্রিশ দিনে মাস।

( ২ ) উনিশ দিনের ( পুরো নয় ) সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা পর্যন্ত।

( ৩ ) তিন বেলা কামাই ( শর্মা সেটা কাটবেনই )।

( ৪ ) একদিন সওয়া-দশটার পর আসে।—( বেটার খুশি নাকি? )—কখন সকাল হয়েছিল সেটা তো জানা চাই। পাঁজি দেখলেই বেরিয়ে আসবে।

( ৫ ) মাস-মাইনে স-পাঁচ, আর সাত আনা জলপানি; একুনে ৫।৵০ আনা।"

বাস্, এই তো মামলা! এই তো মুটোর মধ্যে এনে ফেললুম, বাকি রইল—গুড়ুক টানতে টানতে টপাটপ বসিয়ে দেওয়া।"

গুড়ুকে টান দিয়ে, "দু একটা ফিগার টোকা দরকার হবে দেখছি। খোঁচখাঁচগুলো সাফ করা চাই। না হ'লে খোট্টাকে বোঝানো যাবে না,—মুখ্খুর সঙ্গে কারবার! কিন্তু পাঁজিখানা চাই তো সূর্যোদয়টা দেখতে হবে। হতভাগা সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় কাজ ছেড়ে মরেছে যে! বেস্পতিবার ভর সন্ধেবেলায় এমন কাজও করে! এঁদেরই বা আক্কেল কি? হিসেব জানলে আর—"

ভাণ্টার প্রতি "দেখ্ ভাণ্টু, আমি খারা মনুষ্য হ্যায়, আমার কাছমে গোঁজাকে

মিল পাবে না। তোমরা একটি কানাকা কড়ি তঞ্চক হতে দেঙ্গা নেই। কিন্তু একটু বিলম্ব হোঙ্গা। পঞ্জিকাটা দেখতে হোগা কিনা। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করকে রখেঙ্গা,—তুমি বৈকালমে আও।"

ভাণ্টা বাঙালীদের সংসারে কাজ ক'রে বাংলা বলাটা বেশ সড়গড় ক'রে ফেলেছিল। বললে, "আপনি ভাবতা কেন বাবু, হামি খোকাবাবুকে দেখতে আসে,—ঘড়ি ঘড়ি ইচ্ছা হোয় কিনা। আপনি যা হিসাব দিবে, হামি তাই নিবে।

"এই তো ভাল মানুষকা বাক্য। আচ্ছা, এখন বাড়িকা মধ্যসে পঞ্জিকা আনকে দিয়ে যাও।"

ভাণ্টা পাঁজি এনে দিয়ে চ'লে গেল।

"এইবার ক ঘণ্টা ক মিনিট বার ক'রে নিয়ে শ্রাদ্ধটা সেরে রাখি।—উদয় দেখছি ছয়টা তিপ্পান্ন মিনিট। আর যাবে কোথায়?

"নাঃ, খোট্টার দেশ,—শুভঙ্কর চলবে না,—কাগজ চাই। তা না তে ওদের মাথায় ঢুকবে কেন। ছেলেটা দেখ'ছ খাতা নিয়ে স'রে গেল। আচ্ছা দেয়ালে অ্যাল্ম্যানাক আর কিসের জন্যে ঝোলে? কাজে লাগুক।" টেনে নিয়ে তার উলটো পিঠে হিসেব শুরু ক'রে দিলে।

"দুত্তোর—ইংরিজি শিখে মুখ্‌খুমিই করা হয়েছে। একেই বলে দুকল খোয়ানো। ওরা কি আমাদের ভাল করতে এসেছে? এমন এক আট এনে ছেড়ে দিয়েছে, যা আমাদের চিরকেলে চার! কখনও এটা চার হয়ে যাচ্ছে কখনও আট। লেখবার সময়ও যে তা না হয়েছে, তা একে কে বলবে? মাথা ঘুলিয়ে দিলে। দূর কর, এখন থাক, স্নানাহার ক'রে ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে হবে। কাগজও চাই—

"ইস, আজ যে আবার বাঘা-রিহার্সেল রয়েছে! এই সময় যত আপদ জুটল! একটা ব্রেন, ক দিক সামলাবে? নাঃ, আজ ভাণ্টা-টাণ্টা নয়—"

শশী স্নানাহার ক'রে গুড়ুক টানতে টানতে শয্যা নিলে। "ও হবেই 'খন—বললেই উড়িয়ে দেব।"

বেলা চারটেয় ঘুম ভাঙল।

"যাক, অনামুখো বেটা আসে নি—বাঁচা গেছে। আজ হাঁড়িকাবাব রাঁধতে বলেছি। সাড়ে আটটার মধ্যে লুচি-সংযোগে ভোগে লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ব, আজ ঝটাপটি রিহার্সেল! এক চক্কোর যমুনার হাওয়া লাগিয়ে।

এলেই বেশ ‚জষ্টিস' করা যাবে। ইকোয়েল শেয়ারার, অর্ধেক ওড়ানো চাই। ওই যমুনার হাওয়া লাগিয়েই তো কেষ্ট হাড়ি-হাড়ি ননী সামলাল।"

বাইরে পা বাড়াতেই বারান্দায় ভাণ্টাকে দেখে প্রাণটা বিগড়ে গেল।— এখানে কলেরায় এত লোক মরছে, আবে এ বেটা—! "কি রে ভাণ্টা, আসা হায় কেত্তা 'খন? এই তোমার কথাই ভাবতা থা—গরিব লোকের এক পয়সা না যায়। কিন্তু যো দিনমে কোই গরু জরু নেই ছোড দেতা, আর তুমি কি বোল'ক নোকরি, যা গরু-জরুকা বাবা বললেই হয়, সেটা ছোড় দিলে? হিঁদুকা বাচ্চা একটু শাস্ত্রজ্ঞান তো থাকা উচিত থা—"

"হামি কি করবে, বড়বাবুর ছোড়িয়ে দিলে -"

"হুঁ, বুঝেছি। আচ্ছা, আমি ইসকা বিহিত করবে। সেই জন্যেই তো ইতস্তত করকে বিলম্ব করতা হায।"

"দোকানদার তাগাদা ছোড়ছে না তাই দিক করতে হোত বাবুজি। আচ্ছা তু'মি কাল আসবে।"

* * * *

চঞ্চুবাদ্য-রিহার্সেলে সকলকে তাক লাগিযে এসে শশী শুযে পড়ল। স্ফূর্তি ফুট কাটতে লাগল, "জুটায়ুব যদি একখানা গান থাকে—of course 'কানাড়া' তা হ'লে সবাইকে 'বডালে'র নাম ভুলিয়ে দিই। পাখিতে যখন কয় জটায় গাইবে না কেন?" নাসিকাধ্বনি।

ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটায়। "ইস, কখন কি করব! বিশ্বের চেয়ে বিপদ আর নেই। অঙ্কটা ভাল জানি ব'লে আমার ঘাড়েই জুলুম! কই ঐত মিয়া রয়েছেন তো—"

"পায় লাগি বাবুজী।" —কানে আসায় শশীর সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল হারামজাদার কি আর কোনও কাজ নেই! প্রকাশ্যে "বইসো ভাণ্টু বহুৎ কথা হায কে কে হায় বল্ দিকি?—জরু কাচ্চাকে-বাচ্চা, তারা সব কেমন হায়?"

ভাণ্টা আজ সাত দিন ঘুরেছে, সে আজ যা-হয় একটা কিছু না ক'রে উঠবে না, এই ভেবেই এসেছিল। কিন্তু শশী স্নেহ-সুরে কুশল জিজ্ঞাসা করায় গরিব জল হয়ে গেল। কাতর কণ্ঠে বললে, "কিষণজী সব সাফাই কোরকে দিচ্ছে বাবু। দেঠো বিটিয়া জোড়কে, জরুকো লিছে।"—সে কেঁদে ফেললে।

"আহা-হা! দুঃখ করিস নি ভাণ্টা, কিষণজীর কামই ওইরূপ হায়।

ঘুচিয়ে আর কি হোগা বাবা! মেয়েদের সাদির সময় যেন খবর পাই, ভুলিস নি ভাণ্টা।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—"আচ্ছা, বারাণ্ডামে মাজদুরখানা পাতকে, ওই কাগজ-পত্তোরগুলো রাখ্। আমি মুখ হাত ধোকে আসতা হায়; আজ তোর হিসাব সারকে তবে অন্য কাজ। দেখতা তো কাগজকা ডাঁই!

কাগজ, নবেশের খাতা, অ্যাল্ম্যানাক—অঙ্ক কষার দাপটে সত্যই একত্রে মিলে একটি মোট দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অন্দের অন্তরালে শশীর চেষ্টার বিরাম ছিল না, কিন্তু মাথায় পুঙ্খানুপুঙ্খের সদিচ্ছা ঢোকায়, সামলাতে পারছিল না। অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল।

শশী 'আতা হায়' ব'লে বাড়ির মধ্যে যেতে যেতে, "হাবামজাদা আমাকে আবার রোগে না ফেলে ছাড়বে না।"

কথাগুলি অনুচ্চে উচ্চারিত হ'লেও বড় বউ শুনতে পেয়ে—"কি গো ঠাকুরপো, কার রোগের কথা বলছ? রোগের কথা শুনলে যে প্রাণ চমকে ওঠে।"

"চমকে তো ওঠে, কিন্তু সেই ব্যবস্থাই তো করা হয়েছে দেখছি। হিসেব তো নয়,—কন্টিকারিব ঝাড়!"

"সে বুঝি এখনো?" ব'লেই বড় বউ থেমে গেলেন।

"ক'রে দিন না বড়বাবু।"

"হ্যাঁ, তাঁর মুরোদ ভারি! পারলে তো!" ব'লে বড় বউ নিজের ভুলটা সামলালেন। "না না, অত কষ্ট ক'রে আবার অসুখে পড়লে হবে নাকি? ওকে গোটাপাঁচেক টাকা ফেলে দাও ভাই, পাপ মিটুক। 'য়ের কৃপায় কত ক'রে তোমাকে—"

শুনে শশী খুশি হ'ল বটে, কিন্তু বললে, 'তোমার ওই বড়মানুষিটা ছাড় দিকি। ওতে যে গরিবকে ডোবান হচ্ছে। ও-বেটার যা ন্যায্য পাওনা, তার এক পয়সা বেশি দেওয়া হতে পারে না। ওদের মাইনে দস্তুরমত সর্বত্রই—এফ-ও-আর-ই ( Fore ) চার টাকা, তা নেপালেই কি আর ভূপালেই কি, তা জান? যাক, ওসব আর চলবে না।"

"সে তো ভাল, তা হ'লে যে বাঁচি। ওই যে কি বললে, এফ-‥-আর-ই তাই করতে ভাই। ইস্, ডিমগুলো চড়িয়ে এসেছি যে!" বলতে বলতে তিনি দ্রুত চ'লে গেলেন।

শশী হাতমুখ ধুয়ে—"কই, হালুয়া কই?"

"এই যে ভাই।" ব'লেই বড় বউ দুটো ডিমসিদ্ধ আর এক প্লেট হালুয়া হাজির ক'রে দিলেন। "চা-টা খেয়েই যাও ভাই।"

"দাও, ব্রেনটা বাগিয়ে নেওয়াই ভাল। আজ ফিনিশিং টচ্ দিতে হবে। ফ্রাক্‌শনগুলো রিডক্‌শন করলেই খতম।"

দাদার কর্তব্য শশী কোন দিনই ক্ষুণ্ণ করছিল না। —ডিম হালুয়া, কোনটাতেই ভুল হতে দিচ্ছিল না।

ভাণ্টা সে হিসাবের তাড়া বারান্দায় সাজিয়ে হতাশ হয়ে ব'সে ছিল।

শশী উপস্থিত হয়ে বললে, "কি রে ভাণ্টা, কি দেখতা হায়? এই ইসকো হিসেব বলে। এ যা কর দেতা হায়, মোক্ষোম। যা, তামাক সাজকে আন দিকি।"

ভাণ্টা তামাক সাজতে গেল, শশী চুল ফিরুতে ঘরে ঢুকল।

একটা গরু চ'রে বেড়াচ্ছিল। ফাঁক পেয়ে হিসেবের তাড়াটা টেনে নিয়ে চর্বণে মন দিলে।

ভাণ্টার চীৎকার শুনে, সিল্কের চাদরখানায় মুখ মুছতে মুছতে শশী বাইরে এসে, গরুটার অভদ্রতা দেখে, চাদরখানা চট ক'রে তার গলায় দু পাক জড়িয়ে, "আর যাবে কোথায়? ভাণ্টা, থানামে দিয়ে আ। তো। আ ছাড়বার পাত্তর নই।"

ভাণ্টাকে দেখে আর তার চীৎকারে গরুটা চার পা তুলে ছুটল। ... গেল প'ড়ে, চাদর রইল গরুর গলায়। ভাণ্টা ছুটল তাকে ধরতে।

"শখের ফরমাশী জিনিস, সাত টাকার চাদরখানা ছিঁড়ে-খুঁড়ে না আনে। ইস্, হিসেবের খানিক খানিক যে খাবলে নিয়েছে দেখছি। মাথা খেলে, এ অভদ্রাই পড়েছে! হবে না, বেহস্পতিবারের ব্যাপার!—

বারটা বাজল, ভাণ্টা যে ফেরে না। যাক, বেটাকে যতক্ষণ না দেখি, ততক্ষণই ভাল। কিন্তু চাদরখানা যে –"

ভাণ্টা হিসাব সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাই অনেক কষ্টে চাদরখানি গরুর গলা থেকে উদ্ধার ক'রে ঘ'রে রেখে, বৈকালে মুখ শুকিয়ে, মাথায় পটি বেঁধে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির।

"কি রে, কি হুয়া?"

সে অতি কষ্টে বুঝিয়ে দিলে, গরুর পিছে দেড় কোশ দৌড়েছে, তিন বার গিরেছে, মাথায় চোট খেয়েছে, তবুও কুছু করতে পারি নি। গরু রেলপার গায়েব হয়ে গিয়া। সে নড়তে পারছে না, সর্বশরীরমে বড়া দরদ।—"কুছু দাওয়াই দেন হুজুর?"

তার অবস্থা দেখে শশীর আর কথা সরলো না। তার হাতে একটা সিকি দিয়ে বললে, "সর্বাঙ্গকা দরদটা মারনা চাই। ভাঙের চেয়ে দাওয়াই নেই। কিন্তু, আচ্ছা করকে বানানো চাই। সব মসলা জানতা তো? তার পরে বেশ করকে পিষণ, পিছে ঘুণ্টন।"

"উসব হামি খুব জানছে বাবু। মথুরাজীমে হামার ঘর আছে।"

"তবে আর কেয়া, আজই আচ্ছা হয়ে যাবি।"

সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

শশীর মনে কিন্তু সারা দিন সুখ নেই। এই অবস্থায় ভাইপো নরেশ ইস্কল থেকে এসে হাসতে হাসতে বললে, "আজ কোম্পানির বাগানে বেড়াতে যেতে হবে কাকা!"

"আমি আজ বেরুব না, কাজ আছে।"

"হিসেব হয় নি বুঝি?" কথাটা নরেশ সহজভাবেই কয়েছিল। শশীর মাথায় তা আগুন ছড়িয়ে দিলে। সে সরোষে বললে, "ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাক্, ফের যেন ..."

বালক ধীরে ধীরে বিমর্ষ মুখে চ'লে গেল।

শশীর মগজে তখন নানা সন্দেহ ফুট কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সে ভাইপোর ওই কথার মধ্যে বিদ্রূপ আবিষ্কার করলে, "এ তো ওই বাচ্চার কথা নয়, নিশ্চয় বাড়িতে ধাড়ীদের মধ্যে এ নিয়ে কথা হয়। তা হোক, আমি কিন্তু তা ব'লে নিজের শেয়ারের কড়ি দাতব্য করছি না, হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খ না ক'রে ছাড়ছি না। বাবা বলতেন, 'নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে অন্যের কথা কানে নিয়েছ কি ঠকেছ।'

এই ব'লে হিসেবের তাড়াটা টেনে নিয়ে ছড়িয়ে ফেললে। প্রত্যেক ছোট-বড় কাগজে চোখ বুলিয়ে, "তাই তো, পেজ-মার্ক দেওয়া হয় নি, কলম চললে তো আর জ্ঞান থাকে না! কোথা থেকে আরম্ভ, খুঁটটা একবার খুঁজে পেলে যে হয়!" খুঁট মিলল না, সব একাকার হয়ে ব'সে আছে। শশীর মাথাটা বোঁ ক'রে উঠল।

চাকরদের ঘরে ভাণ্টা ভাং ঘুণ্টনে ঘর্মাক্ত। সিদ্ধি না খেলে বুদ্ধি খুলবে না, এক ঢোঁক চড়িয়ে দেখি।—"কিরে ভাণ্টা, কেত্তা দূব! বাঃ, বেশ খুসবু ছেড়েছে! একটু দে কিকি, চাক্ষন করি, ভক্ষণ পরমে হোগা।"

ভাণ্টা মনের মত এক বাটি দিলে।

"জয় ত্র্যম্বকজী! বাঃ, তুই এমন সুন্দর বানাতা, এত্তা দিন বলিস নি?"

পাঁচ মিনিটেই শশীর বুদ্ধি খুলতে আরম্ভ হয়ে গেল।—"ব্যাস্, মেরে দিয়েছি, 'শ্রীশ্রীহরি সহায়' না লিখে শর্মা কোন দিন এক অক্ষরও ফাঁদেন না। যেখানে শ্রীহরি সেইখানেই তো আরম্ভ! এই তো শ্রীহরি রয়েছেন·· কিন্তু মাঝ-মধ্যিখানে শ্রীহরি এলেন কি ক'রে?"

শশীর ভাবের উদয় হয়ে পড়ল। খাতার পৃষ্ঠা, অ্যাল্ম্যানাকের পৃষ্ঠা, মায ম্যাপের পৃষ্ঠা সর্বত্রই শ্রীহরির বিকাশ। শশী সুর ধরলে—

"হরি হে তুমি কিনা পার।
তুমি ডগায় ছিলে, মধ্যে এলে,
কোনও বেটার ধার না ধার।
এই যে, তলা ঘেঁষেও উঁকি মার!"

'ক্যাবাৎ!'—শশী হেসেই খুন।

তার পরের ওলটপালট অবস্থাটা শশী নিজেই উপভোগ করতে পারে নি, করেছিলেন অন্য অনেকে। দাদা, বউঠাকরুণ, নরেশ—সকলেই; পাড়ার প্রবীণ উমেশবাবু পর্যন্ত। জগতের সেইটাই হয়েছিল সবার বড় লজ্জার কারণ।

শশীর মাথায় ঘড়া-ঘড়া জল ঢালা দেখে, বউঠাকরুণ ভয়ে ভাবনায় আড়ষ্ট। ডাক্তার ডাকার জন্যে ব্যাকুলভাবে স্বামীকে কেবলই কাতর অনুরোধ করছিলেন।

জগতের মাথা তখন বিরক্তিতে, লজ্জায়, রোষে ভর্তি।—কর্কশ রকমের একটা ধমক খেয়ে স্ত্রী চমকে কেঁপে উঠলেন, যে হেতু এটা তাঁর অভ্যস্ত পাওনা ছিল না।

"ও-বয়সে বেকার ব'সে থাকলে অবান্তর পাঁচটা নিয়ে দিন কাটাতে হয়, নেশাটা তারই একটা। ভয় নেই, ওদের সব অভ্যস্ত বিদ্যে।" বলতে বলতে উমেশবাবু চ'লে গেলেন। জগতের যেন মাথা কাটা গেল।

৬

উপভোগ্য সংবাদগুলি প্রচার হতে বিলম্ব হয় না। সকালে অনেকেই এসে সংবাদ নিয়ে গেলেন। প্রবাসের সুখই এই। কয়েক ঘর মাত্র থাকায়, প্রীতির বন্ধনে একটু আঁট থাকাটা স্বাভাবিক। শশী কিন্তু থিয়েটার-পার্টির কমরেড্‌দের চিন্তাকুল দৃষ্টির ও প্রশ্নের ভাষা ও ভাবের মধ্যে বিদ্রূপের লুকোচুরিই পাচ্ছিল।

বাড়ির সকলেই বেশ চুপচাপ—যেন কিছু হয় নি। কথাবার্তাও বেশ সংযত। সেইটাই কিন্তু শশীর কাছে কদর্থপূর্ণ ঠেকছিল। নরেশ ইস্কুল থেকে ফিরে, বার-বাড়িটা গম্ভীর মুখে পার হয়ে, ভিতর-বাড়িতে নাকি হাসিমুখে ঢুকেছিল; সেটা শশীর দৃষ্টি এড়ায় নি। তার রগ দুটো দপ-দপ ক'রে উঠল। "হুঁ—এই কালে এই বিষ! আচ্ছা, আজ আর নিদ্রা নয়, হিসেব শেষ ক'রে তারপর যা মনে আছে—! না খাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অপরের তো খাচ্ছি না, নিজের শেয়ার রয়েছে।"—শশী নীরবে মাথা গুঁজে আহার শেষ করলে। বড় বউ একটি কথাও উচ্চারণ করতে সাহস পেলেন না। নিয়মমত দুধের বাটি পাতের কাছে ধ'রে দিতেই—"ও আর কেন" ব'লে শশী উঠে পড়ল। তিন কদমেই বার-বাড়ি।

বড় বউ ভয়ে আড়ষ্ট ছিলেন, শশীর মেজাজ জানতেন। যা বলবেন, শশী আজ সেটা কি ভাবে নেবে—এই তাঁর ভয়। তিনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুরপো দুধ খেলে না, এইটাই তাঁকে কেবল আঘাত করতে লাগল। ভাবলেন, দুধের বাটি নিয়ে নিজে বার-বাড়িতে যান। এই সময় জগৎ এসে পড়ল। সব শুনে জগৎ মানা করলে, "বোধ হয় তার পেট ভাল নয়, কাল খাইও।"

তাঁর মন কিন্তু বুঝল না, নিজেও কিছু খেলেন না।

এই সময় নরেশ এসে বাপকে বললে, আমার খাতা কাগজ পেন্সিল—সব গিয়েছে বাবা, আর কিছু নেই।"

"বেশ হয়েছে। যা, শুগে যা বলছি।" ব'লে তার মা এমন এক ধমক দিলেন, সে কেঁপে উঠল।

ছক্কন বাইরে এক ডিবে পান আর তামাক দিয়ে গেল।

শশী আজ অঙ্কের একোদ্দিষ্ট করবেই, উপকরণ সংগ্রহ ক'রে বসেছে।

মাসাধিকের পরিশ্রম গরুর গর্ভে গিয়েছে, মায় দক্ষিণা—সিল্কের চাদর। "যাক, ফ্রেশ ফাঁদলে আর কতক্ষণ? একটা সাংঘাতিক ভুল ধরা পড়ে নি, তাই পাওনাটা কখনও এগারো টাকা, কখনও চোদ্দ, কখনও সতেরো দাঁড়াচ্ছিল। ওঃ, সাত আনা জলপানিটে যে তিরিশ দিনে পায়, অথচ ফেব্রুয়ারি যে উনত্রিশ দিনে! তাই তো বলি, এত হয় কি ক'রে! উঃ, ভারি ধরা পড়েছে।"

শশী নূতন ক'রে ফাঁদলে বটে, কিন্তু সামনে সেই স্বখাত সলিল, প্রতি পদক্ষেপে সেই 'সওয়া' 'পৌনে' 'সাড়ে'র খোঁচা আর সূর্যোদয়ের দণ্ড পল পাশ ফিরতে দেয় না। হাত বাড়ালেই যেন কষ্ট সজারুর গায়ে হাত পড়ে। তাকে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ করতেই হবে—'শেয়ার বাঁচাতে হবে'। এ যে বাঁশকালির চেয়ে গেটে! বেণী মাস্টার কি একটা সাফাই-সঙ্কেত ব'লে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে না। শশী চক্ষু বুজে সেটা স্মরণ করতে বসল। একাগ্রতায় কি না হয়। ভাঙের মিঠে প্রভাব সাহায্য করলে, শশীকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

সে স্বপ্ন দেখলে, বেণী মাস্টার বলছেন, 'আ মূর্খ, শুভঙ্করের ছেলে হয়ে বাপের নাম ডুবুচ্ছিস! এত বুদ্ধি ধরিস, আর এটা ধরতে পারলি নি, ওটা অঙ্ক নয়? ওটা তোকে তাড়াবার ভদ্র ফন্দি। আর থাকতে আছে, চ'লে আয়। পশুপতি রয়েছে, আমরা রয়েছি, তোর ভাবনাটা কি?

শশীর প্রাণে যা খেলছিল, এটা ছিল তারই ছায়াচিত্র।

সে যেন অকূলে কূল পেলে। মুখে হাসি দেখা দিলে উঃ, কি দুরভিসন্ধি! ওটা অঙ্কই নয়, তা না তো সাঁইত্রিশ পাতা ক'যেও শশী শর্মা কূল পায় না! যা ভেবেছিলুম আর স্বপ্নে যা শুনলুম, একদম ঘাটে ঘাটে মিল। ওটা অঙ্কই নয়! মা ব'লে থাকেন, মন নারায়ণ, very true, কিন্তু কি দুরভিসন্ধি! আসল মতলবটা ছিল শুধু তাড়ানো নয়, আমার মাথাটা বিগড়ে দিয়ে বিষয়সম্পত্তির একেশ্বর হওয়া। এই হওয়াচ্ছি। তাই তো, কাগজ নেই যে!" নরেশের ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে ছিল, "ও আর কেন, এই বাপ-মার ছেলে, জুচ্চুরি শিখবে তো!" শশী ভারতসমুদ্র মন্থন আরম্ভ ক'রে দিলে। বেশ পরিষ্কার তিন ভাগ জল পেয়ে, তাকে তোলপাড় ক'রে খসখস কলম চালালে।

লেখাটা টেবিলের উপর দোয়াত-চাপা—চিত হয়ে রইল।

৭

শশী প্রত্যহ মর্নিং-ওয়াকে যায়। বড বউ চায়ের জল চড়িয়ে বাসি-পাট সারেন। শশী তার নিজের বাঁধা ফেভারিট সং—

"আমার বুকে আঁকা রামের নাম,
Uncle, nephew, father, mother,
Sister, brother,—সবই রাম।—"

গাইতে গাইতে ফেরে, এবং তা কানে এলেই বড বৌ চা ছাড়েন। শুনতে না পাবার কোনও কারণই নেই। একে তো তাঁর কান সেই প্রতীক্ষায় থাকে, তার ওপর শশী 'সিস্টার' কথাটির উপর এমন একটি টনক-নড়া ও চমক ভাঙা গমক দেয়, যা বধিরেরও শ্রবণ-সুলভ।

আজ রোদ উঠল, এখনও ঠাকুরপোর সাড়া নেই। বড় বউ একটু চঞ্চল হলেন: "...ন দুধ খায় নি, শরীর ভাল আছে তো? ছক্কন, দেখ্ তো, ছোট-বাবু বেড়িয়ে ফিরেছেন কি না!"

ঠাকুরপো দুধ না খাওয়ায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। উঠান থেকেই একটু চড়া গলায় বললেন, "তিনপোর বেলা হ'ল, এখনও কারুর ওঠবার নাম নেই! দেখাদেখি ছেলেটাও গোল্লায় গেল! লেখাপড়া হবে, না, ছাই হবে!"

নরেশ চোখ রগড়াতে রগড়াতে তাড়াতাড়ি উঠে এসেই ধমক খেলে—"এর ওপর আর এক চোখ দেখাতে হবে না. দু চোখ বোজ্!—দুগ্‌গা দুগ্‌গা!

বালক হকচকিয়ে, দালানের ক্লকটার দিকে চেয়ে সভয়ে বলে, "তুমি দেখ না মা, এখনও ছটা বাজতে তিন মিনিট—"

"ও-ঘড়ি আর দেখতে হবে না। এসে পর্যন্ত এক ফোটা তেল পেয়েছে কিনা! মাথার ওপর দিনরাত কেবল টিকটিক করতে আছে। যা, তোর কাকা বেরিয়ে ফিরেছেন কিনা দেখে আয়।"

কথাগুলো রুষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়ায় জগৎবাবুও আধ ঘণ্টা আগেই উঠে পড়লেন।—"কি, আজ ব্যাপার কি? শেষরাত্রে উঠে হৈ চৈ লাগিয়ে মানুষের ঘুম-ভাঙাবার এত ধুম প'ড়ে গেছে কেন? ঘড়িটার দিকে দেখলেই তো হয়, কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা—"

"ছেলে একবার দেখিয়ে গেল, তুমিও দেখাচ্ছ। ওটা আর ঘড়ি আছে নাকি?"

"তবে ওটা কি ?"

এ দেশে টিকটিকি ডাকে না ব'লে বোধ হয় রাখা হয়েছে। পরের মেয়ের মত দিন রাত খেটে চলেছে, খেলে কিনা খোঁজ নেবার দরকার আছে ব'লেও কেউ ভাবে না। সাত বছর হ'ল এসেছে, কোনও দিন 'অয়েল' করাতে তো দেখলুম না। নিজেদের তো পায়ে পেটে মাথায়, তিন রকম তেল লাগে—"

জগৎ একটু হাসি টেনে বললে, "তাই বুঝি নিজের জন্যে আর এক রকম বাড়াবার চেষ্টায় আছে, মধ্যম-নারায়ণটা বাকি থাকে কেন ?"

নরেশ হাপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, "সব চুরি হয়ে গেছে মা, কাকার স্যুটকেস, বাঁশী, করতালি, সব—"

"তোর কাকা কোথায় বল্ না রে পাজি ?"

বালক থতমত খেয়ে বললে, "বোধ হয় চোর ধরতে—"

মা চোখ রাঙিয়ে বললেন, "দেখবি ?"

সে বাপের পেছনে পেছনে বাইরে পালাল।

বড় বউয়ের মাথা ঘুরতে লাগল। তিনি দালানেই ব'সে পড়লেন। চড়ানো চায়ের জল ফুটে ফুটে শেষ হয়ে গেল।

"ঘুম ভেঙেই গাধার ডাক শুনলুম। সাত সকালে—মাগী কাপড় এনে ম'লো। হতভাগা ছেলে উঠেই এক চোখ দেখালে। রাতে ঠাকুরপো দুধ খেলে না, বললে—'ও, আর কেন ?' আবার চুরির কথা শুনছি। ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, একটুতে অভিমান করে। এখানে আমি ছাড়া তার অভিমান সইবার আর কে আছে ? ওঁরা ছেলেদের মন কতটুকু বোঝেন। ওঁর কথা শুনেই তো কাল রাতে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা পেতে পারলুম না। ভালয় ভালয় দিন কাটিয়ে দাও ঠাকুর, আমার বড় ভয় হচ্ছে—"

হঠাৎ উঠে কয়েকটি পয়সা তুলসীতলায় রেখে, হাতজোড় ক'রে কত কি জানিয়ে প্রণাম ক'রে এলেন।

"তাই তো, বাইরে এরা এতক্ষণ করছে কি ? সাড়ে সাতটা যে হ'ল ! স্যুটকেস নিয়ে কে আবার মর্নিং-ওয়াকে যায় ! তার জিনিসই কি চুরি যাবে ?" বুকটা তাঁর শিউরে উঠল—"শাশুড়ীর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব ? ঠাকুর লজ্জা রাখ। কেন মরতে ভাঙা দিনে ভাণ্টাকে ছাড়ানো হয়েছিল, মাসে মাসে মাইনে পাচ্ছিল, কোন গোল ছিল না—"

এই ভাবের এলোমেলো দুর্ভাবনা তাঁকে অত্যন্ত কাতর আর ভীত ক'রে তুলতে লাগল।

ক্ষণপূর্বে জগৎ স্ত্রীর সঙ্গে রহস্যই করছিল। সে ভাবছিল, শশী তো কারুর চাকরি করে না, সময় সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনা কিসের? দেশে কেরানী না থাকলে কটা ঘড়িই বা বিক্রি হত! বেড়িয়ে ফিরতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে, বড় বউয়ের এতটা চাঞ্চল্য যে কেন—সেটা তার মাথায় আসছিল না। সে চাকরি করে, মাইনে এনে দেয়। সংসার চ'লে গেলেই হ'ল, কেউ না কিছু বললেই হ'ল।

সুটকেস নেই শুনে জগৎ ভাণ্টার খোঁজ করবার তরেই বাইরে যায়। ভেবেছিল, ভাণ্টা বোধ হয় আজও মাইনে পায় নি, এ সেই বেটারই কাজ।

কি কি গিয়েছে দেখতে গিয়ে যখন দেখলে, গড়গড়ার সৌখিন নলটি নেই, তখন ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। স্বগতোক্তি বেরুল—তাই তো, গিয়েছে—গিয়েছেই তো বটে। বলা নেই কওয়া নেই,—কারণ কি?" তাঁর ক্ষুব্ধ প্রাণের পরিচয় মুখময় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।—"সে গেল কেন, কোথায় গেল? বড় বউ? উহুঁ, সে তো কিছু বলবার মানুষ নয়।"

সহসা নরেশ নাকী সুরে ব'লে উঠল, "এই দেখ বাবা, কাকা আমার গ্রামারের খাতা ছিঁড়ে কি করেছেন দেখ। ও-পিঠে অর্থডক্স-ফক্স ছিল—সব গিয়েছে। আর এই ভারতবর্ষের মানচিত্রে—ভারতসমুদ্র একেবারে মাটি হয়ে গেছে বাবা।" বলতে বলতে বালক কেঁদে ফেললে।

মহাসমুদ্রের মাঝখানে বড় বড় হরপে নিজের নাম দেখতে পেয়ে, জগৎ ম্যাপখানি হাতে নিয়ে, চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলেন।—"এ সব কি? সে দিন নেশার ঝোঁকে লিখেছিল বোধ হয়। না, কালকের তারিখ যে! মাথা খারাপ হ'ল নাকি? তাই তো—"

বিষম দুর্ভাবনাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ির মধ্যে ছুটলেন।

আজ ছুটির দিন। ইকনমিক ফার্মেসির লোক ওষুধের বিল নিয়ে তাগাদায় এসেছিল। বাবুর বাক্স চুরি হয়ে গেছে শুনে, ধীরে ধীরে ফিরে গেল।

বড় বউ একভাবেই সেই দালানে ব'সে অপরাধীর মত ঠাকুর-দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছিলেন।

জগৎ এসে ম্যাপখানি এগিয়ে ধরে—"এই দেখ, তোমার ঠাকুরপো

নেশার ঝোঁকে কি কাণ্ড ক'রে বসেছে ! এখন কি করা উচিত ?"

শুনেই বড় বউয়ের চেহারা মুহূর্তে ফ্যাকাশে—রক্তশূন্য। তিনি ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন—মুখে কথা সরলো না। কষ্টে ক্ষীণস্বরে কেবল বললেন, "লেখা নাকি ? কি লিখেছে ?"

"লিখেছে আমার মাথা। শশী আমাকে লিখছে—

"জগৎবাবু,—পুরুষ বাচ্চায় স্পষ্ট কথা কয়। তাড়াবার মতলবে শাস্ত্রছাড়া হিসেব মেটাতে দেয় না। দুরভিসন্ধিটা আগে বুঝতে পারি নি। বেশ, চললুম। বোঝাবুঝি হবে কাটগড়ায়। নিজের হিসেব ঠিক রেখো।

শ্রীশশিভূষণ ঘোষাল"

বড় বউ ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু তো বুঝতে পারলুম না।"

"সিদ্ধি খেলেই বুঝতে পারবে।"

"না না, ছেলেমানুষ একটু'তে অভিমান ক'রে অমন কত বলে। তুমি শিগগির খোঁজ নাও, কাল থেকে তার খাওয়া হয় নি।"

বাইরে একটা গোলমাল হওয়ায়—"দেখ দেখ, সে এসে থাকবে। হরি, লজ্জা রাখ।"

জগৎ বাইরে গিয়ে দেখে, থিয়েটার-পার্টির কমরেডরা শশীর খবর নিতে এসেছে।

বিক্ষিপ্তচিত্ত জগৎ তাদের বললেন, "শশী বোধ হয় কোথায় চ'লে গিয়েছে, তোমরা একটু দেখ তো ভাই - কোথায় সে গেল। আমি স্টেশনে খোঁজটা নিই।"

একটু মজা উপভোগ ছাড়া শশীর জন্য তাদের বড় চিন্তা ছিল না।

সকলেই সতৃষ্ণ ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে শেষ বললে, "তাই তো, কোথায় গেল, কই, কোথাও পাত্তা পাচ্ছি না তো।"

তারা জটায়ুকেই খুঁজছিল।

# মধুরেণ

আজ ছুটি ছিল। তারিণী চাটুজ্জে সকালে চারটি মুড়ি আর এক কাপ্ চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর বেরুনো মানেই—কন্যা শৈলর জন্য পাত্র খুঁজতে বেরুনো। তিনি আজ তিন বছর এইরূপ বেরুচ্ছেন।

এক-পা ধুলো নিয়ে সন্ধ্যায় ফিবে, মাথায় হাত দিযে বাড়ির রোয়াকে তিনি ব'সে পড়েন। পত্নী নবদুর্গা তাড়াতাড়ি মাদুরখানা এনে পাশেই পেতে দেন, উঠে বসতে বলেন। গরমের দিন, পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসেন। তাবিণী-বাবুর মুখে ম্লান হাসি না ফুটতেই দীর্ঘশ্বাসে তা মিলিয়ে যায়। বলেন, "আমাকে আর যত্ন ক'রে বাঁচিয়ে রাখা কেন?"

শৈল আজ তিন বছর বাপের এই অবস্থা দেখে আসছে, আর ওই কথা শুনে আসছে। সে পনেরো উত্তীর্ণ হ'ল, এইবার ম্যাট্রিক দেবে। ওটা নাকি সর্বাগ্রে দরকার, তারিণীবাবু পাত্র খুঁজতে যেখানেই যান, প্রথম শুনতে হয়—ম্যাট্রিক পাস কি না! তিনি যেন কেরানীগিরির দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাই আধপেটা খেয়েও শৈলকে পড়াতে হচ্ছে।

শৈল গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, সংসারের সকল কাজেই মাকে সাহায্য করে। এখন সংসারের সকল চিন্তায় যোগ দেয়, সব বোঝে ও ভাবে।

তারিণীবাবু রেলে চাকরি করেন, মাইনে পঁয়ত্রিশ টাকা। সন্ধ্যার পর মাড়োয়ারীদের গদিতে গিয়ে ইংরাজী চিঠিপত্র টেলিগ্রাম লিখে দেন, তাঁদের মাল খালাসও ক'রে দেন। তাতেও কিছু পান। কাকারিবা বিশিষ্ট ধনী, গরিব ব্রাহ্মণকে ভালবাসেন, দয়া ক'রে কাজকর্ম দেন। এই পাঁচ রকমে তাঁর সংসার চলে।

একদিন সকালে কাকারিয়ার মোটর তারিণীবাবুর ভাড়াটে বাড়িব সামনে এসে দাঁড়ায়। বেরিয়ে এসে শেঠ কাকারিয়াকে সপরিবারে নামতে দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন।

কাকারিয়া সহাস্যে বলেন, "বাড়িতে একটা বিবাহোৎসব আছে, আমার স্ত্রী কন্যা তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন, তাঁরা বাড়ির মধ্যে যাবেন।"

শুনে তারিণীবাবুর কথা যোগাল না। ইতিমধ্যে—দাসীর হাতে একখানি পরাতে মিষ্টান্নাদি, পশ্চাতে স্ত্রী কন্যা, বাড়ির ভিতর গিয়ে উপস্থিত।

দুঃখের সংসারে তারিণী চাটুজ্জের এত বড় বিপদ কোন দিন ঘটে নি। একতলা আড়াইখানি স্যাঁতসেঁতে কুঠুরি, তার তদপযুক্ত আসবাব, ময়লা ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, মাটির হাঁড়ি কলসি সরা। সেদিন 'তৃণাদপি সুনীচেন' একবার তাঁর মনেও পড়ে নি, পড়লেও বোধ হয় শান্তি দিত না। তিনি ন যযৌ অবস্থায় কাকারিয়ার মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে দু একটি বিনয়-বচন ভিন্ন কথা কইতে পারেন নি, তাঁকে নামতে বলতেও পারেন নি,—কোথায় বসাবেন?

প্রৌঢ় কাকারিয়া তাঁর অবস্থাটা বুঝে অন্য কথা পাড়েন। বললেন, "তারিণীবাবু, যে কাজ জানি না, বুঝি না, এমন একটা কাজে হাত দিয়ে ফেলেছি। অনেক টাকার কাজ, তাতে ফ্যাসাদও বহুৎ। তোমার সাহায্য আমার দরকার, অনেক লেখাপড়া করতে হবে। বিলেত থেকে মালপত্র মেশিনারি এসে পড়েছে, খালাস করতেও হবে। এখন ভগবতী-মাই যা করেন।"

তারিণীবাবু কথা কইবার অবলম্বন পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কি কাজ শেঠজী?"

কাকারিয়া হাসতে হাসতে বলেন, "বাইস্‌কোপ, তসবির-ঘর। তসবির বনবে—"

তারিণীবাবুকে আর কথা কইতে হয় নি; কাকারিয়ার স্ত্রী কন্যা তার বাসা থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে ওঠেন।

"আচ্ছা, কথা পরে হবে।"—ব'লে শেঠজীর মোটর বেরিয়ে যায়।

তারিণীবাবুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, তিনি সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন। কাকারিয়ার কথাগুলি তাঁর কানে গেলেও প্রাণে পৌঁছয় নি।—বড়লোকের সদ্ব্যবহারও গরিবদের উপভোগ্য হয় না, স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না।

নবদুর্গা ডাকায় তাঁর চমক ভাঙে।—"এসব আবার কি? আমাকে খবরটা দিতে হয়! আমি এই ছেঁড়া কাপড় প'রে শাক-সড়সড়ি চড়িয়েছি, মেয়েটা ওই কাপড়ে চালের খুদ বাটছিল, তাড়াতাড়ি তোমাকে দুখানা বড়া ভেজে ভাত দেব ব'লে, এমন সময়—ছি-ছি—"

শৈল বললে, "তাতে কি হয়েছে মা? যে যা, তার তাই থাকাই তো

ভাল। আমি সাটিনের শাড়ি প'রে বাটনা বাটলে কেমন দেখাত? ওঁদের আসায় আর অন্যায়টা কি হয়েছে মা? বড়লোক যদি আদর ক'রে আসেন, সেটা কত মিষ্টি।"

নবদুর্গা বলেন, "আমি কি ওঁদের দুষছি? হঠাৎ কিনা, তাই আতান্তরে পড়তে হয়। এই দেখ না, কত রকমের মেঠাই, আবার পাঁচ টাকা নগদ দিয়ে গেছেন। আমাদের তো—"

শৈল বলে, "তুমি বুঝি তাই ভাবছ মা? ওরা বড়লোক, ওঁদের মত কাজ ওঁরা না করলে সমাজে নিন্দে আছে। আমরা গেলেই ওঁরা খুশি হবেন। তুমি আজ একবার যেও বাবা।"

শুনে তারিণীবাবুর মনটা শান্ত হয়। তাকে ভাত বেড়ে দিয়ে নবদুর্গা বলেন, "তোমার মেয়ে তাঁদের সঙ্গে এমন কথা কইলে গো, যেন কত কালের চেনা। তাঁদের মুখেও শৈলর কথাবার্তার, রূপের সুখ্যাত ধরে না।"

"ও রূপের সুখ্যাত। তাতে টাকার কামড় তো কমে না।"—ব'লে উদাস ভাবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারিণীবাবু উঠে আপিসে চ'লে যান।

স্ত্রী কন্যাও যথাসময়ে রাকারিয়া ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আসেন। শেঠ কন্যা রুক্মিণী বাঈ শৈলর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে সখী সম্পর্ক পাতায়।

## ২

উল্লিখিত ঘটনার পর তারিণী চাটুজ্জে এই প্রথম পাত্র-খোঁজা 'ট্যুর' থেকে হতাশ শ্রান্ত অবস্থায় ফিরে নবদুর্গাকে ব্যস্ত হয়ে বাতাস করতে দেখে, দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ম্লান হাসি মিশিয়ে যখন বলেন "আমাকে আর যত্ন ক'রে বাঁচিয়ে রাখা কেন?"—শৈল তা শুনেছিল।

কষ্টের এরূপ মর্মন্তুদ অনেক কথা অনেকবার সে শুনেছে এবং নিভৃতে নীরব অসহায়ের মত কেঁদেছে। এখন সে কেবল কষ্টই পায় না, তার আত্মাভিমান বিদ্রোহ ক'রে ওঠে, সে দারুণ লজ্জা ও অপমান বোধও করে।

আজ আর সে থাকতে পারলে না। বাপকে সবিনয়ে জানিয়ে দিলে, "তুমি আমার জন্য পাত্র খুঁজতে আর যেও না বাবা। এসব পাঁচ বছর আগে সম্ভব ছিল, তখন আমার জ্ঞান হয় নি। এখন কিন্তু তোমার অপমান, আর

তার সঙ্গে নিজেরও,—আমাকে অত্যন্ত লাগছে। প্রত্যেকবারই শুনছি ও বুঝছি, কোন ভদ্রলোকই তো নগদ দু হাজার টাকার কমে ছেলে ছাড়বেন না। ছেলেও নিজের সম্মান সেই টাকার ওজনে যখন সপ্রতিভ-ভাবেই মেপে রেখেছেন, তখন সে বৃথা চেষ্টা আর কেন বাবা? দু আড়াই হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে? ভদ্রলোকে কি চুরি-ডাকাতি করবে? যারা চান, তাঁদের কজন তা বার করতে পারেন? তিন বছরে কাকাবাবুদের পাওনা পঁচাত্তর টাকা দিতে পারা গেল না দেখে দাদা লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। কাকা (রিয়া) বাবুরা ভালবাসেন, যাই আসি, কিন্তু মুখ তুলে রুক্মিণীর সঙ্গেও কথা কইতে পারি না। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। তুমি আর ভেবো না; পাত্র খুঁজতেও আর যাওয়া হবে না বাবা। এবার গেলে কিন্তু—"

তারিণীবাবু অবাক হয়ে শৈলর কথাগুলি শুনছিলেন। শৈল বরাবরই শান্ত ও অল্পভাষী। আজ তার কথার মধ্যে এমন একটা সত্য ও দৃঢ় সুর ছিল, যা তাঁকে বিচলিত ক'রে দিলে। তাঁর মুখ থেকে সরব চিন্তার মত বেরিয়ে গেল—"সমাজ যে রয়েছে, সে কি বলবে?"

শৈল তেমনই ধীরভাবেই বললে, "সমাজের যদি 'বলা' ছাড়া আর কোনও কাজ না থাকে, তবে সে সমাজের জন্য মিছে ভেবো না। ওই সমাজই অন্য পক্ষের সমাজ নয় কি? নির্জীব কেন, সেখানে তার বলার কিছু নেই কি? যাক, সমাজ বলুক না বলুক, আমি কিন্তু বাবা তোমাকে আজ বলছি, এইবার তুমি আমার জন্য পাত্র খুঁজতে গেলে, তার পর আর যাতে না যেতে হয় তা আমায় করতেই হবে। এ কষ্ট, এ অপমান তোমাকে আর সইতে দেব না।"

নবদুর্গার হাতের পাখা থেমে গিয়েছিল। শৈল রান্নাঘরে চ'লে গেল।

তারিণীবাবু স্তব্ধ উদাস দৃষ্টিতে মূঢ়ের মত ব'সে রইলেন। ক্ষণপরেই সহসা ব'লে উঠলেন, "হ্যাঁ, ঠিক, আর যাব না রে শৈল। যা করবার ভগবান করবেন। —ঠিক বলেছিস।"

৫

বেচু, নেপেন আর তারিণীবাবুর ছেলে বিজয়, তিন বেকার বন্ধু। কলেজ ছেড়ে কলকাতায় চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, হতাশ। তিনজনেই সমদুঃখী, দুঃখের সমবায়ই তাদের দুঃখের সান্ত্বনা দাঁড়িয়েছিল।

৪

তিন মাস ধ'রে কাকারিয়ার 'মরীচিকা-মঞ্চে' একখানি সামাজিক নাটকের মহলা চলছে।

কাকারিয়ার অর্থের অভাব নেই, নামী অভিনেত্রীদের—যারা নৃত্য গীত ও অভিনয়ে সুপরিচিতা— স্বদেশী তারকা, তাদের মোটা টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে। কাকারিয়া ধারণা, সেরা সেরা সুন্দরীরাই ফিল্মের প্রধান আকর্ষণ। পুরুষের পার্টে লোকাভাব নেই,—পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ দিলেই হীরো ( Hero ) মেলে। সুতরাং সুন্দরী সংগ্রহের ব্যয়টা এইতে পুষিয়ে যাবে।

শেঠের অদৃষ্ট বাধা-বিঘ্নে কেটে চলে। প্রথম প্রচেষ্টার মুখেই ঘ'টেও গেল তাই। নানা সদুদ্দেশ্যে সভ্যজগৎ আজকাল ভারতের আচার-ব্যবহার প্রথা-পদ্ধতি জানবার জন্য উৎসুক ও উদগ্রীব। কাকারিয়ার ভাগ্যে য়ুরোপের এক ফিল্ম কোম্পানির মালিক ভারতভ্রমণে এসে ভদ্র হিন্দুদের বিবাহ-পদ্ধতিটার নিখুঁত ছবি বিশেষ মূল্যে সংগ্রহ করতে চান এবং কাকারিয়ার সঙ্গে কনট্রাক্ট করেন।

সুযোগ বুঝে কাকারিয়া অভাবপীড়িত নেপেনকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ও ভবিষ্যতের বড় আশা দিয়ে, চট ক'রে একখানি নাটিকা লিখিয়ে নেন।

তারই জোর রিহার্সেল চলছে। ক্রেতা ব'সে আছেন—কনট্রাক্ট মত দিনে তাঁর পাওয়া চাই, নচেৎ তিনি নেবেন না। জাহাজের টিকিট কিনে প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। কাল ফিল্ম তোলা হবে।

নাটিকাখানির বিষয়বস্তু—দুই জমিদারের বহু দিনের পোষা বিরোধ ও শত্রুতা, একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ের অভাবনীয় প্রণয় আকর্ষণে, শেষ—তাদের বিবাহের মধ্য দিয়ে শুভমিলনে মিটে গেল।

দুই জমিদারের প্রত্যেকেই অপরের প্রতিযোগীভাবে ঐশ্বর্যবিকাশের আয়োজনে মুক্তহস্ত—শিল্পে, সৌন্দর্যে ও আড়ম্বরে। বিবাহসভায় নৃত্য-গীতাদির জন্য বোম্বাই, মহীশূর, মণিপুর, কাশ্মীর হতে নর্তকীরা এসেছে। বাংলার প্রসিদ্ধারাও আছেন,—প্রধানত তাঁরাই বাসরের আনন্দ বর্ধন করবেন।

ফল কথা, কাকারিয়া তাদের সৌন্দর্যের সাহায্যে তাঁর 'মরীচিকা-মঞ্চ'কে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে নাম কিনতে ও আমদানির পথ ক'রে নিতে চান।

স্টুডিওতে ফিল্ম তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে—প্রথম শ্রেণীর। সে জন্ম বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করাও হয়েছে।

দেশের খ্যাতনামা বিশিষ্ট পদস্থদের দর্শকরূপে নিমন্ত্রণ করাও হয়েছে। তাঁরা সজীব অভিনয়টা দেখবেন এবং তাঁদের অভিমত-মত কাটছাঁট পরিবর্তনও চলবে। কারণ, ক্রেতার সন্দেহভঞ্জনার্থ কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এসব শর্তও আছে।

শৈলর সঙ্গে কাকারিয়া-কন্যা রুক্মিণীর সাক্ষাতের পর থেকে তাদের সখিত্ব এখন ঘনিষ্ঠ, দেখাশোনা প্রায়ই হয়। স্টুডিওতে অভিনয়াদি থাকলে শৈলকে আনিয়ে উভয়ে গোপনে দেখে। 'মধুরেণ' নাটকখানির খাতা তাকে দিয়ে লুকিয়ে পড়িয়ে শোনে। আজও তাকে আনিয়েছে।

শৈলরও অভিনয়াদি দেখবার শখ স্বাভাবিক। বিশেষ, লেখাপড়া-জানা মেয়ে, নিজেও ভালমন্দ বুঝতে আরম্ভ করেছে। কি হ'লে বা কি করলে স্বাভাবিক ও ঠিক হয়, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে। কুমকুম নাম্নী যে সুন্দরী তরুণীটি 'পাত্রী'র মহলা দিতে আসে, তার দোষ-গুণ সমালোচনা করে। বলে, "ওভাবে দাঁড়ানোটা ভুল, ও-কথাটি ও-সুরে বলাটা মানায় না" ইত্যাদি।

শুনে রুক্মিণী হাসতে হাসতে বলে, "একদিন তুমিই ক'রে আমাকে দেখাও না ভাই। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, কুমকুমের চেয়ে তোমাকে ঢের বেশি মানাবে, ভাল দেখাবে। ওরা কেবল সেলাবতে থাকে, ঘ'যে মেজে চটক রাখে। সত্যি বলতে, না আছে সৌষ্ঠব, না সাইজ। শরম রাখে না ব'লেই পুরুষদের অত ভাল লাগে।"

রুক্মিণীর কথা শৈল উপভোগ করে, হাসে। বলে, "ওইটাই ঠিক বলেছ, আমাদের শরমে বাধে, আড়ষ্ট হয়ে পড়বার ভয় থাকে। নইলে শক্তটা আর কি, অনায়াসেই পারা যায়।" ইত্যাদি শুনলে মনে হয়, ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা মেয়েদের অভিনয়ের সাধ যে হয় না, এমন কথা বলা যায় না।

আজ সারাদিন কাকারিয়ার স্টুডিও-কম্পাউণ্ডে উৎসবের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। গেট, মঞ্চ, উদ্যান, লতামণ্ডপ—সবই জীবনে যৌবনে যেন স্পন্দিত হচ্ছে, অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। বিচিত্রবর্ণের আধার বিদ্যুতালোক-দীপ্তি বিচ্ছুরিত করবার অপেক্ষা করছে। কর্মীরা উত্তেজনা-চঞ্চল।

আজ 'মরীচিকা-মঞ্চে'র উদ্বোধন বললে হয়। আজকের সাফল্যের উপর কাকারিয়ার এই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই।

এইরূপ আসন্ন সময়ে শেঠজীকে না দেখতে পেয়ে কর্মচারীরা চঞ্চল ও চিন্তিত হয়ে এ-দিক ও-দিক চাইছিলেন।

কাকাবাবু হঠাৎ নিজের কোয়ার্টার থেকে বিশৃঙ্খল এলোমেলো বেশে, অবিন্যস্ত কেশে, চিন্তামাথা মুখে তারিণীবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।—"চল, একবার বম্বে থিয়েটরের মালিকের কাছে যেতে হবে, তাঁদের 'ফিমেল ড্রেসার' আছেন।" এই বলতে বলতে তারিণীবাবুকে মোটরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর চাঞ্চল্য দেখে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।— "এ আবার কেন?"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁরা ফিমেল-ড্রেসার রেশমীবাঈকে নিয়ে স্বচ্ছন্দ-ভাবে ফিরলেন ও তাঁকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন।

এদিকে সময়ের কিছু পূর্বেই বিশিষ্ট দর্শকেরা আসতে আরম্ভ করেছিলেন। কাকাবাবু সহাস্য উৎফুল্ল মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সকলকে অভ্যর্থনা ও আদর-আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করতে লাগলেন। রৌপ্যাধারে আতর, গোলাপ, পান, জর্দা, এলাচ, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ঘুরতে লাগল।

৫

মঞ্চ পুষ্পলতার পারিপাট্যে মালঞ্চে পরিণত ও আলোকোজ্জ্বল। বরাসনে বর ও সভা-শোভন-বেশে বরযাত্রীরা উপবিষ্ট কন্যাযাত্রীরাও উপস্থিত।

উভয় পক্ষের গুণী গায়কদের সঙ্গীতালাপাদি ও নর্তকীদের নৃত্য, পর্যায়-ক্রমে শ্রোতা ও দর্শকদের নয়ন-মন-রঞ্জনে সচেষ্ট।

দেব-দর্শন বরের মুখশ্রী, দেহসৌষ্ঠব ও সজ্জা, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ও মহিলাদের চিত্ত হরণ করছে।

লগ্ন উপস্থিত। বিবাহকার্য একে একে যথারীতি পর্যায়ক্রমে চলল, উৎসর্গ, স্ত্রী-আচার, কন্যা সম্প্রদানাদি।

তন্মধ্যে স্ত্রী-আচার দৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য। বিজলী-জ্যোতি-সমুজ্জ্বল প্রাঙ্গণে নানা বর্ণের বিদ্যুতের মত সুবেশা, পুলক-চঞ্চলা তরুণী ও যুবতীরা কলহাস্যে রহস্য-মুখরা ও সুযোগমত বরের কর্ণ-মর্দন তৎপরা। নিরীহ বর আজ মৃদুহাস্যে সবই সইছেন। অলঙ্কার ও বেনারসীর বিজ্ঞাপনের মত প্রৌঢ়া সুন্দরীর সুকোমল হস্তের বরণ-বৈচিত্র্য ও বরকে

চিরতরে ইঙ্গিতানুগামী পোষা পশুটী বানিয়ে রাখবার প্রক্রিয়া ও প্রবচন, সকলের পরিজ্ঞাত হ'লেও বেশ উপভোগ্য হ'ল। কনেকে সাত পাক ঘোরাবার পর—শুভদৃষ্টি।

বর ও কন্যা, উভয়ে উভয়ের সুপরিচিত, রিহার্সেল-ক্ষেত্রে নিত্য দেখা সুতরাং পরস্পরের 'make-up'—চাতুর্য দেখার ঔৎসুক্য ছাড়া, শুভদৃষ্টির আগ্রহ বড় ছিল না। উভয়েই ভাবলে, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে! কনের ঘোমটা খুলে দেওয়ায়, দেখে মেয়ে-পুরুষ সকলেই রূপ-মুগ্ধ হলেন। কেউ কেউ ভাবলেন, বাংলা দেশ সজ্জা-শিল্পে কি অভাবনীয় উন্নতিই করেছে, কুমকুমকে তো পূর্বেও দেখেছি, আজ যেন নুতন দেখছি।

এইবার হাফ-টাইমের অবকাশে, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের রাজসূয়ের ব্যবস্থামত ভূরিভোজন আরম্ভ ও সমাপ্ত হ'ল।

পরে কয়েকটি ছোটখাট আচার উপভোগ্যভাবে শেষ হ'লে, বরবধূর "উল্লসিত নাট্যশালাসম" বাসর-ঘরে প্রবেশ। রমণীকণ্ঠের সুমধুর রহস্যালাপ, নৃত্য-গীত। বরকে মধুর পীড়ন ও যুগলকে মধুর নির্যাতন চলল। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে রমণীরা বাধাহীন, স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল, যা ইচ্ছা বলতে পারেন। বরের অঙ্কে বধূকে তাঁরা বসাবেনই, বধূ কিন্তু নারাজ, লজ্জানত।

বধূকে বর চুপিচুপি বললেন, "ও কি করছ, রিহার্সেল-মত হচ্ছে না যে, এস।" বলে হাত ধ'রে টানতেই একেবারে গায়ে গায়ে। অবগুণ্ঠিতা বধূ ধীর কাতর অথচ বিরক্তি-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন, "পায়ে পড়ি, ছাড়ুন, বড্ড মাথা ঘুরছে।"

বর চমকে গেল, "এ কার কণ্ঠস্বর!" পরে রমণীদের প্রতি—একটু বাতাস করুন, শুতে দিন, শরীর ভাল নয়—"

শুনে কেউ হাসলেন, কেউ অবাক হয়ে বললেন, "এর মধ্যে এত! খুব মায়ার শরীর যে!"

কেউ বললেন, "এর পর আর সাধাসাধি করতে হবে না, মাথাও ঘুরবে না। মাথা ঘোরাবার জন্যে নিজেই ঘুরঘুর ক'রে ঘুরবেন।"

পরক্ষণেই সুন্দরীদের নৃত্যগীতে বাসর জ'মে উঠল। ও-সব ক্ষণিকের বিঘ্ন ফিল্মের কোনও অনিষ্টই করলে না, বাসরের স্বাভাবিক অঙ্গ ব'লেই লোকে বুঝলে।

সুন্দরী নির্বাচন ও অর্থব্যয় সার্থক ভেবে শেঠ কাকারিয়া উৎফুল্ল।

বরের মন কিন্তু নৃত্যগীতাদিতে ছিল না। তিনি ভাবছিলেন, এ তো কুমকুম নয়, কুমকুম নির্দিষ্ট অভিনয়ে এত আপত্তি করবে কেন? একটু আপত্তির ভাব থাকবে বটে, তারপর তো—। তবে এ সুন্দরী কে?

পদস্থ অভিজ্ঞ দর্শকেরা কাকারিয়ার পিঠ চাপড়ে প্রশংসাবাদ শোনাতে শোনাতে রাত তিনটের পর সব ফিরলেন।

ফিল্ম-ক্রেতা নিজে উপস্থিত থেকে সবই দেখলেন শুনলেন।

কুশণ্ডিকা বা বাসি বিয়ে শেষ করলে, বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে! সকালে আবার কাজ চ'ল। বর্তমান রুচি-বিরুদ্ধ হ'লেও তার আনুষঙ্গিক সব খুঁটিনাটিই তোলা হ'ল। নচেৎ কণ্ট্রাক্ট খারিজ হয়ে যাবে। ক্রেতা উচ্চবর্ণের হিন্দু-বিবাহের নিখুঁত চিত্র চায়।

কিন্তু দু-একটি স্থলে অসহায়া বধূ দর্শকদের লক্ষ্য বাঁচিয়ে চাপা গলায়, বরকে সংযত হতে বলতে বাধ্য হন।

স্বর শুনে বিস্মিত বর বধূর দিকে চমকে চাইলেন। দিনের আলোয় চিনতে আর বাধল না। অশ্রুসিক্ত পল্লবে বধূকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে! বর মুগ্ধবৎ ব'লে ফেললেন, "তুমি! অশ্রু কেন? দুঃখের কারণ কি? কেন? অভিনয় সার্থক হয়েছে শৈল, তাই তো বলি, এত রূপ আর কার?"

ছবি তোলা সুচারুভাবে শেষ হয়ে গেল।—শেঠজীর আনন্দের সীমা নেই। শৈলকে খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন, মঞ্চের বাইরে গাঁঠছড়া বাঁধা অবস্থায় বরবধূ কথাবার্তায় মগ্ন। তিনি কন্যা রুক্মিণীকে দেখাবার জন্য ডাকতে গেলেন।

৬

রুক্মিণী প্রচ্ছন্ন থেকে শুনলে—

শৈল বরকে বলছে, "এখন আমায় এই বেশেই আপনাদের বাড়ি নিয়ে চলুন নেপেনবাবু। আমি আর এখন বাপের বাড়ি যেতে পারি না, যাব না। সে যেমন নিয়ম আছে, সেই মত হবে।"

নেপেন ঠাট্টা ভেবে কথা কইতে গেল।

শৈল তাকে দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে দিলে, ঠাট্টা নয়। আপনি জানেন, বাবা সরল সাদাসিদে লোক, গরিব। কুমকুমের হঠাৎ 'কলিক' চাগায়, কাকাবাবু বিপন্নভাবে বাবাকে বিপদ জানিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। "কণ্ট্রাক্ট যায়, মান সম্ভ্রম যায়, ভবিষ্যৎ যায়, মুখ রক্ষা করুন। শৈলকে মাত্র সেজে দাঁড়াতে দিন, মেয়ে-ড্রেসার সাজিয়ে দেবে, কেউ চিনতে পারবে না।

"বিপদের সময় ব্যাপারটার গুরুত্ব কেউ ভাববার অবকাশ পান নি। বড়-লোকের অনুরোধ গরিবদের এড়ানো যে কত কঠিন তা আপনি জানেন, বাবাকেও জানেন,—তিনি অতশত ভাবেন নি। অভিনয় হ'লেও সর্বসমক্ষে বিধি-ব্যবস্থামত মন্ত্রপূত বিবাহ আমাদের যখন হয়ে গিয়েছে, আর ছবিও তার সাক্ষী হয়ে রইল, তখন আমায় আর বিবাহ করবে কে? ওঁরা কেউ তলিয়ে ভাবেন নি,—পতিতা নিয়ে তো এ কাজ করা হয় নি! একে আমার বাবা গরীব অর্থাভাবে আমার বিবাহ দিতে পারছিলেন না। এখন দশগুণ দিলেও কেউ আমাকে বিবাহ করবে কি?

"আপনি জ্ঞানবান গ্রাজুয়েট হয়ে আমার দশা কি করলেন? 'আমি কিছু জানতাম না'—এই সাফায়ে নিজেকে বাঁচাবার পথ পেতেও পারেন। কিন্তু আমাকে এ ভাবে ডুবিয়ে আত্মপ্রসাদ পাবেন কি?"

শুনে নেপেনের জিভ শুকিয়ে গেল। শৈলর কথা তো একটুও মিথ্যে নয়! সে চিন্তিতভাবে বিমর্ষ মুখে বললে, "আমরা নিজেরাই খেতে পাই না, নচেৎ এখানে বিশ-পঁচিশ টাকার লোভে, সেজে অভিনয় ক'রতে আসব কেন? তোমাকে সুখী করা দূরে থাক্, খেতে পরতে দেওয়াও যে আমার অবস্থায় অসম্ভব।"

শৈল বললে, "দুঃখের সংসারে আমি আজ তিন-চার বছর অনেক দুঃখ কষ্টের কথাই শুনে আসছি, আর তা বুঝতেও হয়েছে। তার মধ্যে একটা কথা, সংসারে সকলেই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে।—আমি কি কোন ভাগ্যই নিয়ে আসি নি?"

নেপেন নীরব।

শৈল শেষে বললে, "অভিনয়ের মধ্যে অনুচিত অভব্য ব্যাপারও বাদ যায় নি, যা অসাধারণ অভিনেত্রীদের সঙ্গেই সাজে। এর পরেও কি আপনি গরিব হিঁদুর মেয়েকে ঘরে না নিয়ে, মরণের পথে ঠেলে দিতে চান? তা

ভিন্ন এখন আর আমার কোন্ পথ রইল?"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শৈল নীরব হ'ল।

দৃঢ় স্বরে "চল, বাড়ি চল শৈল" ব'লে নেপেন তার হাত ধরলে।

রুক্মিণী গোপনে থেকে শঙ্খধ্বনি করলে।

# ভোলানাথের উইল

১

পূর্বে ভাগলপুর বাংলার অন্তর্গত থাকায় সেখানে বহু বাঙালীর বাস, অনেকেই সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে ক্রমে উন্নতির সহজ উপায় সকল উদ্ভাবিত হওয়ায়, যেমন একান্নবর্তিতাকে বাহান্নবর্তিতায় রূপান্তরিত ক'রে সত্বর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা ও স্বাতন্ত্র্যে সুখানুভব করা, সেইরূপ শিক্ষিত বিহারী বন্ধুরা বিহারকে বাংলা হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বাতন্ত্র্য খোঁজায় বাংলাকে বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রে ক্ষীণ হতে হয়; ভাগলপুরকেও সেই হতে হারানো হয়। পথের ধারে প্রাচীন বাড়ি ঘর বাগান আজও বাঙালীদের পূর্ব-সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

পবিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে ভোলানাথের পিতা ভবনাথবাবু চাকুরিসূত্রে ভাগলপুরে এসে বাস করেন। বাঙালীর সময়টা তখন মোড় ফিরছে—গ্রহ রন্ধ্র গত হবার রাস্তা নিয়েছে। আমরা স্বরাজের আওয়াজ পেয়েছি, বঙ্গভঙ্গে সকলে বেজায় উত্তেজিত, 'বয়কটে' উৎকট প্রেম, বিলাতী নিবের বদলে কঞ্চি দিয়ে "Your most obedient servant" লিখছি। এই তেরস্পর্শে মহাহর্ষে মেতে রয়েছি ও প্রভুদের শুভদৃষ্টি হতে হ'টে চলেছি—দিন দিন তাঁদের বিষ-নয়নের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ছি।

এই অবস্থায় অনেক বাবুর মত ভবনাথবাবুরও চাকুরি সইল না। মতি তখন উল্‌টো পথ ধরেছে। বাহবা সম্বলে বাহাদুরির হাসি হাসতে হাসতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির শান্তি-কুঞ্জে আগুন লাগল, আলো দেখা দিল বাইরে আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়,—ছাই পড়ল সংসারে, আঁধার হ'ল প্রিয়ার মুখ, আবদার ও কান্না বাড়ল সন্তানদের।

বাড়িতে থাকা দায়। সেগুলো হ'ল পাঁচিল-ঘেরা, ছাদ-আঁটা . গারদ—বেকারের বনবাস। কেবল নাই নাই—চাল নাই, ডাল নাই, বাজারের পয়সা নিত্য চাই, ঘুম না ভাঙতেই ভূতো জিলিপি চায়, লিলির তরল আলতা জবাকুসুম ফুরিয়েছে, ছেলের ইস্কুলের মাইনে চাই। পুজো যত কাছাচ্ছে, ভবনাথ কুঁজো মারছেন। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় প্রহরের দিকে চাওয়া বরং সহজ, কিন্তু মুখ তুলে পত্নীর মুখপানে চায় কার সাধ্য! আড়চোখে সশঙ্কে তাঁর

মেজাজটা যাচাই করতে গেলে হৃদ্‌কম্প হয়। চা-খাবার দু-চারটি ডেলি প্যাসেঞ্জার—সুধাংশু বিমল ডাক দিলে, ভবনাথের মুখ বুক দুই শুকিয়ে যায়; লিলি গিয়ে বলে, "এখনো দুধ আসেনি।"

কেরানীদের চিরদিন ধারই লক্ষ্মী, মুদী কিন্তু হাত গুটিয়েছে। কেরানী কোন দিন পয়সায় সচ্ছল নয়, সচ্ছল সে পোষাক-পরিচ্ছদে, সচ্ছল দেনায়। ভবনাথ কূল পাচ্ছেন না, পাশের বাড়ির গ্রামোফোনটা কানে কেবল বিষ ঢালছে।

বেচারার অবস্থা শুনে পূর্বপরিচিত মতিচাঁদ মাড়োয়ারী নিজের কারবার থেকে কাপড় প্রভৃতি কিছু মাল দিয়ে তাঁকে একখানি ছোট দোকান খুলিয়ে দিলে। ভবনাথবাবু বললেন, "বিলিতী কাপড কিন্তু রাখব না মতিচাঁদ।" মতিচাঁদ একটু হেসে বললে, "ব্যবসায় ওসব বিচার রাখবেন না, খরিদ্দার সে বিচার করুক। আপনাকে তো বিলিতী মাল কিনতে হবে না; সে তো আমি দিব।" তারপর বহু পরামর্শ, উপদেশ, শর্ত ও ব্যবসার গূঢ় মন্ত্র দিয়ে কাজ শুরু করিয়ে দিলে। তিন মাস সংসার চালাবার মতও কিছু দিলে, আর বললে, "যা যা বলেছি, ঠিক ঠিক সেই মাফিক চললে তিন মাস পরে আপনে চালাতে পারবে, সেই হবে আপনকার বুদ্ধির যঁাচ (যাচাই)।"

কয় মাসেই ভবনাথবাবুর জীবনে বিতৃষ্ণা ও সংসারে বৈরাগ্য দাঁড়াচ্ছিল, অবশ্য অভাবে; এমন সময় মাড়োয়ারী বন্ধুর সাহায্য ও উপদেশ পেয়ে উৎসাহের সহিত তিনি সাধনায় মন দিলেন। একে মাড়োয়ারীর পরামর্শ, তার ওপর ভবনাথবাবুর ঠেকে শেখা অবস্থা, দুয়ে মিলে অল্পদিনেই ব্যবসার ওপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি এনে দিলে। মতিচাঁদ খুশি হয়ে বললে, "ব্যস্, অব্ পাক্কা হো গিয়া। এর মধ্যে আর কিছু ঘুষিও না, রোজগারকে ধেয়ানমে চৌবিশ ঘণ্টা লাগা রহনা—সচ্চা আনন্দ ও-ই দেগা। আওর সব আনন্দ উসিকা গোলাম হায়। গোলামকো গদ্দিমে ঘুষনে না দেও, ইয়াদ রাখ্‌খো।"

গুরুমন্ত্রে শ্রদ্ধা রাখায় ভবনাথবাবু দিন দিন উন্নতি করতে লাগলেন এবং বিশ-বাইশ বৎসরের সাধনায়—অর্থ, বাড়ি, বাগান সম্পত্তি রেখে চ'লে গেলেন। যাবার সময় ছেলেকে সাধনায় দীক্ষা দিয়ে বললেন, "টাকা থাকলে তার মধ্যে সবই থাকে, মুখ্যানন্দ টাকাতেই, আর সব আনন্দ তার গোলাম—গৌণানন্দ। গোলামদের বাড়তে দিও না, গদিতে ঢুকতে দিওনা, তারা আসে

ডোবাতে।" আর ব'লে গেলেন, "আমাদের যেমন মোটা বিক্রির মরসুম আনন্দময়ীর আগমনে, সেইরূপ স্থানীয়দের মোটা খরিদের মরসুম "দশেরা" পর্বে, অর্থাৎ দশমীতে। সেইটে মাল সাবাড়ের বিক্রি। সেইটাই আনন্দ-ময়ীর নাম সার্থক ক'রে থাকে। উপদেশমত কাজ করলে সকলেই খুশি হবে, নিজেরাও কম আনন্দ পাবে না।" ইত্যাদি।

ছেলে ভোলানাথ ছিল পিতার বাধ্য ও যোগ্য পুত্র! কারবার পূর্বের মতই চলতে লাগল, বরং নবোদ্যম যোগ হওয়ায়, দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। আগমনীর সুর উঠতেই দোকানটিকে ভোলানাথ দর্শনরঞ্জন মালের প্রদর্শনীতে পরিণত ক'রে রাখলে। মায়ের ছিল ঘোটকে আগমনের কথা, তিনিও সত্বর এসে পড়লেন।

বেপরোয়া বাঙালীরা বাড়ির তাগাদামত আপিস যেতে আসতে দু-বেলা পূজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহালয়ার ( শ্রাদ্ধের ) দিনে শো-কেসে শাণিত 'মদনবাণ'-শাড়ি ঝুলতে দেখে তাঁরাও গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন, ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। ভোলানাথবাবুকে নগদ কিছু দিলেই তিনি খুশি, বাকি পরে দিও, কড়া তাগাদা নেই। সপ্তমীর মধ্যে বাঙালীদের খরিদ এক প্রকার শেষ, কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মত সস্তা কস্তা-পেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। এক জোড়া নিলেই ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারও একখানা হবে।

২

পূজার 'সেল' ভোলানাথকে খুশির স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে। এইবার সে দশমীর রেশমী মাল সাজাতে বসল। জাপানের পূর্বরাগরঞ্জিত সূর্যোদয়-মার্কা পেনি ফ্রক আর ব্লাউজে স্টোর-হাউসে নানা বর্ণের প্রজাপতি উড়তে লাগল। আনন্দে তখন নিজের অজ্ঞাতেই ভোলানাথের গলায় গুনগুন স্বর ভর করেছে, অবিচ্ছেদে চলছে। যদিও ভোলানাথের বংশে কেউ কোনদিন সঙ্গীত বা সুর চর্চা করে নি বা কেউ তা করতে শোনে নি, প্রকৃতই শত্রুতেও তাদের সে অপবাদ দিতে পারে না, তবু এরূপ হয়। অত্যধিক আনন্দের চাপেই ওটা অজ্ঞাতেই বেরোয়। এটাও তা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

মহাষ্টমী থেকেই 'দশেরা'র বিক্রি শুরু হয়েছে। হেনকালে যেন দৈব-প্রেরিতভাবে একটি যুবকের আবির্ভাব।

"এস, এস ভাই, বহুদিন দেখা নেই। কি করছ বল?"

বিদ্যানন্দ ভোলানাথের সহপাঠি ছিল। বললে, "পচিশ-ত্রিশ টাকার চাকরি করতে প্রাণ চাইলে না। আমাদের গ্রামখানি গণ্ডগ্রাম, অনেকেই ইংরেজী সভ্যতার স্বাদ-পাওয়া লোক। ইস্কুল, গার্লস-ইস্কুল থাকায়—কাপড়, জামা, শাড়ি, সেমিজ, ব্লাউজ, আর এসেন্স, সাবান, পাউডার, কলিনসের কাটতিতেই আমার দেশ চ'লে যায়। লোক রেখে স্যাণ্ডেল ও শু'ব (shoe) ডিপার্টমেণ্টও খুলছি। কাকেও আর টাউনে না আসতে হয়, ইত্যাদি। তোমার কারবারের নাম-যশই আমাকে এ পথে টেনেছে। আমি প্রায় হাজার খানেক টাকার সওদা করতে বেরিয়েছি ভাই। তোমার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রেই আমি মাল নিয়ে যাব। 'দশেরা'য় কোন্ মালের কিরূপ কাটতি, কোন্ ফ্যাশানের চাহিদা কিরূপ, তোমার নিশ্চয়ই ভাল জানা আছে। আমার এই ফর্দ নাও—তোমার ইচ্ছামত কাটছাঁট ক'রে তোমার পছন্দমত মাল দাও। আমি আজই নিয়ে যেতে চাই। বিকেলে পাঁচটার বাসে আমি রওনা হব ভাই।"

চা পান দিয়ে আর একটি সিগারেটের টিন খুলে দিয়ে, ভোলানাথ মাল-বাছাইয়ে মন দিলে ও কর্মচারীদের কাজে লাগিয়ে নিজে চেয়ার টেনে ব'সে দেখতে লাগল।—বিদ্যানন্দ ও তার সঙ্গীকে তাদের যাওয়ার আগে জল খাওয়ালেই হবে। লুচি তরকারি হালুয়ার অর্ডার বাড়িতে দেওয়া হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যানন্দকে রকমফের মাল "অ্যাপ্রুভ" করানোও চলল।

বেলা প্রায় তিনটে, কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বিদ্যানন্দ ঈজি-চেয়ারখানায় চোখ বুজে একটু নিশ্চিন্তে আরাম করছে।

*　　*　　*　　*

ভোলানাথ একদিনের জন্যেও পিতৃ-উপদেশ ভোলে নি। পরিবর্তনের মধ্যে স্ফূর্তি হ'লে নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে গুনগুনানি আসত।

পাশের আপিস-রুমে গিয়ে মালের দর-দামের হিসাব লেখা চলছিল। শেষ হ'লে কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে একা ব'সে হিসাবে চোখ বোলাতে বোলাতে, বাল্মীকির কণ্ঠে "মা নিষাদে"র মত, তার কণ্ঠ হতে সহসা—

"আজ বিদ্যানন্দকে গলেমে চাকু চালায়ি—ঈ-ঈ-ঈ—
মওকা পাকে কেয়া চাকু চালায়ি—ঈ-ঈ-ঈ—
হুঁ হুঁ, আরে বিদ্যানন্দকে গলেমে—"

এই কথাগুলি সুরে শব্দিত হয়ে উঠল।

এটা ছিল সত্যই একটা অভাবনীয় ঘটনা, তাই তাড়াতাড়ি একজন কর্মচারী উঁকি মেরে দেখে, বাবুইতো বটে! তারা কেউ মুখ টিপে, কেউ চোখ টিপে হাসলে, যেহেতু কেউ কোনদিন বাবুকে গাইতে শোনেনি।

যাক, কথাটা হচ্ছে—ঘটনার মাস কয়েক পূর্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে দুর্বৃত্তে হত্যা করে,—চাকু চালিয়ে নয়, রিভলভার চালিয়ে। ভিক্ষুকেরা অতশত জানে না, তারা পথে পথে বোধ হয় ঐরূপ গাইত, অবশ্য শ্রদ্ধানন্দের নাম ক'রে। ভোলানাথের কস্মিনকালে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না—কোনও গানও জানা ছিল না। শ্রদ্ধানন্দজীর হত্যায় সারা ভারত বিচলিত হয়। ভাগলপুরে কম উত্তেজনা দেখা দেয়নি। তাই বোধ হয় ভোলানাথের মস্তিষ্কে বিকৃতভাবে তার ভগ্নাংশ র'য়ে গিয়ে থাকবে। শ্রদ্ধানন্দের স্থানে 'বিদ্যানন্দ' যে কি ক'রে এলেন, সেটা বোঝা কঠিন নয়, যেহেতু ভোলানাথের মাথায় সারাদিন আজ পূর্বসহপাঠি আগন্তুক 'বিদ্যানন্দ' ঢুকে ছিলেন। আসল কথা, জয়দেবের পুঁথিতে "দেহি পদপল্লবমুদারমে'র মত ভোলানাথের মস্তিষ্কেও 'শ্রদ্ধানন্দ' বেমালুম 'বিদ্যানন্দ' হয়ে পড়েছিল। গান কখন আপনা-আপনি থেমেছে, তার খেয়ালও নেই, কারণ সেটা ভোলানাথের চেষ্টাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ছিল না। ক্লক-ঘড়িটায় চারটে বাজতে শুনে সে চঞ্চল হয়ে মাল বিক্রির বিস্তারিত হিসাবের কাগজটা নিয়ে উঠে পড়ল।

দোকানে ঢুকে দেখে, ঈজি-চেয়ারে বিদ্যানন্দ নেই। চারিদিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে. "বিদ্যানন্দ কোথায় গেল?"

একজন কর্মচারী বললে, "তিনি তো কিছুক্ষণ হ'ল উঠে গিয়েছেন, বোধ হয় অন্যান্য কাজ সারতে। বাসের সময় হয়ে এল, এখুনি নিশ্চয় ফিরবেন।"

মুহূর্তে ভোলানাথের প্রাণটা দ'মে গেল—"তোমরা আমায় জানাও নি কেন?"

"আজ্ঞে, তিনি কি করতে উঠলেন, সেটা তো তখন—"

ভোলানাথ মোটা টাকার হিসেব হাতে ক'রে ব'সে পড়ল।—"তার জলখাবার প্রস্তুত, সে গেল কোথায়?"

একজন কর্মচারী বললে, "তিনি তা হ'লে বোধ হয় খাবার কথা জানেন

না।—একবার খাবারের দোকানগুলো দেখি। বোধ হয়—"

"হ্যাঁ, (চঞ্চল হয়ে) আর দেরি করছ কেন বিধু? নিমাই, তুমি যে বড় দাঁড়িয়ে রইলে? উঃ, এদিকে যে সাড়ে চারটে—! দেখ, দেখ—"

কর্মচারী দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। মোড় ফিরেই দুজনের হো-হো হাসি। তারা সিগারেট বার ক'রে ধরালে। কর্মচারীরা বিড়ি খায় না, দোকানের মর্যাদা মাটি করে না।

বিধু বললে, "কি হ'ল বল দিকি ব্যাপারটা কি?"

নিমাই বললে, "আমিও বুঝতে পারতুম না, বাবু যদি না আপিশ-ঘর থেকে বেরিয়ে ঈজি-চেয়ার খালি দেখে 'আন্ঈজি' হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, 'বিদ্যানন্দ গেল কোথায়?'"

বিধু বললে "তাতে কি?"

নিমাই বললে, "তাতে কি? বাবুর গানটা শুনিস নি? 'বিদ্যানন্দকে গলেমে'—"

বিধু চিৎকার স্বরে—"ওঃ হো", হেসে তিন তুড়িলাফ মারলে।

নিমাই বললে, "ঠিক বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয়, ওই চাকুই সর্বনাশ ক'রে থাকবে।"

বিধু। নো সন্দেহ সার,—নাউ আই ক্যান সোয়ার!

নিমাই। গ্রহ যে কোন্ পথ ধ'রে মূকংকে করোতি বাচালং আর ঘরে আসা টাকা করোতি হরণং, তা দেবা ন জানন্তি। যাক, চল চল, এখন চলন্তি। (ব'লে বিধুর হাত ধরে টেনে নিয়ে) চল, চারুর রেস্তোরাঁয় চা খাওয়া যাকগে। বিদ্যানন্দ আর এ মুখো হচ্ছে না, নিশ্চয়ই সট্‌কেছে—"

* * * *

দুদিন নিলে ভোলানাথের বুদ্ধি থিতুতে। তার পর সোজা—পাকা প্রাচীন "মুসুবিদা মাস্টার" অ্যাড্‌ভোকেট অটলবাবুর কাছে গিয়ে উইল লিখিয়ে বাড়ি ফিরল। সংক্ষেপ মর্ম—

"আমার বংশে যিনি গীত-বাদ্যাদির চর্চা করিবেন, আমার কারবারে বা দোকানের স্বত্বে বা অংশে তাঁহার কোনও অধিকার বা দাবি থাকিবে না। এই শর্ত পুত্রাদি ও অন্যান্য উত্তরাধিকারী হইতে—জামাই, ভগ্নীপতি পর্যন্ত সম-প্রবল ও বলবান থাকিবে। গদিতে অস্ফুট গুনগুন শব্দ পর্যন্ত উক্ত ধারার অন্তর্গত রহিল, এবং গ্রামোফোনেরও প্রবেশ নিষেধ থাকিল।"

ভোলানাথ ফিরে এসে গম্ভীরভাবে বললে, "দাও, দু কাপ চা দাও।"

# অপরূপ কথা

বেকারদের আর কাজ কি? আহারাদির পর গুড়ুক-পর্বই ছিল তাঁদের শান্তি-পর্ব। সারা জীবন ন দেবায় ন ধর্মায়, পরসেবায় কেটেছে, এখন আর কেঁচে কিছু করবার উৎসাহ নেই। নিকটে কোথাও সত্যনারায়ণের কথা হলে 'কলাবতী'র কথা শুনে আসি, শিন্নিও খাই—তাতে যদি কিছু হয়। হাই উঠলে আপনা-আপনিই 'নারায়ণ নারায়ণ' বেরয়। পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে কথা শুনতে গিয়ে নয় বস্ত্রহরণ না হয় লঙ্কাকাণ্ড শুনে আসি। কোনো বীভৎস দৃশ্য দেখলে 'রাম' 'রাম' বলি। ধর্মকর্মের মধ্যে এই থেকে গেছে। বরং যখন চাকরি করতুম বেরবার সময় নিত্যনিয়মিত দুর্গানাম স্বেচ্ছায় আসত, বা ডানকান সাহেব সেটা টেনে বার করতেন, তা যে কারণেই হোক্। এতদিন কি আর আপিসের মূর্খ মেথরটা টেবিলের প্যাডখানা রেখেছে! তাতে দুর্গা-নামের ছড়াছড়ি ছিল। এখন আবার আপিসের সেই সব শুভানুধ্যায়ী মালিকদের কুইটের কথা কানে আসছে। কিন্তু বেইমানি করব কি ক'রে —তাঁরা কি না করেছেন? ধর্মও করিয়ে নিয়েছেন। যাক্—'দিন আগত ঐ', তাই মহাজাপক জয়ব্রহ্মশর্মার শরণ নিয়ে একটা শর্ট কাটের জন্য তাঁকে ধরে-ছিলুম। তিনি দয়া ক'রে 'আদিত্যহৃদয় স্তোত্রটি সময়মত নিত্য আউড়ো—আর কিছু করতে হবে না বলে দিয়েছেন। সেই শর্ট কাটটি বাগাতে তিনমাস লাগল। আহারের পর সেইটিই আওড়াবার চেষ্টা পাই, কিন্তু তার শেষটা পর্যন্ত পৌঁছবার অবসর কোনদিন পাইনা—শুভাংসি বহু বিঘ্নানি, চুল ধরে, ভুল ধরে, পাওনাদারেও এসে ধরে। আবার নিদয়ারাও আছেন—নাতনীরা বেলা তিনটের পর চুল বেঁধে দুল দুলিয়ে কোমর বেঁধে গল্প শোনবার দাবি নিয়ে হাজির হন। এ দাবিদারদের আবদার এড়াবার পথ নেই,—কোমলে কঠিনে মধুরে এ বিদ্যুৎপর্ণারা সাক্ষাৎ পাহাড়ী ঝরণা। ধর্মকর্মে ব্যাঘাত বহু।"

তাঁরাই আজ হাফ এ ডজন হাজির হলেন, প্রায়ই এ দয়াটা ক'রে থাকেন। তরুণী 'বিষুবরেখা' অগ্রবর্তিনী হয়ে সহাস-ভাষে বললেন, "আজ কিন্তু তোমার আদ্যিকালের রূপ কথা শুনতে আসিনি, তার জন্যে ক্যান্ত মাসি এখনো জ্যান্ত আছেন।"

আঃ বাঁচলুম, কিন্তু 'অর্দ্ধশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়'?

"বাঃ, বিদায় কে বলছে?"

তবে?

"সত্যি কথা—গল্প পড়ে পড়ে অরুচি ধরে যাচ্ছে। সবই যেন একছাঁচে ঢালা সেই মটর, বাস্, ট্রাম, সিনেমা আর গড়ের মাঠ, না হয় রেস্টোরা, ডেহেরি বা দার্জিলিং। হিরোরা সব সিল্কের পাঞ্জাবী-ঢাকা ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্ন। এ গরিবের দেশ বাংলায় এত কুবের-কুমারও ছিল। তা হোক, মিষ্টি জিনিসই বেশি মুখ মেরে দেয়, তাই আর তা ঘাঁটতে ইচ্ছা হয় না। এদিকে সময়ও কাটেনা।"

তাইত—বড় অশুভ সংবাদটা শোনালে দিদি। লাইব্রেরীগুলো তোমরাই রেখেছ, তোমাদের মুখ চেয়েই তারা বাড়ে। উঠ্‌তি মুখে তাদের বসিয়ে দিওনা, দেশের প্রতি দয়া রেখো।

শ্রীমতী তনুশ্রী বললেন, "বই আনাতেই হয়, হবেও, কিন্তু তাদের প্রথম আর শেষ অধ্যায়টি দেখে নিলেই কাজ হয়ে যায়। তার পব কি নিয়ে থাকি?"

শ্রীমতি বিষুব বললেন, "আজ তোমার দেখাশোনা মজার কথা কিছু শুনব।"

কেন আমাকে বিপদে ফেলবে ভাই।

"বিপদটা কিসের?"

সে কালও নেই, সে চালও নেই, এখন এটা জেণ্টলম্যানের যুগ, অর্থাৎ কৃত্রিমতার যুগ। মার্জিত নির্বাচিত ভাষার চলন! মেয়েদের মহিলা, স্ত্রীকে 'ওয়াইফ' ও 'তিনি' বলতে হয়। তখন ওসব দুর্ভাবনা ছিল না। সেদিনের কথা সেদিনের ভাষাতে না বললে ভালও শোনায় না, রসও থাকে না, কিন্তু তোমাদের তো তা রুচবে না!

"আমরা সেদিনের ভাষাতেই শুনব।"

আমিও যে তা ভুলে যাচ্ছি, ও ফ্যাসাদে আর ফেলো না।

"কেন, তোমার আবার ভয় কাকে?"

তোমরা যা ভাবছ—যমকে পার আছে কিন্তু যুগ আর জেণ্টলম্যানদের ভয় করতে হয়।

"বইটই তো পড়-না, কেবল অধ্যাত্মের দৌরাত্ম্য নিয়ে থাক, তাই ভয় পাচ্ছ। একখানা এনে দেখাব?"

কি বিপদ!—মাপ কর ভাই, বলছি। সে কালের সে ভাষা আমিও ভুলে গেছি, ভেজাল চলবে কিন্তু।

"তথাস্তু। আজ কাল অভেজাল কিছু আছে কি,—সে আমাদের সয়ে গেছে।"

তখনকার দিনে গৌরচন্দ্রিকা না ক'রে, কোনো মঙ্গলকার্য আরম্ভ করবার রীতি ছিল না। 'নারায়ণং নমস্কৃত্য'ত ছিলই। সে সব বাজে ব্যাপার এখন আর নেই। এখন সময়ের মূল্য বেড়েছে। সংক্ষেপে বলি। তখনকার সমাজ সম্বন্ধে কিছু না বললে বোঝবার সুবিধা হবে না—সুতরাং গৌরচন্দ্রিকার বদলে অ্যাপলজি হিসেবে সেটা জানাই।—

তখন অন্নকষ্ট বড় ছিল না, এখনকার মত অভাবে পেট মরে আসেনি—বসে বসে গুরু আহারই ছিল অভ্যস্ত। দিবানিদ্রাটাও ছিল। সন্ধ্যার পর জমিদার বা বড়লোকের বৈঠকে আনন্দ মজলিস বসত। গল্প, গুড়ুক, গান ও হো হো হাসি চলত—তবে তাঁদের ভাত হজম হত। বৈঠকের মধ্যে সকল রকমের লোকই থাকতেন। কেহ গল্পের, কেহ গানের, কেহ রসিকতার, কেহ সংবাদ সরবরাহের বা পর-চর্চার ওস্তাদ। মনুপরাশর-পড়া পণ্ডিতেরাও থাকতেন। সালিসি ও সমাজ শাসনের আসনও খালি থাকত না। আসলে তা ছিল কিন্তু সময় কাটাবার ও সমাজ দুরস্ত রাখবার জন্যে। আবার দুটি গ্রামের জমিদারদের মধ্যে কৌতুকচ্ছলে হারজিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। তার বিষয়-অনুসন্ধান ও উপায়-উদ্ভাবনের জন্যে সেরা সেরা ওস্তাদেরাও থাকতেন। এক কথায়, কাজের মধ্যে মজা ও আনন্দ নিয়ে থাকাটাই ছিল তাঁদের বড় কাজ। শেষটা কিন্তু প্রায়ই আকচে দাঁড়িয়ে যেত।

থাক্, তোমরা শিক্ষিত মেয়ে, এই পর্যন্ত যথেষ্ট, তোমাদের বুঝতে বাধবে না।

"বাঁচলুম, ধন্যবাদ। এইতেই হাঁপিয়ে উঠেছি—গল্পে আবার এত হাবড়হাটি চণ্ডীপাঠ কেন? আরম্ভ হোক না? পাতালের কথা, পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা বুঝতে পারি আর পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত বেকারদের কথা বুঝতে পারব না?"

সে কি কথা—পারবে বইকি। তোমরা আবার বুঝতে পারবে না এমন কিছু আছে নাকি! তা বলছি না, তবে এটা রূপকথা নয় কিনা, তোমরা

আজ 'অপরূপ' কথা শুনতে চেয়েছ যে। যাক—তবে শোনো, একটা কথা স্মরণ রেখো কিন্তু—বৃদ্ধেরা একটু বকেন বেশি, সেটা ক্ষেমাঘেন্না ক'রে যেও—

শিবকালীবাবু, আমাদের শিবুদা, 'ডফের' ইস্কুলে প'ড়ে গাঁয়ের রত্নবিশেষ দাঁড়িয়েছিলেন। 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' মুখস্থ, 'কাণ্ট' 'হেগেল' সড়গড়,—বিদ্যের জাহাজ বললে হয়। ডফ সাহেব ছিলেন মেকেঞ্জি-লায়াল কোম্পানির সিনিয়ার পার্টনার। শিবুদাকে বড় ভালবাসতেন, নিজের আপিসে মোটা মাইনে দিয়ে—সেল মাস্টার ক'রে নেন। মধ্যবিত্তের অবস্থা ফিরতে বিলম্ব হযনি,—সেই সঙ্গে নাম-ডাকও। দ্বিতীয় বর্ষেই বাড়িতে মা দুর্গার আবির্ভাব—গ্রামস্থ ভোজ ও কাঙালী-বিদায়। পয়সা হ'লে তখনকার দিনে এই সবই প্রধান কর্তব্য ছিল। স্বর্ণকারের নিয়মিত গতিবিধি, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় বাস বা ছুটিছাটায় স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদলাতে সস্ত্রীক যাওযার চলন হয়নি।

শিবুদা বরাবরই ছিলেন বিনয়ী, বাধ্য ও মিশুক এবং সকলের প্রিয়। বড় ছোট সকলেরই ভালবাসার পাত্র। পয়সা ও পদবৃদ্ধি হলেও তিনি পূর্বের মতই থাকতেন। তাই শ্রীনাথ বাবুর ( অর্থাৎ, বডদের ) আসরে সকলে তাঁকে সাগ্রহে ও সমাদরে দলভুক্ত ক'রে নিযেছিলেন।

একটি বিষযে শিবুদা কিন্তু অন্যান্য সকলের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেটা ইংরেজি ইলেমের দোষেই বোধ হয়। বয়স প্রায় ২৫।২৬ হলেও তখনো তিনি অতি প্রয়োজনীয় বিবাহ কর্মটি করেন নি। প্রায়ই শুনতে হতো —'সে কি হে হিঁদুর বাড়ি সিঁদুরের ছাপ না থাকলে ধর্মকর্মে দাবি থাকে না,—সস্ত্রীকো ধর্মাচরেৎ, বুঝেছ' ইত্যাদি।

অবন্তিকা বললেন, "এ নিয়মটি তো বিশেষ মন্দ ছিল না, উঠে গেছে নাকি?"

তোমরাই অন্তরায় হ'লে যে!

"কিসে—হাউ?"

তোমরা কোমর বেঁধে কলেজে ঢুকলে। ক্লাসে ট্রিগেনোমেট্রির ফরমুলা নিয়ে ব্যস্ত! বাড়িতে মৃদুলা কেঁদে উঠলে তাকে মাই দেবে কে?

কথাটা ইনডিসেণ্ট হল ব'লে সব মৃদু হাস্যে মুখ বাঁকালেন।

হল! আমি তো আগেই সে কথা বলেছিলুম। তোমাদের তো খাঁটি মাতৃভাষা আর রুচতে পারে না, ভাই।

"আচ্ছা আচ্ছা বলো, আর বাড়াতে হবে না—"

With your permission—তবে শোনো—ওদিকে গঙ্গাপারের গাঁয়ের জমিদার কালীকিঙ্কর চৌধুরী শিবুদাকে ভগ্নিপতিরূপে পাবার জন্যে হন্যে হয়েছিলেন। তাঁরও মজলিস ছিল, দলও ছিল, এ গাঁয়ের সঙ্গে পরিচয় ও হারজিতের প্রতিযোগিতাও ছিল। সম্পর্ক-বদ্ধ হলে দুই গ্রামের আসর জমবার উপায় বাড়বে ও বজায় থাকবে, তাই এ গ্রামের এঁরাও হামরাই হয়ে সাহায্য করেন, শিবুদার বিবাহও হয়ে যায়।

শিবুদা এখন সংসারী। নৃত্যকালী বডঘরের মেয়ে, ধাধসটাও সেই মেকদারের · দুধ, ক্ষীর, রসগোল্লায় গড়া শরীর। দেখতে কার্তিকের মত একটি ছেলেও হয়েছে, কিন্তু ক্ষীর ছানা খাইয়ে খাইয়ে অধুনা সে গণেশে দাঁড়িয়ে গেছে। সকলে আদর ক'রে তুলতুল বলে ডাকে। আলগোছে কোলে নেয়—পাছে টোল খায়।

নেত্তকালী সংসারের কাজকর্মে অভ্যস্তা নন, জমিদার-বংশের রীতি রক্ষা ক'রে চলেন; অন্যে চুল বেঁধে দিলে পছন্দ হয় না বলেই সে নিষিদ্ধ কাজটি কিন্তু নিজে করেন। পানটা দিনরাত খান—সেটা চাকর-দাসীদের দ্বারা মনোমত হয় না বলেই নিজে সাজেন। অভ্যাসবশে নিদ্রিতাবস্থাতেও পানের জাবর কাটেন। আর তাস খেলেন। বড় ঘরের এই ভাগ্যলব্ধ ঐশ্বর্যটি শিবুদা হাসিতামাসায় হজম করেন।

দিনটা ছিল শ্রাবণের একটা ঝাপসা দিন—লেখাপড়া সম্ভব নয়, বাতি জ্বেলে ক্ষতি মাত্র, তাই বাবটাব পরেই সেদিন আপিস বন্ধ হয়ে যায়। ঘি-মাখা গরম মুড়ি ধানি লঙ্কা যোগে ভোগের ব্যবস্থা দিয়ে, হলঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে, স্থূলাঙ্গী নেত্তকালী হাত-পা মেলে চিত হয়ে beg your pardon, I mean, ছাতমুখী হয়ে ঘুমুচ্ছিলেন।

সকলে হেসে উঠল, "ভারি সামলেছ দাদামশাই।"

রমাপতিবাবু শিবুর জ্যাঠতুতো ভাই, পাঁচ-সাত বছরের বড়। ফার্সিতে পণ্ডিত, মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকরি করেন। তাঁদেরই কাজে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন—বাড়িতে শিবুর কাছেই ছিলেন। খুব আমুদে মজলিসি লোক, হাসি তামাসা নিয়েই থাকেন। ফার্সি-পড়া লোক, গল্পের গুদোম। তাঁর কাছে গল্প শোনবার জন্যে সকল আড্ডা থেকেই তাঁর ডাক পড়ত। খোসপোশাকি সুপুরুষ, হাসিমুখ—তাঁর কাছে ছোট ছেলে মেয়েদেরো সংকোচ ছিল না, তিনিও সকলকে ভালবাসতেন। পথে ঘাটে

ছেলেপুলে দেখলে কোলে তুলে নিতেন, কেউ ভয় পেত না। এমন ভাবে ও এমন সুরে সুমিষ্ট কথা কইতেন যেন কত পরিচিত। তাঁকে দেখতে পেলে ছেলেরা মায়ের হাত ছেড়ে ছুটে আসত, এই তাঁর পরিচয়।

বেলা তখন তিনটে হবে—মেয়েদের সেটা নিশ্চিন্ত সময় দু-তিন ঘণ্টা ছুটি। রমাপতিবাবু বারবাড়িতে শুয়ে শুয়ে 'আলিফ্ লায়লা'—অর্থাৎ আরব্য উপন্যাস পড়ছিলেন। ওপাড়ার কর্তাদের আড্ডা থেকে রসময় সুর এসে বললেন, 'এই যে জেগে আছেন—ভালই হয়েছে।'

রমাপতিবাবু বললেন, 'যারা চাকরি করে তাদের ও বদঅভ্যেস পোষায় না। রোগ না দয়া করলে দিনে ঘুম চলে না, দাদা। কেন বলুন দিকি —ব্যাপার কি?

রসময় সুর বললেন, 'নবীনবাবু (জমিদার) আজ আড্ডায় এসে হাজির, বললেন, এমন বাদলার দিনটে ঘুমিয়ে মাটি করব না, তাই চলে এলুম, খানসামা নফরাকে বলে এলুম—এক ধামা গরম মুড়ি আর মিঠে হাজা'র গাছের গোটা দশেক নারকোলের 'কুরো' নিয়ে আসতে। আর আমাকে বললেন, চট্ ক'রে রমাপতিকে ডেকে আন, মুড়ির সঙ্গে গল্পের মজলিস জমবে ভালো!'

'নারকোল আবার কুরে আনতে বললেন কেন?'

'কর্তাদের দাঁতের দমক আছে কি? দাঁত থাকলে মাতব্বরদের মানায় না।'

'তা বটে, ওটা ভগবানের দয়া। ফোকলা না হলে কর্তা হয়ে সুখ নেই। ফকারটা ফস্ ফস্ ক'রে বেরিয়ে আসে—ফাঁকি, ফন্দি, ফাঁড়া সহজেই বেরবার ফাঁক পায়, ফ্যাসাদ ফুরোয় না, গ্রাম সায়েস্তা থাকে। আমারও ঢেলে মারছে দাদা, বড়জোর আর পাঁচ-সাত বছর।'

রসময় বললেন, 'না এখনো ঢের দেরি। এখন উঠুন, সকলেই আপনার জন্যে উদ্‌গ্রীব।'

'এই যে, কাপড়টা ছেড়েই যাচ্ছি। খবর দিনগে, মিনিট পনেরোর মধ্যেই হাজির হব।

রসময় চলে গেলেন, রমাপতিও উঠলেন।

শ্রীমতী আকস্মিকা- বললেন, "দাদা মহাশয় তুমি বড় শা-খরচে দেখেছি ওকথার পর রমাপতিবাবু উঠবেন না তো কি ঘুমতে যাবেন! আমরা ওটুকু

বুঝতে পারি, অত কষ্ট পাবার দরকার নেই।”

থ্যাঙ্ক্ ইউ দিদি, এই দয়াকেই দরদ বলে। আমার কষ্টটা সইতে পারছ না—লাগছে!

আকস্মিকা। আহা আমার ভারি বয়ে গেছে।

তাই বলো—বাঁচালে। আমি বলি আমার কষ্ট দেখে আবার প্যাসাদে ফেলে কেন।

“থামো থামো, ভারি গরজ কিনা।”

আমি ত তাই জানতুম ভাই, রাগ কোরো না—ভুল হয়েছে।

‘রমাপতি উঠলে’ বলে ফেলেছি, ওটা অভ্যাস দোষ, বঙ্কিমবাবুরও ছিল—‘সেখজী তুমি বড় ঘামছ’ বলার পর দয়াময়ী বিমলা যে বাতাস করতে চায় সেটা কি আর তোমাদের বুঝতে বাকি থাকে? তবু তিনি বাতাসের কথাটা লিখে ফেলেন। তোমাদের মত সূক্ষ্ম সমজদার তখন ছিল না বোধ হয়—

বিষৎ। তুমি যা বলছিলে এখন বলো ত—কেবল হাবড়হাটি!

হ্যাঁ—এই যে ভাই,—হোচোট্ খাওয়ালে কিনা, যাক্—

রমাপতি ছিলেন বাবু লোক, একটু ছিমছাম না হয়ে বেরুতে পারেন না—সাজ বদলাতে গেলেন। দিনটা ঝাপসা তো ছিলই বাড়ি ঢুকতেই অন্ধকার ঠেকল। হলঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়—ঢুকে পড়ে অভ্যাসমত সট্ নিজের ঘরে গিয়ে উপস্থিত। নেত্তকালীর নাক ডাকার কথাটা আর তোমাদের কাছে বলব না। সেইটাই তাঁকে সাইরেনের মত সাবধান না করলে বিপদ ঘটত, ‘তুলতুল’ ঘুমোয়নি—চিনতে পারলে ছাড়ত না।

রমাপতি কাপড়-কামিজ বদলাতে বদলাতে ভাবতে লাগলেন, ‘তাই তো বউমা ওঘরে ঘুমুচ্ছেন, রসময়কে ১৫ মিনিট বলেছি, কি করি! যেতে তো হবেই।’ কটকের ছড়িগাছটা ঠুকতে ঠুকতে, ‘তুলতুল,—তুলতুল কোথায় রে বাবা’ ব’লে আওয়াজ দিতেই তুলতুলের হুঙ্কারে তার মাও জেগে উঠলেন। তুলতুল হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পড়ে গেল—‘আহা, আহা, এসো’ ব’লে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বেরুবার মুখেই বাধা, হরপিসি দাঁড়িয়ে!

রমাপতির ভূতের ভয় ছিল কিনা জানি না, চমকে গেলেন।—‘পিসি নাকি, ভাল দেখতে পারছি না। এ সময়ে বেরিয়েছেন, এই সবে বেলা তিনটে যে! খবর ভাল তো সব?’

'বিধবাদের আর ভালমন্দ কি বাবা, দিন কাটে না।'

রমাপতি। আপনার ওকথা শুনব কেন, আমি সব জানি। তিনবার গঙ্গাস্নান, দিনরাত পূজাহ্নিক নিয়েই কেটে যায়। কি সুন্দর অভ্যাসই করেছেন, পরমার্থ চিন্তা সব চেয়ে কঠিন সাধনা,—ক'জন পারে!

পিসি খুশি হলেন, বললেন, 'ও কিছু নয়, কাশীনাথের বংশ, ওসব জন্মের সাথে পাওয়া। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার ত করাই উচিত, বাবা। কেউ করেন না এই দুঃখু। পুজো থেকে উঠে ভাবলুম, সন্ধে হয় বুঝি। সকলের খোঁজ খবরও যে নিত্য নিতে হয়, কে কেমন আছে, কার কি দরকার—সেবাটাও যে বড় ধর্ম বাবা,—তিনি (স্বামী) বলে গেছেন—'

রমাপতি। যে ক'দিন থাকেন গ্রামের মঙ্গল,—দেখে সব শিখুক।

পিসি। ছাই শিখবে, কেবল ঘুমোনো আর পান খাওয়া। কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

রমাপতি। কর্তারা ডেকে পাঠিয়েছেন পিসি, কিন্তু তুলতুল যে পেয়ে বসল। পিসির কোলে যাবি তুলতুল?

তুলতুল বুঝুক না বুঝুক, আঁকড়ে রইল।

হঠাৎ মশ্ মশ্ ক'রে জুতোর শব্দ। 'কে আবার' বলে পিসি আবক্ষ-ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াতেই 'কাকে দেখে ঘোমটা দিচ্ছ পিসি' বলতে বলতে শিবুর প্রবেশ!—'দেখে ঘোমটা দিতে হয় এমন কেউ বেঁচে আছেন নাকি?'

'ও মা শিবু! ষাট্ ষাট্—বেঁচে থাকবে না কেন—এঁড়েদার আদু, গাঙুলিদের যাদু, বয়সে ছোট হলেই বা, মানী লোককে সমীহ করতে হয়। এসব শিখতে হয়, বাবা। কেবল খ্যাঁকশালি আর মুরগির ডাকের কথা পড়ে আর কি শিখবি। আমি বলি, রমাপতির দেরি দেখে জমিদার নবীন মোড়ল এলেন বুঝি। তাকে ডেকেছেন কি না। তুমি আর দেরি কোরো না রমাপতি—যাও, যাও। শিবু তুমি তুলতুলকে নাও,—ওকে ছেড়ে দাও।'

শিবু। আয় রে তুলতুল, তোকে একটা সুন্দর পুতুল দেব। কেমন ডাকে! আয়—। (সে রমাপতির কাঁধে ততই মুখ গুঁজে থাকে।) দাদাকে পেয়েছে, ওকি আসবে পিসি?

'পুতুলটা দেখলেই আসবে।'

পুতুলটা শিবুর পকেটেই ছিল, পিসির সামনে শিবু বার করতে পারছিল না,—শেষে বার করতেই হল। একটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রংবেরংয়ের মুরগি।

'সর্বনাশ! তোরা একেবারে গেলি! হিঁদু মোছরমান তফাত রইল না। জাত জন্ম গেল। আবার দুধের বাছাটাকে এখন থেকে—না—আর আসা হবে না, এসে পড়েছি, দুটো কথা কয়ে যাই—'

'সে কি পিসিমা, টিনের একটা রং করা পুতুল বই তো নয়।'

'ঐ টিনই একদিন জ্যান্ত হয়ে—দুর্গা দুর্গা। তবে আর কি বলব, যা বলতে দাঁড়ালুম—দেখছি ব'লে মুখ নষ্ট করা হবে। ভবিষ্যতে গর্ভ থেকে আরো কত কি রত্ন বেরুবে বলে বাবুদের বউয়েরা ব্যথা খাচ্ছে—হরিই জানেন।'

তুলতুল পুতুল দেখে হাত বাড়ালে। 'নাও, এইবার কোলে নাও।' পুতুলটা হাতে দিয়ে কোলে নিতেই সেটার পেটে চাপ পড়ায়—'কু ক্কু ক্' ডেকে উঠল। পিসি কানে আঙুল দে পাঁচ পা সরে দাঁড়ালেন—ছোঁয়া-ছুঁই না হয়। রমাপতিকে চলে যেতে ইশারা করলেন। রমাপতি বাঁচলেন, চিন্তিতভাবে চলে গেলেন।

কুঞ্জশোভা গোঁজ গোঁজ করছিল, বললে, "সেকেলে অভব্য গ্রাম্য কথাগুলো কি আমাদের সামনে বলতে তোমার আটকায় না?"

বড় ভুল হয়েছে, দিদি। আমি কিন্তু পিসির মুখের কথাটাই বলেছি, তাকে করেক্ট্ করবার সাদ্দি বিদ্যাসাগরেরও ছিল না, ভাই। যাক্, সাবধান হলুম একটু চ্যারিটেব্‌লি শোনো ভাই।

সকলে তথাস্তু বলে হাসলেন।

বিষ্ব বললে, "তোমার কাছে বহুত ক্ষেমাঘেন্না নিয়েই আমরা আসি।"

Very very kind of you—এতক্ষণ গল্পটার আখড়াই চলছিল নট-নটী পর্যন্ত। এইবার পালার সূত্রপাত—ব্যতীপাত বাদ দিয়ে শোনো ত বলি—

"তার মানে? শুনতেই ত এসেছি।"

তবে শ্রবণ করো—

রমাপতিকে সরিয়ে দিয়ে পিসি বললেন, 'শিবু আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরলে? আপিসের খবর ভালো তো? একটু এদিক উদিক দেখলে যে মনটা চমকে যায়, পোড়া মেয়েমানুষের যে সর্বদাই তোমাদের জন্যে চিন্তা।'

শিবু হেসে বললে, 'ভাববেন না, আপনাদের আশীর্বাদে খবর সব ভালোই। দিনটা ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে, লেখাপড়ার কাজের সুবিধে হয় না কিনা, সাহেব তাই সকলকে আজ ছুটি দিলেন।'

পোড়ারমুকোদের বাতি জুটল না বুঝি?'

শিবু হাসিমুখেই বললে, 'আসল কথা—ওদেব দেশের দিনগুলি প্রায় এই রকমই, সূর্যের মুখ কমই দেখতে পায়। আজ দেশের মত দিন পেয়ে আমোদ প্রমোদ, খানাপিনা করতে গেল।'

'হা—চুলোয যাক্, পরের কথায় আমাদের কাজ কি! নিজের ঘর ঠিক থাকলেই হল। দিন যায় না ক্ষ্যান যায়—কারুর পোষ মাস কারুর সর্বনাশ যেন লেগেই আছে। ভাবলুম নেত্তর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি,—আহা বউ মানুষ বেরুতে পারে না! কি কুক্ষণেই পা বাড়িয়েছিলুম বাছা, এতটা বয়সে যা দেখিনি তাই আজ দেখতে হ'ল। বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি—ছি ছি, চোখ দুটো অন্ধ হ'লেই ছিল ভাল।'

'কেন পিসিমা কি হল?'

'আর কি হল! বড় ঘরের মেয়ে কিছুর তক্কা রাখে না, তা ব'লে ধর্ম তো রেহাই দেবে না।'

'কি হয়েছে পিসিমা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, এখনো তো বাড়ি ঢুকিনি, কোনো কথাই তো হয়নি।'

'একটু আস্তে কথা কও, আমাকে যে সব দিক দেখতে হয়। বলে, দ্যালেরও কান আছে। ভাগ্যে আর কেউ না এসে আমি এসে পড়েছিলুম। আমার দেখাও যা, গাছপাথরের দেখাও তাই। ও-পাড়ার মণি গিন্নি এলে আজ কি হত বল দিকি?'

শিবু একদম থ।

পিসি ছিলেন গ্রামের গেজেট, মর্দানা গলা। সেকেলে কবি গাইয়েদের দোয়ার হার মানত। শিবুর গলা সেখানে তলায় পড়ে থাকে, কথা ভোঁতা মেরে যায়।

তবু বললে, 'কথাটা কি বলোই না পিসিমা। আমাকে যে ভাবিয়ে তুললে।'

'ভাবনার তো কথাই—বলতে যে আমার গা শিউরে ওঠে, শিবু। আমার গঙ্গাজলের শরীর, জগবন্ধু দর্শনে গিয়েছিলুম, তাও গঙ্গাজল নিয়ে।'

শিবুদা আর পারছিলেন না—বিরক্তি আর ক্লান্তি আসছিল। শেষ বললেন, 'তবে থাক, পিসিমা। যা বলতে আপনাকে শিউরুতে হয়, পাপ স্পর্শ করে, এমন কাজ আমি আপনাকে করাব কেন? আমাদের যা হয় হবে, তা বরং সইতে পাবব।'

'সে কি শিবু, আমি কি তোদের পর? তাই ভাবিস বুঝি! আমার অদেষ্ট রে, ভালো ভেবে এলে মন্দ হয়ে দাঁড়ায়। নেত্তকে দেখতে এসে, দোরে না মাথা গলাতেই যা দেখলুম তা বাপের জন্মে দেখিনি; মাথায় যেন কে বাড়ি মারলে, মাথা ঘুরে গেল, আর এগুইনি। নেত্ত বুঝি বড ঘরে মাতুর পেতে ছেলে নিয়ে শুয়েছিল। কে একজন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঘরে ঢুকতেই ভয়ে তুলতুল কেঁদে উঠল। সে খপ্ ক'রে ছেলেকে কোলে তুলে নিলে। কে-র‍্যা বলতে যাচ্ছি, দেখি রমাপতি বেরিয়ে আসছে। বললে, 'পিসিমা নাকি, ঝাপসায় ভালো দেখতে পাচ্ছি না', আরো সব কি! আমার তখন কি কান আছে—যেন পাহাড় থেকে খড়ে পড়ে গেছি।'

'কেন—হঠাৎ কি হল, পিসিমা?'

'ওমা, এখনো তোর মাথায় আসেনি, তোরা হলি কি? নেত্তও খুকিটি নয়, রমাপতিও ছেলে মানুষটি নয—তায় ভাসুর ভাদ্দরবউ সম্পর্ক! এক বিছানা থেকে ছেলেকে তুলে নেয় কি ক'রে? নেত্তও তো মাতুর ছেড়ে দূরে যেতে পারে? হিঁতুর ঘরে কি কাণ্ডটা হল বল্ দিকি? ভাগ্যিস আমি এসেছিলুম। বলেছি তো—আমার দেখা শোনা আর গাছপাথরের দেখা শোনা সমান, পশুপক্ষীটিও জানবে না। নেত্ত যেন বড মানুষের মেয়েই আছে, তা বলে সমাজ তাকে ছাড়বে কেন, ধম্মো তো ছাড়বেই না। যাক্ —আর কেউ তো দেখেনি, চেপে গেলেই হবে। কিন্তু তুমি বাবা তাকে খুব সাবধান ক'রে দিও, আমার এই কথাটি রেখো। আমি ভেতরে আর যাব না, গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে যাই,—মা পতিতপাবনী।'

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। দু'পা গিয়ে ফিরে বলে গেলেন, 'ভাবিসনি,—একথা লোহার সিন্দুকে রইল।'

পিসিমার আবির্ভাবটা যেন ভৌতিক ব্যাপার, তিনি 'চণ্ডু' নাবিয়ে গেলেন। ছিলেন সকলেরই শুভানুধ্যায়ী, সকল বাড়িতেই একবার ক'রে টহল দেওয়া ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। ভারতের সকল তীর্থের পবিত্র রজ, মাতুলিরূপে ছিল তাঁর হস্তগত। তার এক একটির ইতিহাসের ত্রাসে, মেয়েরা থাকতেন সশঙ্ক।

মেয়েরা মেয়েদের ভাল চেনেন। পিসি বেশ জানতেন, কোনো আড়াল থেকে নেত্ত সবই শুনছে। তাঁর উদ্দেশ্যেও ছিল তাই।

অবন্তিকা বলে উঠলেন, "ভারি ভুল বকছ দাদামশাই, কি নজিরে বললে —মেয়েরা মেয়েদের ভাল চেনেন?"

নিজেদের নজিরে, ভাই—আমরা পুরুষদের যে—

"না, আমরা তোমাদের চেয়ে পুরুষদের ভালো চিনি।"

ভেরী গ্ল্যাড্, দিদি,—কবে থেকে? নিমন্ত্রণ পত্র পাইনি তো—

"তা না হ'লে বুঝি—"

বিষুব বললেন, "ও কথা পরে হবে অবন্তি, এখন গল্পটা একটু ইণ্টারে-স্টিং ঠেকছে, শোনাই ভালো।"

খুব সামলে নিলে দিদি। (বিষুব হাসলেন।)

শিবুদা প্রমাদ গনলেন। পিসিমার আশ্বাসবাণীগুলো যে উল্টো পথে চলে এবং সুবিধা বুঝে বেঁকেও চলে তা তিনি বিশেষ জানতেন। আবার দলপতিদের তিনি সম্মানিত এজেণ্টও। শিবুদা শিউরে উঠলেন। তাঁকেও তাঁরা সেই বলিষ্ঠ দলের মেম্বার ক'রে নিয়েছেন। তাঁরা এমন একটা ধর্ম-সংশ্লিষ্ট অকস্মাৎলব্ধ ঘটনা কারো খাতিরে খোয়াতে পারেন না—সেটাও জানেন। পিসির সাক্ষ্য যে ফাইন্যাল্ তাও তাঁর অবিদিত ছিল না। এত-গুলি জানার দুর্ভাবনা তাঁকে অকূলে ফেলে দিলে। তিনি মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

নেত্তকালী দোরের পাশেই গা-ঢাকা ছিলেন ও সব কথাই শুনেছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে স্বামীর হাতটা খপ্ ক'রে ধরে বললেন, 'আমি সব কথাই শুনেছি। —কি—হয়েছে কি? অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়। এসো হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাবে চল। কোন্ সকালে বেরিয়েছ,—আজ তো আর আপিশে কিছু খাওয়া হয়নি,—এসো।'

শিবুর মুখে, কেবল একটু ম্লান হাসির রেখা না ফুটতেই মিলিয়ে গেল।

নেত্তকালী বলে চলল, 'মিছে কুচ্ছ কুড়িয়ে আর কুচ্ছ বানিয়ে বেড়ানোই ওঁদের কাজ,—তা তো সবাই জান। ওঁর ওইতেই সুখ, ওইতেই আনন্দ। বালবিধবা পিসির আর কোন্ সুখ আছে? ওঁকে সুখী করাও তো আমাদের কাজ। উনি যাতে সুখী হন্ তাই করুন্। এখন এসো।'

শিবনাথ নেত্তকালীর জন্যেই আকাশ পাতাল ভাবছিলেন। তাঁরি মুখে

এমন অভাবনীয় মিষ্ট মুক্তিযোগ শুনে বল পেলেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নেত্ত, সত্যিই বড় খিদে পেয়েছে,—চল।'

নেত্ত ঈষৎ সুরফেরতা টেনে বললে, 'এক ঘটি পবিত্র গঙ্গাজলের তেষ্টা নয় তো?'

উভয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন।

হিল্লোলিনী হেসে হাততালি দিলে, "ব্র্যাভো নেত্তকালী!"

চাকুরেদের প্রত্যূষে ওঠাই অভ্যাস। শিবুদা অভ্যাস মত দাঁতন করতে করতে বারবাড়িতে পায়চারি করছিলেন। বেকারেরা বেলা সাতটার আগে শয্যা-ত্যাগটা করেন না, আবশ্যকও হয় না। মহা চিন্তাকুল ভাবে আজ সহসা নিয়মভঙ্গ!

হরিশ খুড়ো এসেই 'শিবু কেমন আছ বাবা, শুনলুম কাল তিনটে না বাজতেই বাড়ি ফিরেছ; মনটা খারাপ হয়ে গেল,—অসুখ বিসুখ নয় তো?'—পিঠে পিঠে রাসু জ্যাঠা, আশু খুড়ো, অর্থাৎ সহানুভূতিশীল জ্ঞাতিরা উপস্থিত হলেন। গ্রামে [illegible] সুখই এই, শহরে কে কার খবর নেয়?

আশু খুড়ো বললেন, 'যাক্ বাঁচলুম,—বর্ষাকাল, একটুতেই শরীর বেগ্‌ড়ায় কিনা, তাই শুধু সন্দেহ কেন, চিন্তাও হয়েছিল,—অমন অসময়ে তো আস না।'

শিবু বললে, 'কাল দিনটে মেঘ ক'রে ঝাপসা হয়ে থাকায় সাহেবেরা ছুটি নিয়ে গেলেন, তাই সকাল সকাল আসা ঘটেছিল।'

রাসু জ্যাঠা বললেন, 'তুমি ভালো আছ ব্যাস্, তাহলেই হ'ল, তবে পিসি নাকি কি একটা—সে অমন কথা বলে কেন? তাতে আমাদের বংশের যে—'

'তিনি আমার গুরুজন, তাঁর কথায় তো আমি প্রতিবাদ করতে যাব না জ্যাঠামশাই,—ক'রে ফলও নেই—তা সকলেই জানেন।'

'সে কি কথা! তা হ'লে তার পরিণাম তো জান। সমাজে থাকতে হ'লে বৌমাকে যে—'

'আপনারা আছেন, শাস্ত্রও আছে, আমি তো ও-দুইয়ের বাইরে নই। এখন আমি স্নানে যাই, ছুটির এই সুখ, সকাল সকাল গিয়ে দু'দিনের কাজ মেটাতে হবে।'

'হ্যাঁ যাবে বইকি, বাবা, সেটা আগে। যাক্, নিশ্চিন্ত হলুম, তুমি তো বংশের যোগ্য কথাই বলেছ, প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ, দীর্ঘজীবী হও। পুরুষ বাচ্ছা—আমরা রয়েছি, ভেবো না; সদ্বংশের মেয়ের অভাব হবে না।'

আশীর্বাদ করতে করতে ও দুষ্প্রাপ্য আশ্বাস দিতে দিতে সব চলে গেলেন।

শিবুদাও গঙ্গাস্নানে গেলেন। যাবার পথে শুভানুধ্যায়ীদের আজ অভাব ছিল না, তিনি সকলের সন্তোষ বিধান ক'রে এসে আহারান্তে কুটীব পানসিতে গিয়ে ওঠেন। তাতেও নিস্তার ছিল না, ঐ কথারই অবতারণা ও করুণামাখা ক্ষোভ।

শিবুদার নির্লিপ্ত ভাব ও বন্ধুবান্ধবদের উপর নির্ভরশীলতায় তাঁদের আন্তরিক আনন্দ উপভোগটা কোথাও তেমন জমে নাই। বাড়িতেও ব'লে গিয়েছিলেন, 'আজকে কোনো মাসি পিসির আসতে আর বাকি থাকবে না।—সমাদরে ত্রুটি না হয়।'

তাঁদের অবশ্যকরণীয় প্রশ্নাদির উত্তর স্বামীর কাছে নেত্তকালী শুনেই রেখেছিলেন এবং ধীরভাবে সে অগ্নিপরীক্ষাও দিয়েছিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁদের মুখে নির্বাসন শাস্ত্রের সঙ্কেতের সুমধুর ইঙ্গিত যে তাঁকে বিচলিত করেনি, এমন কথা বলা যায় না।

পিসির চেপে যাবার আশ্বাসবাণী গ্রাম হতে গ্রামান্তরেও ঢালা নিমন্ত্রণ ভাবেই পৌঁচেছিল—ইতর সাধারণও বঞ্চিত হয়নি।

শিবুদা কর্মস্থল থেকে ফিরে জল খেতে বসে মেয়ে-এজলাসের সব কথা শুনলেন,—নেত্তকালীও পেট খালি ক'রে বাঁচলেন। শিবু বললেন, 'ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি পণ্ডিত প্রধান কৈলেশ বাচস্পতির কাছে হয়ে এসেছি। তবে গ্রামের দলপতিদের সম্মান রক্ষার্থে আমাদের ও তোমার দাদার কিছু করতেই হবে। জানই তো চিল পড়লে, ঝুটো হলেও কুটো নিয়ে ওড়ে। সেটা তার মেকি মান বজায়ের আনন্দ মাত্র। বিশেষ তোমার দাদাও দলপতি ও প্রতিপক্ষ, তাঁকে মিথ্যে ফেঁসাদে ফেলাতেই এঁদের আত্ম-প্রসাদ, পরম সুখ। বুঝেছ তো—'

নেত্তকালী শুনে স্তম্ভিত। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'গ্রামের দলপতিদের ঘরগড়া মিথ্যা আবদারে পরম সুখ। বেশ কথা, কিন্তু আমি পরম চাচ্ছি না, সাধারণ সুখ দুঃখ তো সবারই আছে, আমার সুখটা তাতে কোথায়? মিছে একটা অপরাধ মেনে নিতে হবে নাকি? তুলতুল বড় ঠাকুরের সাড়া পেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে দু'হাত তুলে মাদুর পেরিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়, উনি কোলে ক'রে নেন। সেটা এক বিছানা হ'ল নাকি?'

বিষুব আর সইতে পারলে না, ফোঁস ক'রে উঠল, "কোয়াইট্ রাইট, মেয়েদের

চরিত্র নিয়ে দেশময় মিছে একটা কুৎসা রটনা, আর শিববাবু স্বামী হযে তার সহায়ক! তা হলে তাঁর এডুকেশনের মূল্য কোথায়?"

তা বলতে পার না ভাই, তার পার্চমেণ্টে ছাপা পাকা ডকুমেণ্ট রয়েছে,—লোহার সিন্দুকে তার সার্টিফিকেট সযত্নে রাখা আছে,—সরকারী সেরেস্তায় ক্যালেণ্ডারেও পাবে।

বিষুব বললে, "শিক্ষা দীক্ষা সিন্দুকে বন্ধ ক'রে ঢোঁড়া দলপতিত্বে সুখ খোঁজার চেয়ে—যাক্ আমরা আর শুনতে চাই না—"

চটে গেলে চলবে কেন, আমি তো আগেই বলেছি—সে এ যুগের কথা নয়, তোমরাও তাই শুনতে চেয়েছ, গল্প নয়, রূপকথা নয়, অপরূপ কথা। সেটা এ্যাংলো ভার্নাকুলার যুগান্তরের দিন, কিন্তু সমাজের সামনে সে শিক্ষার মাথা তোলবার শক্তি তখনো আসেনি।

"বেশ, এখন তোমার শিবুদা নেত্তকালীর কথাটার কি জবাব দিলেন শু[illegible]।"

শিবু বললে, 'নেত্ত, সে কথা শুনবে কে? পিসিমার কথা আর পার্লামেণ্টের রায় যে সমকক্ষ। তোমার দাদাও তো একজন দলপতি, জবাবটা তাঁর কাছেই শুনো। আমার আজ সময় নেই, আমি এখানকার আমাদের সমাজের পবিত্র যজ্ঞিডুমুরের কাটগড়ায় হাজির হতে চললুম।

চলে গেলেন।

দলপতিদের মজলিস সরগরম। যারা কখনো কদাচ আসেন তাঁরাও এসেছেন। মামলা সঙ্গীন, সকলেই শিবুর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

শিবুদা গরম কোট গায়ে দিয়ে, পান চিবুতে চিবুতে হাসিমুখে 'এতদিনে সম্বন্ধীকে বাগে পাওয়া গিয়েছে' বলতে বলতে উপস্থিত।

'এই যে, এসো ভায়া, আমরা তোমারি প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিলুম। বিষয়টা যেমন জটিল তেমনি অপ্রত্যাশিত কিনা। সব খুলে বলো তো। না বুঝে বিচার চলে না।'

শিবুদা হাসিমুখেই বললেন, 'যদি একটা সুযোগ পাওয়াই যাচ্ছে, সেটাকে ঘেঁটে এলিয়ে ফেলে হালকা করা কেন? কথায় তো দোষ মিটবে না, কেবল সময় নষ্ট হবে। দোষ মেটাতে তো আসা নয় দোষ সাব্যস্ত করবার জন্যই ত আমরা উপস্থিত। আমিও তো দলছাড়া নই, আপনাদেরই একজন। দোষ যখন ধরে নেওয়া হয়েছে তখন আর বিচার কিসের। এখন সাজার

কথাই আসল কথা। সম্বন্ধী কালীকিঙ্কর আমাদের বিরুদ্ধ দলপতি, সেই কাতলা যখন পড়েছে কান টানলে মাথাও আসে, তার ভগ্নীও আসতে বাধ্য, না এসে পারে না। দোষ যখন স্থিরই ক'রে ফেলা হয়েছে তখন তো আমাদের কাজ মিটেই গেছে, বাকি যা তার জন্য শাস্ত্র রয়েছেন শাস্ত্রজ্ঞও রয়েছেন—তা সে জমিদার পুত্রের যতই খরচ হোক। গরিব নয় যে দয়ামায়ার দরকার। আমি খুশি,—প্রতিপক্ষ দলপতিকে কায়দায় পাওয়া গেছে ব'লে আর গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হবে ব'লে। এখন যা হলে ভালো হয় আপনারা ভাবুন ব' করুন। আমাব আর কেবল একটি মাত্র প্রার্থনা আছে-- আমাদের গ্রামেব ন্যাযপরতায় কেউ না দোষ দিতে পারেন।'

শিবুদা নীরব হলেন। তাঁর কথা এতক্ষণ মাতব্বরেরা অবাক হয়ে শুনছিলেন,—বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। একি হ'ল! তারা ইতিপূর্বে বহুত সলাপরামর্শ,—বহু দ্যাওপ্যাচ ভেবে ও ভেঁজে মনে মনে সব উৎফুল্ল ও উন্মুখ ছিলেন,—শিবু কিন্তু সেদিক মাড়ালে না, দলের একজন বিশিষ্ট শুভকামী হয়ে পড়ল। সব মাটি, ব্যাপারটা বেশ ক'রে ঘাঁটা হল না। তাই শিবুব কথা শুনে কেউই আশানুরূপ সুখ পেলেন না, মনমরার মত দু'একজন দু'একটি কথা মাত্র কইতে চেষ্টা করলেন, 'হ্যা, একে বলে আপন লোক, নিজের গ্রামের মর্যাদা রক্ষার দিকে দৃষ্টি ষোল আনা তবে '

কেউ বললেন—'তা বলতেই হবে, তবে—'

একজন বললেন,- 'শাস্ত্রে যা যা বলে, তা খুঁটিয়ে করতে পাবলে বটে—'

ভেতব দিকের জানালার আড়াল থেকে চাপা গলায় একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'দোষীর আস্পর্ধা তো রয়েই গেল, তার কি করছ?'

শিবুদা বললেন, 'তাও হবে পিসিমা,-- ক্ষুণ্ণ হবেন না—'

'না তাই বলছি, কারো ওপব অবিচারটা না হয। দশরথের ব্যাটা—রামই তার নজিব রেখে গেছেন কিনা। রামের চেয়ে তো শাস্ত্র বড নয—'

এতক্ষণে পণ্ডিতদের ধড়ে যেন প্রাণ এল। সব চাঙ্গা হয়ে নস্য টানলেন।

মতি শিরোমণি বললেন, 'আমরা তো শিবুকে গ্রামের রাম বলেই দেখি, তুমি ভেব না পিসি—' ইত্যাদি অভয়বাণী অনেকেই উচ্চারণ করলেন।

শিবুদা হাসতে হাসতে বললে, এটা আমাদের দল, এবং সম্মান রক্ষার্থে যা যা দরকার সবই করতে হবে। আমি বয়ঃকনিষ্ঠ তাই আপনাদেব মুখ থেকে উচ্চারণের অপেক্ষা করছিলুম। সুখ্যাতি বড়দেরই প্রাপ্য, তাতে আমি

চক্ষুক্ষেপ করতে পারি কি?'

ধন্য ধন্য পড়ে গেল, 'বেঁচে থাক, বাবা!'

ইতর ভদ্র অনেকেই কর্তাদের বিচার শুনতে বাইরে জড় হয়েছিল। বৃদ্ধ ছিরু জেলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ফেলে, 'চল্ চল্—একি মানুষের গা? ঘরের বৌ ঝি নিয়ে খেলা—'

ভেতর থেকে দু-একজন মাতব্বর বলে উঠলেন 'কে? কেও? কে বললে দ্যাখ্ ত রে!'

দীপালী দপ ক'রে জ্বলে উঠলেন, বললেন, "ঐ ছোট লোকেরাই ভরসা। ভদ্ররা ছিলেন কেবল ভণ্ডামী করতে।—তোমরা যে বড চুপ ক'রে রইলে সব।"

বিষুব বললেন, "এর পর দাদামশায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।'

সেই ভালো ভাই, আগে কথাটা শেষ করতে দাও।

... সময় বাহিরে বহু কণ্ঠে আওয়াজ দিলে, 'ওপাড়ায় আগুন লেগেছে, —উঃ উঃ কি জ্বলছে, ইস্!'

শুনতে পেয়েই কে একজন 'এসো এসো বলতে বলতে খালি পায়েই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। 'শিব বাবু না? চল চল, ভাই সব!' ছোটো লোকেরা তাঁর সঙ্গ নিলে। ছুটল।

কর্তারা তামাকের হুকুম করেছিলেন,—অপেক্ষায় রইলেন। একজন বললেন, 'কার বাড়ি হে—সেটা আগে দ্যাখো—ছোটো লোক ব্যাটা দরই হবে।'

পসি ছুটলেন—'আমার বুধির গলায় যে দড়ি বাঁধা গো! কালই যে নতুন দড়ি গাছটা কেনা হয়েছে।'

কর্তারা তামাক টেনে যখন 'অগ্নির্দেবতা,—আমরা গিয়ে আর কি করবো' ব'লে জুতো খুঁজে পাচ্ছেন না, পা ঘষছেন, শিবুদা তখন ছোটো লোকদের সাহায্যে, জল-কাদা মাখা অবস্থায় আগুন নিবিয়ে ফিরছেন। আগুন নিবতে দেখি, কেবল শিরোমণির বাইরের চণ্ডীমণ্ডপখানিই গিয়েছে।

অশক্ত বৃদ্ধ রাজকৃষ্ট দাদামশাই হতভম্বের মত আসরের এক কোণে বসেছিলেন। পিসিকে ত সকলেই চিনতেন,—অসম্বিতে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'এই আরম্ভ হল!'

মিটিং আপনিই এ্যাড্জোর্ন্ড্ হয়ে গেল।

মুলতুবি আসর আর তেমন জমে না। বিশেষ বিশেষ উৎসাহীরা এসে ফিরে যান। বাড়িতে আগুন লাগা পর্যন্ত শিবোমণির মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। গৃহিণী কথা কন না—'একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বউমানুষের লাঞ্ছনা, —ফের যদি ওখানে যাও' ইত্যাদি।

'পিসির না সংসার না স্বামী না পুত্র, তাঁর ভাবনা—নতুন দড়ি গাছটার —আর গোমরা বুদ্ধির ঢেঁকি আছে—'

প্রতাপ পণ্ডিত মধু জ্যাঠা প্রভৃতি চাঁইয়েরা এত বড কেস ছেড়ে দিতে পারেন না, এমন সুবিধা ভাগ্যে মেলে। শেষ কি সমাজটাকে ডুবুতে হবে? হিঁদুর বাড়ি, শিবুর স্ত্রীর হাতের জল খেতে হবে নাকি!

শিবুদা এসে বললেন, 'আপনারা কি করবেন সত্বর করুন, পাঁচ ছ দিন হ'য়ে গেল, আমি তো আর এক সঙ্গে থাকতে পারি না। আমি কাল না হয় পরশু ওকে ওর বাপের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসি গে—তারপর—'

মধু খুড়ো বললেন, 'তারপর তোমাকে ভাবতে হবে না, খাসা আভাঙ্গা কুলীনের মেয়ে এনে দেব।'

'সে কথা থাক জ্যাঠামশাই, আর পাপ বাড়ানো কেন? তারও একটা কিছু দোষ পেতে কতক্ষণ।'

'আরে পাগল ছেলে, ওকি একটা কথা হ'ল। থাক্ এখন যা করতে যাচ্ছ ক'রে ফেলো। পরের কথা পরে আছে, বুঝলে।'

উমাচরণ বললেন, 'সকল দিক বজায় রাখাই সমাজকর্তাদের কাজ। শুধু ছেড়ে দিলেই তো হল না, অপরাধীর ভালোটাও দেখা চাই—তবে না মহত্ব! প্রায়শ্চিত্ত না করলে তার দেহশুদ্ধি হবে না, হাতের জল দেবতা ব্রাহ্মণে নেবে না তা সে যেখানেই থাক্। তার নিজেরও তো ধর্মকর্ম আছে—কি নিয়ে সে থাকবে, সেটাও তো দেখতে হয়। প্রায়শ্চিত্তটা বিধিমত করানো চাই আর ব্রাহ্মণের মুখ দিয়েই দেবতারা খান। সম্বন্ধীর কিছু খসলে তুমিও তো খুশি বলছিলে। কালীকিঙ্কর অজ্ঞানও নয়, অক্ষমও নয়। সর্বদিক বজায় হবে।'

শিবুদা বললেন, 'আমিও তো আপনাদেরি একজন, তাই সকলেরই ভালো যাতে হয় সেইটি খুঁজছিলুম। এই কালকের কথা, জগন্নাথ ঘাটে কৈলেশ বাচস্পতি মশার সঙ্গে দেখা। কারো কাছে সব শুনে থাকবেন। বললেন,

'এসব বিধান দিচ্ছেন কে—বউমার যদি অপরাধই হয়ে থাকে, তা এক অপরাধে দুই সাজা কি রকম? মরার বাড়া গাল নেই—যদি নির্বাসনই হ'ল তো আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের—দরকারই বা কি? সে জন্যে অন্যের এত মাথাব্যথাই ধরে কেন? ও করতে মানা নেই, ইচ্ছা হয় প্রায়শ্চিত্ত তিনি করতে পারেন কিন্তু মহাপাপটা তুমি যেন কোরো না, শিবু।' বলতে বলতে নৌকায় গিয়ে উঠলেন—'

বিপুলকায় হরকুমার বললেন, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—বারাসাতের লোক পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার দেশের লোকের কথা কি বুঝবে? পূর্ব-পুরুষ প্রচলিত প্রথাই প্রবল। টিকিনাড়া শাস্ত্র সেখানে টঁ্যাকে না। ছিনাত ভায়া তো জেলার—স্বয়ং উপস্থিত। একটা বেগুন-চুরিতেও চোরকে পাঁচ রকম সাজা ভোগ করতে হয়। কম্বলের জামা পরো, জাঁতা পেসো, ঘানি ঘোরাও, আর বেত-খাওয়াও আছে। একটা সাজা হল নাকি? যত বাজে কথা। তুমি ভড়কে যেও না শিবু, কর্তব্য করা চাই। তার ভগ্নীর ভালো কালী-কিঙ্কর দেখবে, তোমার কাজ তুমি করোগে।'

শিবুদা বললেন, 'সে সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বিষুব ব'লে উঠল, "স্বামী বটে! মুখপোড়ারা বে ক'রে মরে কেন।"

সমাজ, সংসার, বংশরক্ষা যে ধর্মকর্মের মধ্যে, ভাই—

শিবুদা ইতিমধ্যে সম্বন্ধী কালীকিঙ্কর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে সকল কথা জানাতে গিয়ে বুঝলেন, তিনি সবই শুনেছেন। হেসে বললেন, 'ভয় পেয়েছ নাকি? কিছু ভেবো না, অল্প দিনেই সব মিটে যাবে। তুমি নেত্যকে কালই এখানে রেখে যাও, নির্বাসনে থাক্ হে!' বলে আবার হাসলেন। 'পূজোটার পরই আমার গয়ায় যাবার কথা আছে। তুমি মাতব্বরদের ব'লে দিও, নেত্তর কাশীতে থাকবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। কয়েকদিন পরে বাড়িতে সাবিত্রী-চতুর্দশীর ব্রত উদ্যাপন আছে, নেত্তকে তো সেই আসতেই হবে, না হয় দু দিন আগেই এল। যখন স্বীকার করেই নিয়েছ, আমাকে তো বটার ভোজ দিতেই হবে—সেইটে হবে প্রায়শ্চিত্তের ভোজ হে! ওরা তো সেইটেই চায়। তুমি কিন্তু নেত্তকে সব কথা বুঝিয়ে এনো—গূঢ় কথাগুলো বাদ দিয়ে। বাকি যা তা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

আরো অনেক কথা হয়।

শিবুবাবু সম্বন্ধীকে চিনতেন। সব কথা সেরে নেওয়ার ভার তাঁকে দিয়ে

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরলেন। নিজেও নেত্তকে যথাসম্ভব সব বুঝিয়ে এবং ব্রত-উদ্‌যাপনের কথাটি বিশেষ ক'রে গোপন রাখতে ব'লে পরদিন তাকে বাপের বাড়ি ত্যাগ ক'রে এলেন। গ্রামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল।

পিসির মত গঙ্গাজলের শরীর যাঁদের তেমন দু'চারটি ধার্মিকা ছাড়া মেয়েমহলে ক্ষোভের ও শিবুর প্রতি ধিক্কারের সীমা রইল না। 'পোড়ারমুখো বয়াবদের কথা তো জানাই আছে, শিবুও সেই দলে ভিড়ল—সব সমান গো!—পোড়া কপাল!' ইত্যাদি।

পাঁচজন নামজাদা পণ্ডিতের সাহায্যে নেত্তকালীর প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রমত সমাধা হয়ে গেছে, এ সংবাদ সকলে পেয়েছেন।—'ভোজ এই বৃহস্পতিবার,—সেটা তো পরশু। সাড়াশব্দ নেই কেন,—ইতস্তত আছে নাকি?'

অনেকদিন পরে তাই আজ মজলিসে অনেকেই উপস্থিত, মতি শিরোমণিও এসেছেন। অতিকায় হরকুমার বক্তার আসন নিয়েছেন। রুক্ষ প্রকৃতি রুদ্র মূর্তির জন্য গ্রামে তিনি দুর্বাসা নামেই পরিচিত। বলছিলেন, 'ব্রাহ্মণ হয়ে তারা কি জানে না—ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ভিন্ন শুভকার্য মাত্রই নিষ্ফল; ও প্রায়শ্চিত্ত সর্বথা অগ্রাহ্য—'

ঠিক এই সময় সহ-শিবনাথ কালীকিঙ্করবাবু বিনীতভাবে করযোড়ে নমস্কার করতে করতে ঢুকলেন। সকলে চমকে গিয়েছিলেন; শ্রীনাথবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এসো এসো, ভায়া, এসো, কষ্ট ক'রে নিজেও বেরিয়েছ, ব্যাপার কি?'

কালীকিঙ্কর বাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'ব্যাপার কি? এর চেয়ে বিপদ ভদ্রলোকের আর কি হতে পারে, দাদা, এখন আপনারা দয়া ক'রে উদ্ধার ক'রে দিন। আসল কাজ আপনাদের আশীর্বাদে শেষ হলেও দেবতারা এখনও অভুক্ত, ব্রাহ্মণভোজন ভিন্ন সবই নিষ্ফল। তাই আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি। অপরাধিনীর দেহশুদ্ধিকল্পে দয়া করুন।'

দুর্বাসা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন 'কিন্তু বামাল তো আজো ঘরে পুষছ! সে বাড়িতে—'

'চাটুজ্জে মশাই, আমি এত বড় ভুলটা করতে পারি কি? ক্ষমা করবেন, বাবা অনাবশ্যক কতকগুলো বাড়ি ক'রে যাওয়ায় আমরা তার উপর বিরক্ত হই, কিন্তু এখন কাজ দিলে।'

'কতদিন কাজ দেবে শুনি ? মনকে চোখ ঠারা নাকি ?'

'পূজার পরই বেরুবার ইচ্ছা আছে। আসল কথা. নেত্তকে কাশীতে রাখার ব্যবস্থা ক'রে আসা।'

'বেরুবার ইচ্ছা আছে নয়, বেরুবে, বেরুতে হবে। যাক্—রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে আসা তোমাদের নিয়ম নাকি ? এ বৈঠকী নিমন্ত্রণ নেবে কে ?'

'আমি সস্ত্রীক এসেছি, দাদা। কাল সকালে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে যাব। আমি মায়েদেরও চাই, নচেৎ আমার চলবে না, দাদা। আমার লোকবল কম, আমি গ্রামের লোকের সাহায্য নেব না, মায়েদের না পেলে কর্ম্মই পণ্ড হবে। এ অনুগ্রহ করতেই হবে, আমাকে হতাশ করবেন না। তাঁদের সাহায্য পাব এই সাহসেই পাঁচ-সাতশো লোকের আয়োজন ক'রে ফেলেছি, আমি বড় বিপন্ন। আপনাদেরি সব করতে হবে, শুদ্ধাচারে যাতে হয়।'

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'ইস্, করেছ কি ? এত লোকের আয়োজন ! আচ্ছা, কাল সকালে তোমরা গিয়ে তাঁদের রাজি করতে পার ত আমাদের আপত্তি নেই।'

হরকুমার 'এখন তোমরা কথা কও আমার কাজ আছে—চললুম' ব'লে উঠে গেলেন।

মধুজ্যাঠা শ্রীনাথ বাবুর দিকে চেয়ে হাসলেন—থার্ড ফর্ট্‌নাইট্ কিনা ? (তৃতীয়পক্ষ) বিষুবের দিকে চেয়ে হিল্লোলিনী কল্লোলিনী হয়ে পড়লেন, বললেন, 'সেসব প্রাচিত্তিরের পুঁথিতে আগুন লেগে গেছে বুঝি ! ভাগ্যে মনু মরেছেন—নইলে আমাদের কি হ'ত দিদি ! ঘোমটা নেই, প্রাচিত্তির নম্বর ওয়ান ; চটি পায়, নম্বর টু ; পুরুষদের সঙ্গে কথা, থ্রি—ক্রমে শকে পাচার। প্রাচিত্তিরের পদাবলীতে কেবল মহিলা-বলি ! মিনসে কোন্ দেশের নীরো ছিলেন দিদি !'

তরুণীরা হেসে উঠলেন।

বিষুব চাপা হাসির সঙ্গে রোষের রেখা টেনে বললেন, "ব্যবস্থার চাকা মারতে হয় না, সে আপনি ঘোরে। এখন শুনতে দে।"

আজ সেই প্রত্যাশিত বৃহস্পতিবার। মহাসমারোহ কাণ্ড। কালীকিঙ্কর-ভবন বা জমিদার-বাড়ি লোকে লোকারণ্য। জাফরানের সুগন্ধে গ্রাম ভরপুর। দুইটি দ্বিতল চকমিলান বাড়ি—পারের লোক ও গ্রামের লোকের জন্য সুন্দর ব্যবস্থায় সুসজ্জিত। কোনোরূপ ত্রুটি বা অসুবিধার সম্ভাবনা নেই। বৈঠকে পান তামাক তাস আনন্দ কোলাহল চলছে। কালীকিঙ্কর সকলের নিকট হাতজোড় ক'রে ঘুরছেন।

'দেখবেন দাদা, আমার ভরসা আপনারাই।'

শ্রীনাথ বাবু অভয় দিচ্ছেন, 'কিছু ভেবো না, ভাই। আমি পরিবেশনের জন্য লোক ঠিক ক'রে রেখেছি—সকলেই কুলীন সদ্‌ব্রাহ্মণ, আবার ও কাজে ধুরন্ধর—তোমাকে কিছু দেখতে হবে না। আর শৃঙ্খলা-রক্ষার্থে স্বয়ং হরকুমার থাকবেন। কিন্তু আমার একটি কথা রেখো—চকের চারটি কোণের বড় ঘরে চার রকমের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রেখে ভালোই করেছ। পোলাও ব্যঞ্জনাদি পুরুষদের হাতে থাকবে, কেবল মিষ্টান্নের ভাঁড়ার যেন ভালো জানাশুনো বা সধবা স্ত্রীলোকের হাতে থাকে। তাঁদের নিষ্ঠাভক্তিই স্বতন্ত্র।'

কালীকিঙ্কর বিনীতভাবে বললেন, 'আমি ত দাদা এ গ্রামের লোক নিচ্ছি না, কি জানি কে কেমন। আপাতত আপনার বউমা সে ঘরে সব গুছিয়ে রাখছেন। ব্রাহ্মণেরা আসন নিলে আপনি যাঁকে বেছে দেবেন তিনিই মিষ্টান্নের ভাঁড়ারে থাকবেন।'

'বেশ কথা, মিষ্টান্নাদি শেষে পড়বে, আমি তার পূর্বে আমার এক শক্ত সমর্থ সর্বকর্মকুশলা বউমাকে এনে দেব। বড় ঘরের মেয়ে—ক্রিয়াকর্মের মধ্যে মানুষ হয়েছে, কিছু দেখতে হবে না, বলতে কইতে হবে না।'

'বাঁচালেন দাদা, আমি আর ভাবি না।' পায়ের ধুলো নিলেন। 'আর একটি কথা—মেয়েদের মর্যাদা রক্ষার্থে এক মোট কোরা শান্তিপুরে শাড়ি আনিয়ে রেখেছি, মায়েরা সকলে পছন্দমত নিয়ে পরলে আমার মনটা শান্তি পায়। অনুমতি করুন, আমি একবার সেই চেষ্টা নেই।'

'ইস্, তুমি এ সব করছ কি,—কেন? হরকুমারের কথায়—'

'না, তা কেন দাদা। মায়েরা আমার মুখ রক্ষা করেছেন, কষ্টস্বীকার ক'রে এসেছেন, আমারো তো—'

'তারা যে অনেকগুলি—'

'তা হোক, সকলে একসঙ্গে বেরুলে কি সুন্দর দেখাবে বলুন ত।'

'তোমার যা ইচ্ছা করোগে, আমি কিন্তু হরকুমারকে ডেকে দেখাব। গণ্ডারের কি কাণ্ডজ্ঞান হবে?' চলে গেলেন।

'এ আবার কি, এ সব কেন, এ সব কিসের জন্যে' ইত্যাদির মধ্যে জমিদারপত্নী সে কাজ আগেই সেরে রেখেছিলেন—সকলকেই নূতন শাড়ি পরিয়েছেন।'

কালীকিঙ্কর দেখে সত্যকার একটা আনন্দ অনুভব করলেন। সকলের উদ্দেশে

একটি নমস্কার ক'রে 'মায়েদের পেয়ে আজ আমার বাড়ি পবিত্র হল' বলতে বলতে চলে যাচ্ছিলেন, বর্ষীয়সী থাকতে পারলেন না, বললেন, 'তুমি রাজা হও, আমাদের প্রাণে কিন্তু আজ সুখ নেই, বাবা।'

. কালীকিঙ্কর দাঁড়ালেন না 'সবি তাঁর ইচ্ছা' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

উভয় পক্ষের কথাগুলির মধ্যে সত্য ছিল। হরকুমারকে দেখিয়ে শ্রীনাথবাবু চলে যাচ্ছিলেন। হরকুমার তখন বলছেন, 'এ তো কর্তব্যই ছিল। সকলেই ক'রে থাকে—যাক্, আমাকে যখন ভার দিয়েছেন একবার ভাঁড়ারগুলো দেখে আসি—ব্রাহ্মণ বসাবার সময়ও হল।'

পরিবেশকদের নিয়ে ভাঁড়ারগুলি দেখে উপদেশা.দ দিতে দিতে মিষ্টান্নের ভাঁড়ারের সামনে মেয়েদের জটলা দেখে দু-এক ধমক দিলেন।—'এখানে এত বাজে লোকের ভিড় কেন?' ভিতরে একজন পট্টবস্ত্র-চেলি-পরিহিতা স্ত্রীলোক সব গুছিয়ে রাখছিলেন।—'কে উনি?' শুনলেন এ বাড়ির গৃহিণী।—

'ত' ভালো, তবে যাঁরা ওপার থেকে এসেছেন, তাঁদের ২।৩ জনও যেন থাকেন ওঁকে সাহায্য করতে। এ দিকের যাঁরা তাঁরা সব বাইরে থাকতে পারেন,—যাতায়াতের পথ যেন খোলসা থাকে।'—নিম্নকণ্ঠে, 'তবে যে কিঙ্কর বলছিল, এ গ্রামের কেউ' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

এ বাড়ির প্রথা—বিশেষ শুদ্ধাচারে ভাঁড়ারে থাকতে হয়, তাই কিঙ্কর-পত্নী গঙ্গাস্নানান্তে চেলি পরে এসে ভাঁড়ারে ঢুকে সব গুছিয়ে রাখছিলেন, নূতন লোককে অসুবিধায় না পড়তে হয়। মিষ্টান্নের ভাঁড়ারের কাজ শেষের দিকে। ব্রাহ্মণ বসতে আরম্ভ হয়েছে শুনে তিনি কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের বাইরে এ গ্রামের মেয়েদের জমায়েত-মধ্যে শোনা গেল, 'ঐ সাত হাত থামের মত লোকটা কে গা! ওর পরিবার এসে থাকে তো বলে দিতে হবে., যেন মধু-সংক্রান্তির ব্রত করায়, একেবারে কাটখোট্টা!' সকল গ্রামেই ২।৪টি পিসি থাকেন, তাঁরা কারো তক্কা রাখেন না, কেবল জমিদার-বাড়ি ও কালীকিঙ্করের অনুরোধে চুপ ক'রে আছেন। হরমকুারের কথাবার্তা শুনে তাঁদের গা জ্বলে যাচ্ছে, মুখ নিস্‌পিস্ করছে।

ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হয়ে গেছে। ধুরন্ধর পরিবেশকরা পোলাও ব্যঞ্জনাদি নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, পদভরে বাড়ি কাঁপছে।

এই সময় একটি সধবা, শ্রীনাথবাবুর নির্বাচিতা হরকুমার-পত্নী বিমলা, চেলি প'রে এসে ভাঁড়ারে ঢুকলেন। এ পারের মাসি পিসিরা সকলে মুখ চাওয়া-

চায়ি করলেন। অর্থাভাস—ও অপরিচিতা, ওপারের কোনো শুদ্ধাচারিণী হবেন! তাঁরা আঁচল গুটিয়ে গা মেরে সরে দাঁড়ালেন পাছে স্পর্শদোষ ঘটে। বিমলা সব দেখে নিয়ে পর পর সাজিয়ে এগিয়ে রাখতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাও চলল। পিসিদের একজন বললেন, 'কথাতে ছোঁয়াচ লাগবে না তো?'

নবাগতা বিমলা চমকে চাইলেন, বললেন, 'মাপ করবেন দিদি, আমরা হুকুম পালবার দাসী, কর্তারা যা বলেন করতেই হয়. আপত্তি করলেই বিপত্তি। পণ্ডিতদের শাস্ত্রে প্রাচিত্তির পোরা, দয়া ক'রে একটা ছাড়লেই দফা রফা। তাঁরা সকলেই যে পীরের দরগার প্যায়াদা দিদি।'

শুনে সকলে তুষ্ট হলেন, হৃষ্ট হাসি হাসলেন।—'বেশ মানুষ, আলাপ করতে হবে।'

এক-একজন পরিবেশক আসছেন আর নিজেরাই মিষ্টান্নের পরাত নিয়ে যাচ্ছেন। এমন শৃঙ্খলায় সাজানো আছে চাইতে হচ্ছে না। —'আর শেষ হয়ে এসেছে, সন্দেশটা একবার দেখানো উচিত, এদিকেও বোধ হয় বারবেলা পড়ে গেল —'

'বউমাকে দেখছি এইবার সকল ক্রিয়াবাড়িতেই ভাঁড়ারে থাকতে হবে। সাজানোর এমন পারিপাট্য কোথাও পাইনি।' চলে গেলেন।

গ্রামের পিসিরা কথা কইতে যাচ্ছিলেন, একজন বললেন, 'চুপ করো সুকো পিসি, সেই সাত-হাত লম্বা শয়তান!'- তাড়াতাড়ি একজন তাঁর গা টিপে বললেন, 'চুপ্ চুপ্ (বিমলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে) ওঁর স্বামী যে—,

সত্যি নাকি! 'অঙ্গদের গলায় মুক্তোর মালা- এমন মেয়ের কি অভাগ্যি!'

রূঢ়কণ্ঠে 'সরে যাও, সরে যাও— একটু বিবেচনাও নেই' বলতে বলতে হরকুমার দ্রুত এসেই ভাঁড়ারে ঢুকে পড়লেন ও চেলি পরিহিতার সামনে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'পান্তুয়ার পাত্রটা আমাকে দাও তো মা!'

সুকো পিসি বলে উঠলেন 'আহা কি মিষ্টি কথা, কান জুড়িয়ে গেল, ভালো ক'রে শুনে নে বউ—'

শুনেই বিমলা চুপ সে মড়ার মত হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর দিকে একবার তীব্র কটাক্ষে চেয়ে 'কাকে কি বলছ' ব'লে ধমকে উঠলেন।

'অ্যাঁ একি—তুমি নাকি! তোমাকে তো শান্তিপুরে পরতে দেখেছি, চেলি পরা ছিল ত বাড়ির গিন্নির,—কে বুঝবে বলো, তা হয়েছে কি—অজান্তে—'

দোরগোড়া থেকে কে ব'লে উঠল, 'তা ত ঠিকই, অজান্তে বিষ খেলে অমৃত হয়, ওপারের শাস্ত্রে আছে যে!'

পিসিদের এখন আর কে রোকে। স্নুকো পিসি বললেন, 'সত্যিই ত হয়েছে কি। এত বড় প্রাচিত্তিরের ঘটা, এরা বাজনা আনেনি গা!—বাজাতে বল্, বাজাতে বল্।—ঢাক আছে ত? আমি দেখছি।' ব'লে ছুটলেন।

দশ মিনিটের মধ্যেই বিদ্যুৎগতিতে স্নুকো পিসির কথাটা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে যায়। থিয়েটারের আখড়া ছেড়ে যুবকেরা কর্মবাড়িতে ভিক্ষুকের সাজে (বোধ হয় রূপচাঁদ পক্ষীরই হবে) একটি গান গাইতে গাইতে উপস্থিত—'কেঁদো বাঘ পড়েছে জলে, পাপ চারপো হ'লেই আপনি ফলে।'

কার্তিকিঙ্কর বাবু তাড়াতাড়ি সব থামিয়ে দেন।

আমার কথাটি ফুরুলো—

বিষুব। বেঁচে গেলে দাদামশাই; না হলে ঝগড়া আজ আর থামত না। গায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছিলুম। বুনো বয়ারটার বিষ দাঁত ভেঙে খুশি ক'রে দিয়েছ। এইবার এপারেও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চলবে ত?

কালীকিঙ্কর জমিদারবাচ্ছা, পালটা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়ে ছাড়তে পারে কি? যাক্, শিবুর সার্টিফিকেটগুলোও নেপথ্যে সিন্দুক ফুঁড়ে সার্থক হল। নেত্তকালীও বাড়ি ফিরে পিসির পায়ের ধুলো নিয়ে পবিত্র হল।

তরুণীরা মুখ ঘুরিয়ে বলে গেলেন, 'কি দুর্লভ যুগই খুইয়েছি, দাদামশাই — পায়ের ধুলো দাও,—চললুম।"

আমারও পেট ফুলছিল। তামাক সাজতে বসলুম।

প্রায়শই ব্যর্থ। সরোজকুমার এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মনন-ধর্মী অথচ সহৃদয় অক্লান্ত অধ্যবসায় সাহিত্য-জীবনের শুরু থেকে বাংলা সাহিত্যের এই অভাব পরিপূরণে তিনি সচেষ্ট ও সার্থককাম। তাঁর উপন্যাসের বিষয় দিন-রাত্রির মতো অলক্ষ্য আকর্ষণে সাবলীল স্রোতে বয়ে চলেছে—যে আকর্ষণকে লরেন্স বলেছেন 'ফেট'। সেই সংগে যে সকল চরিত্র উপন্যাসে আসা-যাওয়া করেছে স্বভাবতই সহজ মুক্তিতে তারা প্রাণবন্ত, সম্পূর্ণ। ওই গভীর ও উদার জীবন-বোধে পরিশীলিত অনন্য 'শিল্পদৃষ্টির নতুনতর পরিচয় বহন করছে তাঁর সাম্প্রতিকতম স্মরণীয় উপন্যাস।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী **হংসবলাকা** তিন টাকা

"হংসবলকা" সরোজকুমারের আর একটি অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস। প্রাক-যুদ্ধ বাংলার শিক্ষিত বেকার জীবনের আদর্শ সংঘাতের যে দরদী চিত্র তিনি এখানে তুলে ধরেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী **শ্রেষ্ঠগল্প** সুনীল কুমার নন্দী ও নিখিলকুমার নন্দী সম্পাদিত

সাড়ে চার টাকা

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে স্বল্পসংখ্যক প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীদের মধ্যে সরোজকুমার রায়চৌধুরী অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের বিভিন্ন ধর্মী আঠারোটি উৎকৃষ্ট গল্পের সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পই লেখকের সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনা ও মনন-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত।

পরিমল গোস্বামী **শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প** পাঁচ টাকা

· ……"আমি আপনার লেখার একজন অনুরক্ত পাঠক, বহুকাল যাবৎ বিভিন্ন পত্রিকায় আপনার রচনা উপভোগ করেছি।………

আপনার বৈশিষ্ট্য—অল্পকথায় তীক্ষ্ম উপহাস—সবগুলিতেই আছে।"· ····

স্বাঃ রাজশেখর বসু।

পরিমল গোস্বামীর গল্পগুলিতে অদ্ভুত সংযম আমাকে বিস্মিত করিবাছে। ইনি নিজে না হাসিয়া হাসাইয়াছেন। পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, রঙ্গই হউক, ব্যঙ্গই হউক আর শ্লেষই হউক কোথাও রসবস্তু লইয়া মাতামাতি করেন নাই, তাহার ব্যাখ্যা করেন না, রসবস্তুর আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন নাই, পাঠকের অধিগম হইবে না এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উপভোগ্য বস্তুতে জল মিশাইয়া লঘুতরল বা ফেনিল করেন নাই। ব্যঙ্গের একটি অর্থ ব্যঞ্জনা। দুই অর্থেই গোস্বামী মহাশয়ের ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি সার্থক হইয়াছে।

স্বাঃ কালিদাস রায়।

## পরিমল গোস্বামী — ম্যাজিক লণ্ঠন — আড়াই টাকা

ম্যাজিক লণ্ঠন পড়ে মুগ্ধ হলাম। শ্রীপরিমল গোস্বামীর লেখার অনুরাগী আমি গোড়া থেকেই। সে অনুরাগের সঙ্গে এখন বিস্ময় মিশেছে। বিস্ময় তার লেখার বয়স আগেও যেমন এখনও তেমনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলে। নবীন বয়সের প্রথম লেখা পড়ে তাঁকে জন্ম প্রবীন যাঁরা ভেবেছেন প্রবীণ বয়সের সাম্প্রতিক লেখা পড়ে তাঁকে চির নবীন ভাবা তাঁদের পক্ষে স্বাবিক। তাঁকে দলে টানাও কঠিন, কৌতুকরসের রসিকরা যদি নিজেদের দলে টানতে চান অন্য রসের রসিকরা বোধহয় দখল ছাড়বেন না। আসলে তাঁর রচনার রস মানবতার সেই গভীর উৎস থেকে উৎসারিত নামের গণ্ডী যেখানে অর্থহীন। স্বাঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র।

"ম্যাজিক লণ্ঠন" খুব ভাল লাগল। আজকাল রম্যরচনা নাম সর্বত্র শোনা যায়, তাতে কি বোঝায় জানি না। যা ভাল লাগে তাই রম্য, কবিতা আব গল্প রম্য রচনা না হবে কেন? আপনার বইটি বোধহয় রম্য রচনার অন্তর্গত নয়। এতে যে চিত্রাবলী দেখিয়েছেন তার অনেকগুলি বুঝতে কিছু বুদ্ধির দরকার হয়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, রূপক, ব্যজস্তুতি, আর উপহাসের মিশ্রণ। কয়েকটি চরিত্র চিত্র যা আছে তাও জীবন্ত। এ ধরণের রচনা দেখা যায় না। স্বাঃ রাজশেখর বসু।

## ভাস্কর — শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প — পাঁচ টাকা

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনায় স্বল্পসংখ্যক খ্যাতিমান লেখকগণের মধ্যে ভাস্কর অন্যতম। এই গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক সমসাময়িক সমাজের ন্যাকামি, বোকামী, ভণ্ডামী ও শয়তানীর উপর নিপুণ হাতে ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছেন। তাঁর ভাষা যেমন পরিমিত ও সংযত, ব্যঙ্গও তেমনি সুগম ও শিল্পগুণাশ্রিত। ৪৮টি গল্পের সুবৃহৎ সংগ্রহ।

## বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — মাঝারি — আড়াই টাকা

লেখক বর্তমান সমাজজীবনের বিভিন্ন পরিবেশ থেকে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাঁর প্রবন্ধের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচনার ভঙ্গী মনোরম। শব্দ নির্বাচন ও বিন্যাসের শক্তি অসাধারণ এবং দেখার ও দৃষ্টবস্তুকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও অসামান্য। সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রখর ব্যঙ্গোক্তি অথচ সংবেদনশীল মনোভাব এই তিনটির বৈচিত্রপূর্ণ সমন্বয়ে তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই সার্থক রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।